১৩৫৭-১৩৫৮

শিক্ষা

ওঁ হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

৯ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ | ১ম সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষার নববর্ষ

এই অগ্রহায়ণে শিক্ষার নবম বর্ষ আরম্ভ হইল। যাঁহার শক্তিতে মানুষ শক্তি পায় তাঁহাকে সকলের আগে স্মরণ করি। আর কৃতজ্ঞতা জানাই সকল হিতৈষী বন্ধুবান্ধব লেখক লেখিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকাকে। যাঁহারা মনে করেন 'শিক্ষা'র কিছু বলিবার আছে, তাঁহাদেরই উৎসাহে আমরা নতুন বৎসরে কাগজখানি প্রকাশ করিতেছি। আমাদের মনে আশা আছে, কণ্ঠ ক্ষীণ হইলেও বিরত আঘাতের ফলে আমাদের আদর্শের কথা আকাঙ্ক্ষার কথা লোকের মর্মে গিয়া বাজিবে। শিক্ষার ধারা একটি মাত্র নয়, কিন্তু লক্ষ্য এক। মানুষ গড়িয়া তোলার যে শাশ্বত কল্যাণের আদর্শ তাহাই যেন 'শিক্ষা'র মূলমন্ত্র হয়। আমাদের প্রচারের মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে, সহানুভূতি ও সাহায্য দিয়া পাঠক ও লেখকগণ আমাদের সহযোগিতা করিবেন, তাহা হইলে সে দুর্বলতা দূর হইবে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

উত্তরাধিকার সূত্রে লোকে পুরানো বাড়ি পায় এ কথা আমরা জানি, কিন্তু স্বাধীন হইবার পরেও কোন দেশ বা জাতি শাসনের একটা পুরানো কাঠামোকে ধরিয়া রহিয়া চলিয়াছে, এমন যাহা উদাহরণ আমাদের কখনও জানা ছিল না। যথাতত্ত্বরে সেই জিনিসটাই আমাদের করিতে হইতেছে। আমাদের নূতন আদর্শ, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, নূতন পরিকল্পনা পুরানো কাঠামোর সংস্পর্শে আসিয়া সবই বানচাল হইয়া যাইতেছে, সবই প্রাণহীন ও ভবিষ্যৎহীন বুলিতে পরিণত বা অস্তিত্বশূন্যতার ফাঁকিতে পর্যবসিত হইতেছে। কিন্তু কাঠামোর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আসল কাজ সে চায় না। সে চায় কাজের ভঙ্গি। বাংলা সরকারের শিক্ষা-দপ্তরের কর্মনীতিতে একাধিক বার আমরা তাহা দেখিয়াছি। সম্প্রতি বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাতের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখিতে পাইতেছি, বাংলা দেশের কয়েকটি জেলার সীমাবদ্ধ অঞ্চলে

বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিবার কথা চলিতেছে। যে কোন শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিতে হইলে আগে দেখা দরকার, সেই অঞ্চলে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী আইনের আমলে আসিবে তাহাদের সংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত স্কুল সেই অঞ্চলে আছে কি না। দ্বিতীয়তঃ দেখা দরকার যে স্কুলগুলির অবস্থান ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল কি না। ছোটশিশুদের বেলায় এগুলি বিশেষ করিয়া দেখা দরকার। বিদ্যালয় হইতে চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির দূরত্ব, রাস্তাঘাট, নদীনালা বা রেললাইনের বাধা কতখানি আছে এ সমস্ত বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না থাকিলেও এগুলি দেখা দরকার, কিন্তু আমরা জানি, যে সকল গ্রামবাসী স্কুলবাড়ি তৈরি, বা টাকা পয়সা দিতে পারে না, তাহারা ভাল করিয়া তদ্বির করিতে পারে, তাহাদের গ্রামেই সাধারণতঃ স্কুল বসিয়া থাকে। তাহা ছাড়া শিক্ষা-দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উদ্যোক্তার প্রবৃত্তি সাধনে যে গভর্মেণ্টের ঐকান্তিক অভাব নাই প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষক-দপ্তরের যেকোন পর্যন্ত সকল বিভাগেই সেই গভর্মেণ্টের কৃপণতার কথাও সকলেই জানেন। অতিরিক্ত যখন একদল মহিলা ও গভর্মেণ্টের আর্থিক বিধি ব্যবস্থাও যেখানে অত্যধিক আঁটসাঁট, সেখানে স্কুলের বর্তমান অবস্থান যে শিক্ষকের যাতায়াতের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঠিক করা হয় নাই, ইহা সহজেই ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে অবস্থার পরিবর্তন না ঘটাইয়া পুরাতন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা একটা রাজনৈতিক ভাঁওতা বা লোকভুলানোর সস্তা কৌশল হইতে পারে, কাজ তাহাতে কিছুই হওয়ার আশা করা যায় না। পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া চমকপ্রদ কোন কিছু করিবার চেষ্টা করা বর্তমান শিক্ষা-দপ্তরের পক্ষে নূতন নহে। বুনিয়াদী শিক্ষার দুই দুইটি ট্রেনিং কলেজের ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন। এ পর্যন্ত কত খরচ করিয়া তাহাতে কতজন বিদ্যার্থী সেখান হইতে শিক্ষিত হইয়াছেন ও শিক্ষণের ব্যাপারে কতজনকে কোন কোন কলেজে নিয়োগ করা হইয়াছে, আমরা এ যাবৎ তাহার কোনই খবর জানি না। তাড়াতাড়ি যে সকল মেয়েকে তাঁহারা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ভার নিবার জন্য শিক্ষিত করিয়াছিলেন তাহাদের কোথায় কাজ দেওয়া হইবে, মফঃস্বলে তাহাদের থাকার কি ব্যবস্থা হইবে, স্বল্প বেতনে যেখানে সেখানে থাকিলে তাহাদের সামাজিক মর্যাদা বিষয়ে কি কি আপত্তি থাকিতে পারে, আমাদের শিক্ষা-দপ্তর তাহার বহু আগে হইতে ভাবিতে-ছিলেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। আগে হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ না করার ফল যে সকল ব্যাপারে শিক্ষা-দপ্তরে যে রকম ভুল ত্রুটি ও অব্যবস্থার পরিচয় দিয়াছেন, এ ব্যাপারেও তাহাই হইবে, অথচ কোন রকম কৈফিয়তের জন্যও তাঁহাদের দায়ী করা হইবে না! ইহা কি কাজ করার ইচ্ছা, না সস্তায় কিস্তিমাৎ করার চেষ্টা!

শিশুশিক্ষায় রাজনীতি

খবরের কাগজে খবর বাহির হইয়াছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতি শৈশব হইতেই শিশুদের চিন্তাধারাকে আণবিক বোমা ও আনুষঙ্গিক ভয়াবহ বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা চলিতেছে। A-তে Atom, B-তে Bomb, এইরূপ অক্ষর-পরিচয় করানোর একটা চেষ্টা না কি সেখানে সুরু হইয়াছে। এই খবর কতখানি ঠিক জানি না। অক্ষর-পরিচয়ের পদ্ধতি হিসাবে ইহা নূতন নয়, সকল দেশেই পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে এই প্রথাতেই অক্ষর-পরিচয় করানো হইয়া থাকে। আমরা এই পুরাতন পদ্ধতির বিরুদ্ধে। উদ্বেগজনক ও সৃষ্টিনাশক কাজের মধ্য দিয়া শিশুশিক্ষা ও শিশুর প্রয়োজনমত সেই কাজের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নাম

অথবা পূর্ববাক্য হইতে অক্ষরে যাওয়া, ইহাই আমরা সঙ্গত মনে করি। কিন্তু এখানে দুইটি পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা দেখিতেছি, এখানে 'A' ও 'B'কে পরিচিত করাইবার জন্য Atom ও Bomb কথা দুইটির ব্যবহার করা হয় নাই। Atom ও Bomb কথা দুইটিকে পরিচিত করাইবার জন্যই 'A' ও' B'-এর সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। ইহা শিক্ষাপদ্ধতির কথা নয়, শিক্ষার ভিতর চারনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করিয়া নিবার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। দেখিতেছি, বিভিন্ন দেশের গভর্মেণ্ট অনেক সময় নিজেদের প্রয়োজনে এরূপ করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া সর্বশক্তিগ্রাসী (totalitarian) রাষ্ট্রগুলিকে শিশুকাল হইতেই মানুষকে এইরূপ ছাঁচে ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা করিতে দেখা যায়। শিক্ষা ও শিশুর মনুষ্যত্ববিকাশের ইহা পরিপন্থী বলিয়া আমরা মনে করি। এই জন্য শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য, ও ধারা নির্ধারণের ভার গভর্মেণ্টের হাতে না রাখিয়া দেশের রাষ্ট্রদল-নিরপেক্ষ জাগ্রত সুধীসমাজের উপরে দেওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য আংশিক কর্তৃত্ব তো গভর্মেণ্টের হাতে থাকিবেই। কি রকম ভাবে ইহার সামঞ্জস্য করা যায় এ বিষয়ে সুনিশ্চিত আলোচনা হওয়া উচিত। কিছু ঠিক না করিলে প্রচলিত গভর্মেণ্ট বা গভর্মেণ্টের শিক্ষা-দপ্তরের প্রয়োজন বা খাম-খেয়ালি অনুসারে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপ চলিতেই থাকিবে। তাহা রোধ করা যাইবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন

গত ২৮শে ডিসেম্বর জব্বলপুরে এক কারিগরী শিক্ষায়তন 'কলা-নিকেতন'-এর উদ্বোধন করেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি বলেন যে, দেশের শিক্ষা শুধু ছাত্রের প্রয়োজনের জন্য নয়, রাষ্ট্রেরও কল্যাণ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। তাঁহার মতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা এই তিনটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিভাগেই কিছু পরিবর্তন হওয়া আজ দরকার। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে যাহাতে কষ্টকর না হয় সেজন্য এই শিক্ষা অবৈতনিক করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের দ্বারপথের জন্যই প্রচলিত রহিয়াছে, কিন্তু সব ছেলেমেয়েই কিছু উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত নয়। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষার সময়েই ছেলেমেয়েদের যৌবনকাল, প্রতিভার সম্ভাবনা এই সময়েই উন্মেষিত হয়। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষার সময়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কারিগরী কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন মেধা ও রুচির বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে। তবেই রাষ্ট্র শিল্প, কলা ও বাণিজ্য সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ হইবে, দেশেরও কল্যাণ হইবে। রাষ্ট্রপতির সুচিন্তিত ও সুচিন্তিত অভিভাষণটি উপস্থিত সকলেরই ভাল লাগিয়াছে। শিক্ষা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর হউক, গান্ধীজীর মূলমন্ত্র আমরা যদি সত্যই গ্রহণ করিতে পারি তবে পরাধীনতার কালে অর্জিত গ্লানি ক্রমে ঘুচিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিব।

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। পঁচিশ বৎসর আগে এই কংগ্রেসের শুভ উদ্বোধন করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উদ্বোধনের দিন কবিগুরুর সেই অভি-ভাষণের কথা আজও অনেকেরই মনে গাঁথা আছে। রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবে শ্রীরাধাকৃষ্ণনও তাঁহার সুচিন্তিত বক্তৃতায় আমাদের মর্ম স্পর্শ করিয়াছেন। বক্তৃতার আগে কর্মযোগী মহাত্মা গান্ধী ও ভাবযোগী শ্রীঅরবিন্দ ও মহর্ষি রমণের অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক ভারতের প্রাণশক্তি যে আজও অনির্বাণ ও ভাস্বর আছে, ইহাদের জীবন তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। ভারতবর্ষ বলিতে কেবল একটি সীমাবদ্ধ দেশকেই বুঝায় না, ভারতবর্ষ বলিতে

মানবাত্মার একটি বিশেষ সাহায্যেই বুঝায়। এই চিন্তাধারার মধ্যে কোন প্রকার সৌকার্যের স্থান নাই, যুগে যুগে শত শত মানুষের ধারা আসিয়া এখানে মিলিয়াছে। দূরগত কাল হইতে এই যে চিন্তাধারা ভারতের মনস্বীরা বহন করিয়া আসিতেছেন, ইহারই মধ্যে আছে আজিকার দিনে মানুষের বাঁচিবার পথ, মুক্তির বাণী।

পর পর দুইটি মহাযুদ্ধের অবসানে তৃতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনায় আকুল পৃথিবীতে আজ মানুষের মনে এক সংশয়ের ব্যাকুলতা দেখা যাইতেছে। নেতৃবর্গকে আজ সেই সংশয়ের জাল ছেদ করিতে হইবে। আজ একদিকে বিজ্ঞানবলে সর্বত্র শক্তির দম্ভ ও বড়াই, অন্যদিকে অধ্যাত্মভাব বোধে মানুষ একান্তই কেউটিয়া হইয়া পড়িয়াছে। সামাজিক প্রাণী হিসাবে মানুষ আজ ব্যর্থ। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মননশীল মানুষকে আজ এই দিকে সচেতন হইতে হইবে, সে নেতাই হউক আর সাধারণ মানুষই হউক।

যাহাকেই প্রশ্ন কর, বলিবে, এটা বিজ্ঞানের যুগ। কর্মন মাত্রেই আজ বিজ্ঞান আজ ভাষ্য। বিজ্ঞান জীবনের সকল উদ্ঘাটনের চেষ্টায় ব্যাপৃত কিন্তু আমাদের দেখিতে হইবে বিজ্ঞানের এই অপূর্ব কীর্তির আসল সার্থকতা কি এবং যে উপায়ে বৈজ্ঞানিক তাঁহার মর্মস্থলে পৌঁছিতেছেন তাহাকেও আমাদের যাচাই করিতে হইবে। প্রকৃতি, মানুষ এবং আত্মা, আমাদের বাহিরে কি আছে, ভিতরে এবং ঊর্ধ্বে ই বা কি আছে, বহিঃ প্রকৃতি, মানুষের মন ও আধ্যাত্মিকতা, দার্শনিকের বিচার এই ত্রয়ীর উপর নির্ভর করিবে। দার্শনিকগণ সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য বর্তমান জগতের বাহিকে (challenge) বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। আজ সকলেই ভাঙাগড়া চায়, কিন্তু ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া শান্তিই চায়—দার্শনিক, চিন্তাযোগী সেই শান্তির ললিতবাণী শুনাইবারই প্রয়াসে ধ্যানমগ্ন। কীণ হইলেও নবযুগের আগমনের ধ্বনি শোনা যাইতেছে; শিকল ভাঙার বন্ধনমোচনের পূর্বাভাস আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভেদের ঊর্ধ্বে যে শাশ্বত মানবতার আদর্শ তাহাই নিত্যকালের আরাধনার বস্তু. আর ভারতীয় দার্শনিকগণকে জগতের কাছে সেই অমর বাণীই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ভারতের কাছে সমগ্র বিশ্বকে সেই শিক্ষাই গ্রহণ করিতে হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও বই

[শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য]

প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার একটা বড় পার্থক্য এই যে প্রচলিত শিক্ষা পুস্তককেন্দ্রিক এবং বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক। প্রচলিত শিক্ষায় বইকে অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া হয়, বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজকে অবলম্বন করে। এর থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, বুনিয়াদী শিক্ষায় কি তাহলে বইয়ের কোন প্রয়োজন নাই? যদি থাকে তাহলে তার স্থান কোথায়? ছেলেকে কি পড়তে শেখাতে হবে না? যদি হয় কেমন করে হবে?

শিক্ষা মানে লেখাপড়া নয়, একথা ঠিক। শিক্ষা ছেলের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। লেখাপড়া না হলে যে এই বিকাশ একেবারেই হতে পারে না এমন নয়। তবে, লেখাপড়া যে এই বিকাশের অনেকখানি সহায়তা করে, এও সত্য।

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় তার পরিবেশের প্রভাবে। যে মানুষ লেখাপড়া জানে না তার পরিবেশ দেশকালের একটা সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সে প্রত্যক্ষভাবে যা দেখে এবং শোনে তার বাহিরে সে বেশি দূর যেতে পারে না। দেশের দিক থেকে বা কালের দিক থেকে তার হাতের কাছে যেটুকু আছে, তার নিকট এবং বর্তমান, এই নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গেই দূর এবং অতীত তার কাছে নিজেকে মেলে ধরে, তার পরিবেশ বহুলাংশে বিস্তৃত হয়ে যায়। কাজেই ছেলের পরিপূর্ণ বিকাশে আমাদের লক্ষ্য হলেও তার জন্যই আমাদের তাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে।

তা ছাড়া, আজকালকার সমাজে লেখাপড়ার প্রয়োজন আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে। আগেকার দিনে আমাদের সমাজ ছোট ছিল। সেখানে প্রত্যক্ষভাবেই সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হত। অন্তত প্রাত্যহিক প্রয়োজনে আজকার মত মানুষকে কথায় কথায় বাহিরে যেতে হত না। এই অবস্থা আজ বদলে গেছে। এ পরিবর্তন ভাল হয়েছে না মন্দ হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নাই। ভালই হোক আর মন্দই হোক, যা হয়েছে তাকে স্বীকার করে নিয়েই চলতে হবে। আজ সমাজের বিস্তৃতি আমাদের অনেক বেড়ে গেছে। মানুষকে বাঁচতে হলে আজ, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে না হোক, সমস্ত দেশের সঙ্গে অন্তত যোগাযোগ রাখতে হবে। এ যোগাযোগ প্রত্যক্ষভাবে রাখা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে ছাড়া এ যোগ রক্ষা করা যেতে পারে না। তাই লেখাপড়া আজ অনাবশ্যক বিলাস নয়, একটা অপরিহার্য প্রয়োজন।

পড়তে ছেলেকে শেখাতেই হবে; এবং পড়তে শেখাবার একমাত্র উপায় ছেলেকে পড়তে দেওয়া। এখন, কি পড়তে দেওয়া হবে এবং কি ভাবে পড়তে দেওয়া হবে, সেইটাই চরম প্রশ্ন। সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই বই পড়তে দেওয়া হয় এবং যেভাবে পড়তে দেওয়া হয় তাও আমরা জানি। কিন্তু মুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তো তা হবে না।

মুনিয়াদী শিক্ষা জীবনের ভিতর দিয়ে শিক্ষা। মার্কিন শিক্ষাবিদ আর্থার ই. মর্গ্যানের ভাষায় মুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে learning through the normal course of living a full life as a member of a normal community। এখানে ছেলে যা কিছু শিখবে তার জীবনের প্রয়োজনে শিখবে। কাজেই পড়তে হলেও প্রয়োজনের তাগিদে পড়বে, এই হওয়া উচিত। সেইজন্য ছেলের প্রথম পড়া শুরু হবে তার প্রতিদিনের জীবনকে অবলম্বন করে। প্রথমেই তাকে দিনের হিসাব রাখতে হবে। তার জন্য বার তারিখ লিখতে এবং পড়তে শিখতে হবে। প্রতিদিনই তার কিছু না কিছু কাজ আছে। সেই কাজের পরিকল্পনা করতে হবে, পরদিন হিসাব করে আনতে হবে ও কাজ হয়ে গেলে আবার গুছিয়ে রাখতে হবে, এবং কাজের শেষে কি কাজ হল, কতখানি কাজ হল, তার হিসাব রাখতে হবে। এই সব কিছু উপলক্ষ করেই খানিকটা লিখতে এবং পড়তে হবে। তবে, এইভাবে পড়ার শুধু সূত্রপাত হবে; পড়া এতে বেশি দূর এগোবে না।

দিনকতক পরে ছেলের বয়স যেমন যেমন বাড়তে থাকবে, অমনি পড়ার পরিমাণও একটু একটু করে বাড়বে। ছেলের কোন বিষয়ে কিছু জানার প্রয়োজন হলে শিক্ষক আর শুধু মুখে বলে দিয়েই খালাস হবেন না। মুখে যেটুকু বলার বলবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে বইয়ে যেখানে এ

সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে সেই বইয়ের সেইখানটা এই প্রসঙ্গে পড়তে দেবেন। এইভাবে ছেলের বই পড়া বলতে গেলে আরম্ভ হবে। কিন্তু এই যে পড়া, এর পরিমাণ অনেকটা সীমাবদ্ধ। এ পড়া যেন খানিকটা অভিধান পড়ার মত। আমরা অভিধানের জন্যই অভিধান পড়ি না। কোন বই পড়তে পড়তে কোন একটা কথার অর্থ জানার প্রয়োজন হলে তখন আমরা অভিধান পড়ি। আর তাও যতটুকু তখন আমাদের প্রয়োজন ততটুকুই পড়ি, তার চেয়ে বেশি নয়। এই পড়াও তাই। আমাদের প্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশের কোন একটা ঘটনার অথবা কোন কাজের কোন প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে কিছু জানার প্রয়োজন। সেইটা জানবার জন্য আমরা বইয়ের সাহায্য নিলাম। সমস্ত বইটাই যে পড়লাম তা নয়। আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়টি জানবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই পড়লাম।

কেবল এই একদের পড়ার চিন্তা দিয়ে বেশি পড়া সম্ভব হয় না, এবং সেইজন্য এতে পড়ার অভ্যাসও ঠিক হয় না। তা ছাড়া এই ভাবের পড়াতে অনেক সময়ে একটা বড় জিনিসই বাদ থেকে যায়—সেটা সাহিত্য। মানুষের হৃদয়মনের প্রসারের জন্য সৎসাহিত্য পাঠের প্রয়োজন আছে। সেইজন্য তারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

মানুষের জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে। তাই নানা উপলক্ষে সে নানা রকম উৎসবের সৃষ্টি করেছে। এই উৎসবের প্রয়োজন বাহিরের সমাজজীবনে যেমন, বিদ্যালয়ের সমাজজীবনেও তেমনই। সেইজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। এই উৎসবগুলিকে ভাল করে এবং সুন্দর করে পালন করতে গেলে গান, গল্প, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি অনেক কিছুর প্রয়োজন হবে। তার জন্য ছেলেকে এই-সব জিনিস পড়াতে হবে এবং তার মধ্যে খাঁটি সাহিত্যের পর্যায়ের অনেক জিনিসও থাকবে।

কিন্তু এই পড়াও খানিকটা বাঁধাধরা পড়া। পড়ার কৌশল ভাল করে আয়ত্ত করবার পক্ষে এও ঠিক পর্যাপ্ত নয়। সেইজন্য আরও কিছু পড়তে দেওয়া প্রয়োজন। সেটা কিভাবে দেওয়া যাবে?

ছেলেদের গল্প কবিতা প্রভৃতি শোনার এবং পড়ার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। যতদিন ছোট থাকবে ততদিন শিক্ষককেই গল্প শোনাতে হবে। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে পড়তেও দেওয়া যেতে পারবে। এইভাবে পড়ার কতকটা অভ্যাস হলে পর ছেলেকে পড়বার সুযোগ দিয়ে ছেড়ে দিলে সে আপনা-আপনিই খানিকটা খানিকটা পড়তে চেষ্টা করবে। এ পড়ার কোন সীমা নাই। এখন প্রশ্ন হল, এ পড়া তো প্রয়োজনের তাগিদে পড়া নয়। বুনিয়াদী শিক্ষার যে আদর্শ তার সঙ্গে এ পড়া খাপ খাবে কেমন করে? তার উত্তরে বলা যায়, এও এক হিসাবে প্রয়োজনের তাগিদেই পড়া। তবে, এ প্রয়োজন বাহিরের প্রয়োজন নয়, ভিতরের প্রয়োজন। জীবন তো শুধু বাহিরটা নিয়েই নয়, তার একটা ভিতরের দিকও আছে। সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। করলে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে দেখা হয় না।

তবে, একটা কথা এইখানে বলা দরকার। এই সকল ক্ষেত্রেই সাধারণ স্কুলের পড়ানোর থেকে বুনিয়াদী স্কুলের পড়ানোর একটা তফাত থাকবে। সাধারণ স্কুলে কতকগুলো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকে। সেই পাঠ্যপুস্তক ছেলেকে প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পড়ানো হয়। ছেলের জীবনের প্রয়োজনে সেটা লাগুক আর নাই লাগুক, তার সম্বন্ধে ছেলের কোন স্বাভাবিক আগ্রহ থাকুক আর নাই থাকুক; সাধারণ স্কুলে ছেলে যে বই পড়বে বুনিয়াদী স্কুলেও হয়তো তাই পড়বে। তাহলেও

দুটো পড়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। বুনিয়াদী স্কুলে ছেলে বইটা প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পড়বে না। ছেলের যেদিন যেটা জানা প্রয়োজন সে বই থেকে সেদিন সেইটাই পড়বে। যেটা আগে প্রয়োজন সেটা পরে থাকলেও আগেই পড়বে। তেমনই, যেটা পরে প্রয়োজন সেটা আগে থাকলেও পরে পড়বে। বইয়ের সব জিনিসই যে পড়তে হবে তাও নয়। যেগুলোয় প্রয়োজন ছেলে অনুভব করবে না সেগুলো হয়তো পড়া হবেই না।

শুধু সাহিত্য হিসাবে যা পড়ানো হবে তার বিষয়ের একটা পার্থক্য থাকবে। সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়বার তাগিদটা আসে শিক্ষকের কাছ থেকে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলে নিজের তাগিদে পড়বে। তার পড়াটা হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন পড়া। শিক্ষক ছেলের পড়ায় আগ্রহ জাগিয়ে দিতে পারেন। ছেলের আগ্রহকে অবলম্বন করে হয়তো পুস্তক নির্বাচনও করে দেবেন, কিংবা ছেলে যেখানে ঠিক বুঝতে পারছে না সেখানে তাকে সাহায্যও করবেন। শুধু পড়ার প্রেরণাটা প্রথমত ছেলের কাছ থেকেই আসবে। প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটা পার্থক্য এই যে, প্রচলিত শিক্ষা শিক্ষককেন্দ্রিক, বুনিয়াদী শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক।

শিক্ষাব্রতী নিবারণচন্দ্র

[শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল]

(১)

শিক্ষাব্রতী নিবারণচন্দ্র বৈদ্য আর ইহজগতে নাই। তিনি ছিলেন জাতিতে নমঃশূদ্র, ব্রহ্মমোহন স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স ও ব্রহ্মমোহন কলেজ হইতে আই-এ পাস করেন। পরে বন্ধুদের সঙ্গে কলিকাতায় সিটি কলেজে আসিয়া বি-এ ক্লাসে ভর্তি হন। বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহার পরেই তিনি শিক্ষাব্রত অবলম্বন করেন।

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত গিরোজপুর মহকুমার কিঞ্চিদধিক তিন মাইল উত্তরে কদমতলা নামে বৈদ্য-বাহুল্যবিশিষ্ট একটি গ্রাম আছে। উক্ত সমাজের নেতা যশোহর-নিবাসী বিখ্যাত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার গ্রামে এই একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলটি তখন আধুনিক শিক্ষায় অনগ্রসর ছিল। কদমতলার আশেপাশের বিভিন্ন পল্লীর ছেলেরা আসিয়া এই স্কুলে ভিড় জমাইত। এই গ্রামের প্রায় আড়াই মাইল পূর্বে চরিশ: গ্রামের ছেলে আমরা ; আমরাও গিয়া সেখানে ভর্তি হইলাম। ১৯১৪ সনের জানুয়ারি মাসে তৃতীয় শ্রেণীতে (Class III) ভর্তি হই। এই সময়েই স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা প্রায় তিন শতে দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসরের মধ্যে নূতন বাড়ী তৈয়ার হইল, স্কুলে সঙ্কুলানের আর কোন অসুবিধা রহিল না।

পল্লী-গ্রামের স্কুল, কিন্তু শিক্ষকের দিক দিয়া উহা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। এখানে সবুজপত্র, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র লওয়া হইত। এ ছাড়া দৈনিক সংবাদপত্র তো

ছিলাম। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিলাম তখন, যতদূর মনে হয়, নিবারণচন্দ্র শিক্ষক হইয়া আসিলেন। এই সময়কার প্রথম তিন-চারি জন শিক্ষকই ছিলেন ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের পূর্বতন ছাত্র। সকল দিকেই কেমন একটা যেন নূতনত্ব লক্ষিত হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে আমরা ছাত্রদল শিক্ষকগণের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিতে লাগিলাম। এক দিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী, আর অন্য দিকে খেলা-ধূলা, আলাপ-আলোচনা, সভা-সমিতি প্রত্যেকটি বিষয়েই শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও সহৃদয়তা অনুভূত হইত। আর ইহার কেন্দ্রস্থলে ছিলেন বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক নিবারণচন্দ্র দৈত্য।

এখানে নিবারণবাবু সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া বলিব। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিবারণবাবুর নিকট বহুই ঋণী। তিনি যে প্রতিনিয়ত নিজ জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সহৃদয়-প্রেম-পবিত্রতার আদর্শ-মহিমা ঘোষণা করিতেছিলেন, তাহা আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় বিদ্যালয়ের নৈতিক পরিবেশও যেন নিয়মিত হইয়া গেল। একটি মাত্র উদাহরণ দিই। আমাদের পরীক্ষাকালে নকল করা বা কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করা খুবই সহিত ও ঘৃণিত কাজ বলিয়া মনে করিতাম। পরে কলেজে পড়িতে যখন অন্যত্র গিয়াছি, তখন সেখানকার স্কুল ও কলেজের আবহাওয়া দেখিয়া প্রথম প্রথম বিস্ময় আশ্চর্য বোধ হইত।

নিবারণচন্দ্রের শিক্ষা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু ইহা বলিবার পূর্বে আমাদের ইংরেজি-পাঠনের কি কি আয়োজন হয় তাহা বলিতেছি। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে গেলে প্রত্যেক ছাত্রের হাতে যে একখানি মুদ্রিত লিপি দেওয়া হইত তাহাতে এই মর্মে লেখা থাকিত, স্কুলের পাঠ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক শেষ হইবে না, স্কুলের বাহিরেও তাঁহারা সব সময়ে পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে অবহিত থাকিবেন। এইরূপে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটা *esprit de corps* বা সৌহার্দ ও প্রীতির ভাব পরিস্ফুট হইত। আমাদের বিদ্যালয়েও এইরূপ একটি পরিবেশের সৃষ্টি হইতে লাগিল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ একসঙ্গে খেলা করিতেন, একসঙ্গে বেড়াইতেন, একত্র বসিয়া কথাবার্তা বলিতেন, আবার বিদ্যালয়ের সভা-সমিতিতেও মিলিত হইতেন। পল্লীর ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি এইরূপে একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

নিবারণচন্দ্র খেলাধূলায় বড় একটা যোগ দিতেন না, কিন্তু যোগ না দিলেও এবিষয়ে তাঁহার উৎসাহে এতটুকুও কম দেখি নাই। অন্যান্য সকল দিকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কত কথা হইত তাঁহার সঙ্গে, বড় ভাল লাগিত। কি কি কথা হইত মনে নাই, মনে থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত কাটাইলে মনে হইত, কোন এক নূতন জগতে চলিয়া আসিয়াছি। সে সময়ে প্রত্যেক স্কুলে এক ঘণ্টা করিয়া নীতি-শিক্ষা দানের বোধ হয় ব্যবস্থা করিতে হইত। উপরি-ওয়ালার নির্দেশে আর যাহাই হউক, নীতি-শিক্ষা কতটা হইতে পারে, সন্দেহস্থল। আমাদের বিদ্যালয়েও এইরূপ নীতি-শিক্ষা ক্লাস ('moral class') প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এই পর্যন্ত। ইহার দ্বারা যে আমরা কিছু নীতি-জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এমন তো মনে হয় না।

আমাদের বিদ্যালয়ে আর একটি বিষয়ের আয়োজন হইল, আর তাহার দ্বারা আমরা ছেলের দল বড়ই উপকৃত হইতে লাগিলাম। তখন বুঝি নাই আমরা কতখানি উপকার লাভ করিয়াছি। প্রতি রবিবার প্রাতে স্কুলের ছাত্রদের লইয়া একটি বৈঠক বসিত। পঁয়ত্রিশ বৎসর পরেও এই বৈঠকটির কথা আমার স্পষ্টই মনে আছে। নিবারণচন্দ্র ছিলেন এই বৈঠকের মূলাধার। সদ্গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা

হইত। আবার বক্তৃতাও হইত। কোন কোন রবিবার সহর হইতে স্কুলের সেক্রেটারী দুই-তিন জন বন্ধুসহ আসিয়া আমাদের এই বৈঠকে যোগ দিতেন। কেহ কেহ বক্তৃতাও করিতেন মনে আছে। এই বৈঠক কতদিন চলিয়াছিল, মনে নাই, কিন্তু ইহার স্মৃতি আজও জীবনের পাথেয় হইয়া আছে।

পল্লীগ্রামের স্কুল, দুই মাইল, তিন মাইল, কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কি চারি মাইল দূর হইতে আমরা কিশোর ছেলেরা আসিয়া মিলিত হইতাম। রাস্তাঘাটও এমন ছিল না যে, আমরা যখন-তখন আসিয়া কোন কাজে যোগ দিতে পারি। একারণ সহরের মত দরিদ্রজনের সেবা-শুশ্রূষার জন্য কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পল্লীতে কলেরা রোগেরই প্রাদুর্ভাব হইত বেশী। ছেলেদের ও শিক্ষকবর্গকে ব্যক্তিগত ভাবে সেবা-শুশ্রূষা করিতে দেখিয়াছি। আমাদের মধ্যে যাহারা তখন এ সুযোগ লইতে পারি নাই তাহারা পরবর্তীকালে কঠিন কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীর সেবাতে পশ্চাৎপদ হই নাই। ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন। মানুষের প্রতি দরদ বা মমতাবোধের বীজ বৈশোকেই আমাদের মনে উপ্ত হয়। আর ইহার মূলে ছিলেন শিক্ষাব্রতী নিবারণচন্দ্র। আজ একথা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করিতেছি।

বিদ্যালয়ে একটি ছাত্র-সভা ছিল। এখানে কোন কোন শিক্ষক মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হইত। বক্তৃতা-শক্তির অনুশীলনের পক্ষে এই ছাত্র-সভা একটি প্রধান উপায়। কোন কোন প্রসিদ্ধ নেতার মৃত্যুতে আজকালকার মত আমাদের পল্লীর বিদ্যালয়টি ছুটি দিয়াই ক্ষান্ত হইত না, স্মৃতিসভা হইত, শিক্ষকগণের বক্তৃতায় তাঁহাদের জীবনকথা শুনিতাম। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুতে এইরকম স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন কোন অখ্যাত অথচ উচ্চমনা লোকেরও স্মৃতিসভা হইত। এইরকম একটি সভার কথা এখনও আমার মনে আছে। পার্বতীচরণ পাল নামে একজন নিরক্ষর রাজভীরু বিদ্যালয়টির জন্য দুই কি তিন বিঘা জমি বিনা সর্তে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যথারীতি স্মৃতিসভা হইল। এই সভায় নিবারণচন্দ্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার একটি কথা এখনও মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এগার লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের জন্য নিরক্ষর পল্লীগ্রাম-প্রাণ পার্বতীচরণের এই দুই তিন বিঘা ভূমিদান গুরুত্ব হিসাবে উহার তুলনায় কোন অংশে কম নহে। রাসবিহারীর মত পার্বতীচরণও দেশের গৌরব।

নিবারণচন্দ্র ঈশ্বরভক্ত, বৈষ্ণব; কিন্তু ধর্ম বা শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁহাতে তিল মাত্র স্থান পাইত না—তিনি ছিলেন ইহার উপরে। তখনই হিন্দু সমাজের জাতি ভেদকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শ্রেণী-বিদ্বেষে পরিণত করিবার চেষ্টা তলে তলে চলিতেছিল। আমাদের কিশোর মনেও তখনই ইহার আঁচটা অনুভূত হইতে থাকে। নিবারণচন্দ্রকে দেখিয়াছি, তিনি ছিলেন এসবেরও ঊর্ধ্বে। জাত্যংশে তথাকথিত 'নিম্ন' স্তরের হইলেও তিনি শ্রেণী-বিদ্বেষের কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। হিন্দু সমাজের তথাকথিত উচ্চ নীচ সকলের প্রতিই তিনি বিশেষ প্রীতি-সম্পন্ন ছিলেন; এ-কারণ শ্রেণী-নির্বিশেষে তিনি সকলের শ্রদ্ধা প্রীতিও লাভ করিতে সক্ষম হন। তাঁহার স্বজাতীয়েরা তাঁহাকে অনুযোগ দিত, তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিত, কিন্তু সকলকে মৈত্রীর কথা এমন ভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, আমরা কিশোর ছেলেরা তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। ধর্মের দিক দিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও তাঁহার গোঁড়ামি কখনও দেখি নাই। তাঁহার উদার ঈশ্বর-প্রীতি আমাদিগকে নিজ নিজ ভাবে ঈশ্বর আরাধনায় উদ্বুদ্ধ করিত। মনে

আছে, বৈশাখে দুর্গাপূজার সময় অন্তত দিবার জন্য বৈকালে ৩টা ৪টা পর্যন্ত উপবাসী থাকিতাম। ইহার জন্য যেমন বাড়ীর পরিবেশ, তেমনি বিদ্যারণ-চন্দ্রের শিক্ষা অনেকটা দায়ী। ঈশ্বর-প্রীতি তাঁহার আচার আচরণ দেখিয়াই আমাদের মনে দৃঢ় হয়।

একদিনের কথা মনে আছে। 'মর্যাদ ক্লাসে' বিদ্যারণচন্দ্র আমাদিগকে 'ভক্ত-ভরত' পড়াইয়া শুনাইতেছেন। এখন যাহা 'শিশু-সাহিত্যিক'; শিশু-সাহিত্যে যাহারা ছাইয়া দিয়াছে। তাল, মন্দ, মাঝারি কত রকমেরই না বই এখন দেখি। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে কিন্তু শিশু-সাহিত্য বলিতে সামান্য বই-ই পাওয়া যাইত। দীনেশচন্দ্র সেনের বেহুলা, চীন, ভক্ত-ভরত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত, এই রকম কয়েকখানি মাত্র ছিল পুঁথি। আমরা দীনেশবাবুর বইগুলি খুব পড়িতাম। বিদ্যারণচন্দ্র 'ভক্ত-ভরত' পড়াইয়া শুনাইবার আগে এগুলি পড়ি নাই। তাঁহার পাঠ শুনিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলাম। খানিকটা পড়িতে পড়িতে তাঁহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছিল। ভরতের অবস্থা পরিবর্তন, আবার ভগবৎ কৃপায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া সকলই শুনিতে লাগিলাম। বিদ্যারণচন্দ্রের পাঠগুণে—তখন দীনেশচন্দ্রের লিপি কৌশল বুঝিবার সামর্থ্য হয় নাই—আমরা ভক্ত-ভরতের সঙ্গে যেন একাত্ম হইয়া গেলাম। এই যে ভাষার সঙ্গে পুস্তক পাঠ, এবং তাহার ভাবে নিজে অনুপ্রাণিত হওয়া—ইহার প্রত্যক্ষ শিক্ষা পাইলাম বিদ্যারণচন্দ্রের নিকট। তাঁহার বিদেহী আত্মাকে আজ বার বার নমস্কার করি।

ক্লাসে তাঁহার পাঠ্যপুস্তক পড়াইবার রীতিও ছিল চিত্তাকর্ষক। পাঠ্যপুস্তকের উপর ছাত্র মাত্রেরই স্বভাবত একটা বীতরাগ থাকে। আমরা সৌভাগ্যক্রমে প্রায় একই সময়ে এমন কয়েকজন শিক্ষক পাইয়াছিলাম যাঁহাদের পাঠনা-রীতিতে এই প্রবচনপ্রায় উক্তি যেন হার মানিয়া গিয়াছিল। এখানে বিদ্যারণচন্দ্রের কথাই বলি। তিনি আমাদের পঞ্চম শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইতেন। তখন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে নিপিং-এর *Fifth Reader* ও *Sixth Reader* পাঠ্য ছিল। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু প্রশ্নোত্তর ক্রমে বর্ণিত। ইহাকে শিক্ষণ-রীতির পরিভাষায় 'Direct Method' বলে। বিদ্যারণচন্দ্রের পাঠ দেওয়া ও নেওয়া এই রীতিতেই হইত। যেমন একটি অধ্যায়ে রাম ও রহিমের কথাবার্তার মধ্য দিয়া বিষয়টি বুঝানো হইয়াছে। আমরা এক জনে রাম ও একজনে রহিম হইলাম। প্রত্যেকের মুখে যথাযথ প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া হইল। অবশ্য বিষয়টির মর্ম আগে আমরা বুঝিয়া লইতাম। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়টি যেন মনে গাঁথিয়া যাইত।

এক দিনের কথা। 'Alexander and the Robber' পড়ানো হইতেছে। আমরা পূর্বেই শব্দার্থ লিখিয়া লইয়াছিলাম। আমি এবং আর একটি ছেলে—যে ঠিক স্মরণ হইতেছে না—'আলেকজাণ্ডার' ও 'রবার' হইলাম। আমি, যতদূর মনে পড়ে, আলেকজাণ্ডার হইয়াছিলাম। দুই জনে প্রশ্নোত্তর করিতে করিতে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে বারান্দায় খানিকটা গিয়াছিলাম। আবার দুইজনে ফিরিয়া ঘরের মধ্যে আসিলাম। যথাযথ আবৃত্তি এবং পাঠ শিখিলে পঠিত বিষয়ের মর্মার্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের ছেলেদের সেক্সপীয়র পড়াইতেন। তাঁহার আবৃত্তি এবং পাঠ শুনিয়াই তাঁহারা বিষয়টির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন—রিচার্ডসনের অন্যতম ছাত্র ভোলানাথচন্দ্র ইহা বলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যারণচন্দ্রের অধ্যাপনায়ও একটি অংগ ছিল আবৃত্তি ও পাঠ। প্রশ্নোত্তর-কালে আমাদের উচ্চারণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইত।

ইংরেজী পুস্তকের একটি অধ্যায়ের নাম ছিল, মনে হয়, Line of Honour। সীতা লক্ষ্মণ-চিহ্নিত গণ্ডীর বাহিরে যাওয়াতেই রাবণ কর্তৃক হৃত হইয়াছিলেন। এই গণ্ডীর ভিতরে থাকিলে রাবণের সাধ্য ছিল না যে, সীতার দেহ স্পর্শ করে। এই গণ্ডীকেই 'Line of Honour' নাম দেওয়া হইয়াছিল। নিবারণচন্দ্র খড়িমাটি দিয়া ঘরের মধ্যে একটি লাইন টানিয়া দিলেন। ইহাই হইল লক্ষ্মণ-চিহ্নিত গণ্ডী। আমাদের দু'জনে প্রশ্নোত্তরে বিষয়বস্তু বলিতে লাগিলাম। নিবারণ-চন্দ্রের এতাদৃশ শিক্ষাগুণে আমরা শুধু পাঠের অর্থই বুঝিয়া লই নাই, আত্মসম্মান বা 'আত্মমর্যাদা' রক্ষার জন্য যে আমাদের মধ্যে সকলের অলক্ষিতে এইরূপ গণ্ডী টানা রহিয়াছে, আর এই গণ্ডী অতিক্রম করিলেই যে সকলরকম বিপদ, তাহাও আমরা সেইদিন হইতে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা হইলে নিবারণ-চন্দ্রের খড়িমাটি দিয়া আঁকা সেই লাইনটির কথা অদ্যাবধি মনে হয়।

বড়ো এক বৎসর নিবারণচন্দ্র এই বিদ্যালয়ে ছিলেন না। আমরা সপ্তম শ্রেণীতে (Class VII) উঠিতেই দেখি, নিবারণবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহার পর অনুমান এক বৎসর এখানে ছিলেন। এবারেও আমরা তাঁহার নিকট ইংরেজী পড়িয়াছিলাম। আমরা সপ্তম শ্রেণীতে উঠিয়াছি, অথচ অনেকেই তখন বাক্যরচনার মূলসূত্রগুলি আয়ত্ত করিতে পারি নাই। নিবারণচন্দ্র ইংরেজী ক্রিয়া-পদগুলি Conjugate করাইতে লাগিলেন। সংস্কৃতের যেমন ধাতুরূপ লিখিতে হয়, ইংরেজীরও সেইরূপ লেখা প্রয়োজন। বোর্ডে লিখিয়া তিনি হয়তো একবার দেখাইয়া দিতেন, আমাদের দিয়া তিনি দশবার লিখাইতেন। তাঁহার বুঝাইবার ধরণ এমনই সুন্দর ছিল যে, এই ধাতুরূপের মধ্যেও আমরা যেন রস পাইতে লাগিলাম। শিক্ষকের শিক্ষাদানের এইখানেই তো সার্থকতা। সেই যে আমাদের মনে কর্তা ও ক্রিয়াপদের যোগ সাধন হইল, তাহা আর কখনও ভুলিতে পারি নাই। আর ইহাই পরীক্ষা-বৈতরণী পার হইবার উপায়-স্বরূপ হইয়াছিল। এখনও যদি এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অল্প সময়ে হয়তো অধিকতর সুফল পাওয়া যাইতে পারে। স্কুলের ভিতরে ও বাহিরের নিবারণচন্দ্রের শিক্ষা আমাদের সভীব করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার নিকটে ঋণী ও ব্রত বিষয়াদি স্মরণ করিয়া আজ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

ইংরেজীর মোহ

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ]

'কী বাসা চোত উচ্চারণ মেয়েটির। পাদরী স্কুলে সাধে কি লোকে ছেলে-মেয়েদের পাঠায়।'

মুখর বন্ধুটির ইংরেজী উচ্চারণের পঞ্চমুখ প্রশংসা শুনিয়া একটি চিত্র মনে ভাসিয়া উঠিল।

পিতা—Have you had from mamma a hookey stick?

পুত্র—No, mamma won't give.

পিতা—Then go on hunger strike.

পুত্র—That I wont, I don't want to go hungry.

ছেলেটির বয়স সাত কি আট। পাদরী স্কুলে সে পড়ে। সুতরাং স্কুলে যাওয়া-চিত্ত তাকে ইংরেজীতেই করিতে হয়। পুত্রের ইংরেজী বচনের নবিসী, পাদরী সাহেবের হাতে সংশিক্ষিত পিতা

নিরস্ত নহেন, রাস্তাঘাটের শিক্ষা বালক পুত্রকে সঙ্গে ইংরেজীর তালিম দেন। কথোপকথনটি মাস্টার কানে আসিতেছিল।

ইংরেজী উচ্চারণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, পিতাপুত্রের ইংরেজী কথোপকথন কানে বিষবৎ লাগিল। এই বিকৃতি কি স্বাভাবিক? না, বিকৃত মনোভাবের পরিচায়ক?—এই প্রশ্ন মনে বারবার উঁকিঝুঁকি মারিয়াছে। ইংরেজীর শুদ্ধ নিখুঁত উচ্চারণে আপত্তি নয়; আপত্তি নিজ মাকে উপেক্ষা করিয়া পরের মাকে আদর করিতে যে মত্ত হইয়াছি তাহাতে। এই দুইটি চিত্রের উল্লেখ করিতাম না যদি দেখিতাম গীতার ভাষা, শাস্ত্রের ভাষা, মন্ত্রের ভাষার সংস্কৃতের নিখুঁত উচ্চারণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আছে ভাল, আমাদের মাতৃভাষার উচ্চারণের দিকেই কি আমাদের নজর আছে! শ, ষ, স এবং ণ ও ন-এর উচ্চারণে আমরা একই ভাবে করি। ই, ঈ, উ, ঊ-র উচ্চারণেই বা ভেদ করেন কজন?

কস্তুরবা'র মৃত্যু তিথিতে গীতা আদ্যন্ত পাঠ হইত। গান্ধী তখন নোয়াখালিতে এইরূপ এক তিথিতে একজন বাঙ্গালী অভিজ্ঞ গীতা পাঠ করেন। গীতা-পাঠ শেষ হইলে গান্ধী সকলকে ডাকিয়া বলেন—এর চাইতে গীতা পাঠ না হলেই ভাল ছিল। অশুদ্ধ উচ্চারণে গীতা পাঠ করে মৃতের আত্মাকে অবমাননা করতে চাই না।

কোথাও পড়িয়াছি, আপনারাও পড়িয়া থাকিবেন:

'বাঙ্গালী আচার্যের কাছে, ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে অন্য প্রদেশ হইতে শিক্ষার্থী আসেন। সংস্কৃতের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে আচার্যের সব কথা তাঁহারা ধরিতে পারেন না; পরস্পরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁহারা তাকাইতে থাকেন।

সম-সংস্কৃতিক, সম-ভাবে-ভাবিত, সংস্কৃত-নিষ্পন্ন-ভাষাভাষী আমাদেরই দেশবাসী আমার উচ্চারণ বুঝে না। তাহা সংশোধন করার দিকে চেষ্টার লেশ আমার নাই! আর বিদেশী কণ্ঠের অনুকরণে বিদেশীর ভাষার নিখুঁত উচ্চারণের কসরতের আমার শেষ নাই। ইহাতে পরমাণু চিকীর্ষার হৈতু ও গ্লানি রহিয়াছে। গ্লানিটাকেই শ্রেয় মনে করিতেছি।

এই পরানুচিকীর্ষা মনুষ্যত্বেরই নামান্তর। মনুষ্যত্ব মানুষের ধর্ম নহে। ব্যক্তিমানস বোধ জাতির শক্তির আধার। তাহাতে বিদেশীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি বা ভাষার প্রতি দ্বেষ নাই। নিজ মাতাকে যে সম্মানে, শ্রদ্ধা করে, পরমাতাকে সে কখনও অসম্মান, অশ্রদ্ধা করে না, করিতে পারে না। ইহাতে পরানুচিকীর্ষার হৈতু ও গ্লানি রহিয়াছে। গ্লানিটাকেই শ্রেয় মনে করিতেছি। আর মরিয়াছি এখানেই।

বিদেশী ভাষা আর জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রাচীর তুলিয়া রুখিবার কথা বলিতেছি না। দেশের হিতের জন্য দেশ-বিদেশের ভাষা শিখিতে হয় তো শতবার শিখিব, কিন্তু তা কেবল দেশ ও দশের হিতের তাড়নায়, নিজ আধিক সুখসুবিধার তাড়নায় নয়, আত্ম-যশ, আত্ম খ্যাতির বাসনায় নয়। গান্ধীর কথায় আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করিতেছি। তাঁরা কালেলকর লিখিতেছেন:

"সম্ভবতঃ ১৯১৫ সালের কথা। বাপু লিখিতেছিলেন। পাশে বসিয়া আমি ওয়ল্ট হ্যুইটম্যানের কবিতাংশের অনুবাদ পড়িতেছিলাম। হ্যুইটম্যানের অনুবাদের অংশের প্রশংসা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু বইটা পড়া ছিল না। নিজের অজ্ঞতা দূর করার নিমিত্ত একখানি বই যোগাড় করিলাম। আর মহা আগ্রহে পড়িতে লাগিলাম। বইটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমার দিকে বাপুর দৃষ্টি পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি পড়িতেছ?' বইয়ের নাম করিলাম। নূতন পরিচয়। সাক্ষাৎ উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছা বাপুর ছিল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলিয়া তিনি কহিলেন—'ইংরেজী কবিতার প্রতি আমারও গভীর টান ছিল। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগিল —ইংরেজী কবিতা পড়ার অধিকার আমার কোথায়? সংস্কৃতের যতটা জ্ঞান থাকা দরকার তাহা আমার আছে কি? অবসর যদি পাই তো মাতৃভাষা গুজরাটিতে লেখার যোগ্যতা বাড়াইব না কেন? দেশসেবাই আজ আমার কাজ, তাই সেবা করার শক্তি বাড়ানোর দিকে সকল শক্তি নিয়োগ করাই তো আমার কর্তব্য'। একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন—'দেশসেবার নিমিত্ত যদি কিছু ত্যাগ করিয়া থাকি ত সে ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগ। পরসা রোজগারের বা পশারওয়ালা হওয়ার বাসনা (career) ত্যাগকে আমি ত্যাগই বলি না। সেদিকে রুচি তো আমার ছিল না। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আমার ষোল আনা অনুরাগ ছিল। তবুও আমি নিশ্চয় করিয়াছি, তাহাও আমায় ছাড়িতে হইবে।' (বাপু-স্মরণ হইতে)

স্বাধীন ভারতে যাহা করিয়াছি, করিয়াছি। স্বাধীন ভারতে এই পরাক্তচিকীর্ষা আমাদের শোভা পায় না। তাহা অযুক্তি। স্বাধীন রাষ্ট্রের লাল-বহনকল্প স্বাভিমানী মানুষের সৃষ্টির তাহা অন্তরায়।

কিশোরচিত্ত পথের ও পাঁচালী

[শ্রীবকুলমালা সেন]

"পথের পাঁচালীর" সাহিত্যিক মূল্য কোন সাড়ম্বর বিচারবিশ্লেষণের অপেক্ষা না রাখিয়াই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। যে অল্পসংখ্যক উপন্যাসের প্রতিকূল সমালোচক একজনও নাই বলা চলে, ইহা যে শুধু সেই শ্রেণীর অন্তর্গত তাহাই নয়, তাহা ছাড়াও ইহাতে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য আজ পর্যন্ত ইহা বঙ্গসাহিত্যে একক ও অদ্বিতীয়। ইহার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি —মানুষের সহিত প্রকৃতির নিবিড় সংযোগ, অপরটি—অপূর্ব দক্ষতায় মানবের শৈশব, বাল্য ও ও কৈশোরের মানসিক স্তরের ক্রম উদ্ঘাটন।

পথের পাঁচালীর শিশু-নায়ক অপুর মানসিক স্তরের পাতাগুলি একটি একটি করিয়া উল্টাইতে গিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। মনো-বিজ্ঞানের মত এমন জটিল গূঢ় বিষয়কে উপন্যাসের আকারে পরিবেশন করিতে তাঁহার লেখনীর সাবলীল গতিতে একটুকু বাধা ঘটে নাই। অথচ মনোবিজ্ঞানসম্মত তথ্যের দ্বারা ইহা এমন পরিপূর্ণ যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া পাঠ করিলে মনে হয়, যেন অপুর চরিত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল।

মুখচোরা অপু নিরীহ, কোমলচিত্ত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূজারী, ভাবপ্রবণ, বিদ্যানুরাগী, একটু একটু লেখার অভ্যাস আছে—পথের পাঁচালীতে অপুর এই চিত্রই আমরা পাই। তাহার চরিত্রে এই গুণগুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য লেখক মনো-বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলির সুকৌশলে কিরূপ সুষ্ঠু প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

প্রথমেই মনে পড়ে, দোলনায় দুলিতে দুলিতে অপু মায়ের মুখে ছড়া ও গান শুনিতেছে। সঙ্গীত ও ছন্দের সাহায্যে তাহার সহজাত বৃত্তি উন্মেষের স্বাভাবিক পথ পাইয়াছে। মায়ের আদর, দিদির স্নেহ, শিশির আনন্দের মধ্য দিয়া অপুর সহজাত প্রকৃতি প্রাথমিক স্ফুরণে কোথাও বাধা পায় নাই। তাই তাহার স্বকীয় বিশেষ গুণগুলির মধ্যে প্রধানতম যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা—তাহা যখন পূর্ণ বিকশিত হইবার পথে অগ্রসর হইল, তখন বহি-

জগতের অসীম সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সেই আনন্দ বরণ করিয়া লইতে, তাহার মনপ্রাণ উন্মুখ হইয়াই ছিল। লেখকের অপূর্ব লিপি-কুশলতায় নিশ্চিন্দিপুরের বুকভরা, বন-জোপ, নদী-মাঠ, প্রভাত-সন্ধ্যা আমাদের মনশ্চক্ষে যেমন জীবন্ত হইয়া বিরাজ করে, তেমনই করিয়াই সেগুলি অনন্ত দরদ লইয়া শিশু অপুকে আনন্দে আলিঙ্গন করিয়াছিল। তাহার মন, প্রাণ, দেহের প্রতিটি তার এই সৌন্দর্যরসে সিক্ত হইয়াই তাহাকে ভাব-প্রবণ কোমলচিত্ত করিয়া গড়িয়া তুলিল। এই সৌন্দর্যানুভূতিই ভৈরবের তাহার লেখার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু শুধু সৌন্দর্যের অনুভূতিই ভবিষ্যৎ লেখকের একমাত্র সম্পদ হইলে চলে না, তাহার জাগ্রত কল্পনা শক্তি ও ভাবের প্রাচুর্য থাকা দরকার। লেখক সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রভাব তাহার কল্পনা-শক্তিকে উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোমটা খোলা জোনাকীর মায়ের মুখে শোনা ব্যাঙমা ব্যাঙমীর গল্প, নির্বাসিত রাজপুত্র, শ্যামলতার দেশ। শুধু তাহাই নয়, প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের শিক্ষকতার গুণে না হইলেও তাঁহার পাঠশালায় অপুর মনের ভাণ্ডার একটু একটু করিয়া নানা কাল্পনিক চিত্রে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। হীরু পালিত, রাজু রায়, সাধ্যাল মহাশয়ের রকম-বেরকমের আজগুবি গল্পের ভিতর দিয়া, 'জলসার মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরির' প্রতিশিখরের মধ্য দিয়া অজানা অদেখা দেশের মনোজ্ঞ চিত্র সে কল্পনায় আঁকিতে শিখিল, বড় হইয়া সে যে ব্যাঙ-ভাঙা জোবার ধারে তামাকের দোকান দিবে তাহা কল্পনা করিতে শিখিল।

সৌন্দর্য পায় হইয়া অপু বাল্যে পদার্পণ করিয়াছে। লেখক তাঁহার মানসসৃষ্টি অপুর ভবিষ্যৎ লেখক হইবার সমস্ত উপাদান—তাহার অভাব মোচন করিবার ব্যবস্থা এখানেই করিয়াছেন। পিতার দারিদ্র্যের জন্য সে আর বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না, কিন্তু সেজন্য তাহার জ্ঞানশিক্ষার বাধা ঘটে নাই। তাহার আগ্রহে সে ঘুরন মুখুজ্জের বাড়ীর বইএর আলমারী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, নির্জন দুপুরে প্রাকৃতিক পরিবেশের স্নিগ্ধতায় তাহা হইতে রস ও ভাষা উভয়ই আহরণ করিয়াছে।

প্রখ্যাতনামা মনোবিদ্‌গণের মতে অতি সহজ সরল পথে শিক্ষার বিঘ্ন ঘটে। মাঝে মাঝে বাধার সৃষ্টি হইলেই আগ্রহ জাগ্রত হয় ও তাহার ফলে শিক্ষা হয় দৃঢ়। অপুর জীবনেও বিদ্যালয়ে সৃষ্টির মধ্যেদিয়াই মনোবিকাশ করিতে দেখা আমরা এই তথ্যের সত্যতা অনুভব করি। বিদ্যালয়ে শিক্ষার পথ রুদ্ধ হওয়াতেই অপু ভুবন মুখুজ্জের বই-এর আলমারীর সন্ধান পাইয়াছিল, বঙ্গবাসী পত্রিকাটির জন্য সারা সপ্তাহ ধরিয়া উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করিত।

অপুর আলো পদার্পণের প্রথম ভাগে শিশুদের সংগ্রহ প্রবৃত্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়, এবং এই প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা না করিলে তাহার পরিণাম যে কি হইতে পারে লেখক অপূর্ব কুশলতায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এ সময় সহজ বৃত্তির প্রেরণায় অপরাপর বহু বালকের মত দরিদ্রের সন্তান অপুরও কতকগুলি নিজস্ব জিনিস জুটিয়াছে—তাহা টিনের বাকস, টিনের ভেঁপু, কাঠের মোড়া, আরও কত কি। কিন্তু এ সময় শিশুর মানসিক চাহিদা মিটাইতে না পারিলে, অথবা তাহাতে বাধা দিলে, সে গোপনে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। তাই অপু মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কাঁসি হইতে কড়ি সংগ্রহ করিয়াছে। মানসিক স্তরের এই পর্যায়ে স্বাভাবিক সংগ্রহবৃত্তিকে প্রকাশের সহজ পথ বহাইয়া না দিলে তাহা কুটিল পথে আত্ম-প্রকাশের পথ ধরিয়া ক্রমশঃ যে চৌর্যবৃত্তিতে পরিণত হইতে পারে, লেখক এখানে ইঙ্গিতে সেই কথাই বলিয়াছেন।

কিন্তু অপু এমন নিরীহ মুখচোরা হইল কেন? ইহার কারণও স্পষ্ট। বালো সমবয়সী সাথী-গণের সঙ্গে মেলামেশায় ভিতর দিয়া ভাবের আদান-প্রদান হয়, পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, মনের ভাব মুখের ভাষায় প্রকাশ করিবার পথ খুলিয়া যায়। কিন্তু অপুর সঙ্গীর প্রায়ই ছিল না। মা মৃতপ্রায়া, দিদি দুর্গা, এবং রাণুদিই তাহার বালোর প্রধান সঙ্গী। অসমবয়সী সঙ্গীর সাহচর্য তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে নাই। নীলু, কিষ্ট, পটল, নেড়া প্রভৃতি আর যে দু-চারিজন সঙ্গীর নাম প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া যায়, সামাজিক ও প্রকৃতিগত বাধা সে সুযোগও পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে দেয় নাই। যখন যে প্রবৃত্তি উন্মেষের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়, তখনই তাহাতে সোনার কাঠির স্পর্শের প্রয়োজন; অপুর জীবনে ইহার অভাব ঘটিয়াছে, তাই সে চিরদিন লাজুক মুখচোরা হইয়াই থাকিল। বাল্য হইতে কৈশোরের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত তাহার আত্মসম্মানবোধের যে অভাব আমাদের চোখে পড়ে, যে জন্য সে নিতান্তই নিরীহ, যে জন্য সে কাশীতে বিয়েবাড়ীর উৎসব মণ্ডপে অন্যায় ভাবে উৎপীড়িত হইয়াও প্রতিশোধ লইবার বা প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা তো করেই নাই, এমন কি অপমান বোধও করে নাই—তাহাও বাল্যের এই সমবয়সী সঙ্গীর অভাবের ফল। খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়াই আত্মবোধ জাগ্রত হয়, প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহাতে বিফল হইলে আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে, প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা প্রেরণা পায়। এই বৃত্তি-গুলিই সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া পরে আত্ম-মর্যাদার ভিত্তি লাভ করে। অপুর জীবনে এ সুযোগ ঘটে নাই। শুধু তাহাই নয়, সুনীল, সুরেশ প্রভৃতি দু-একটি উন্নত-চরিত্র বালকের সংসর্গ তাহার চরিত্রের এই বিশেষ দিকটির বিকাশের পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়াছে।

কিন্তু ইহার পর তাহার কিশোর কালের যে সামান্য অংশের পরিচয় আমরা পথের পাঁচালীতে পাই, সেই সময় তাহার কিশোর মনের বিকাশের যোগ্য আয়োজনে লেখক ত্রুটী করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—" ● ● ● এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা জন্মায়। এই সময় যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্ম-বিক্রীত হইয়া থাকে। ● ● ● এই বয়সেই সাধারণত নারীপ্রকৃতিকে এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দূতী জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ করে, অতএব তাহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়। অন্তর যত একটা অবুঝ ভালবাসা, একটা অবাক ব্যাকুলতা এই সময়েই জন্মে। অপুর জীবনের এই বিশেষ বয়সের বিশেষ ভাবগুলি ফুটাইতে লেখক প্রয়োজনীয় সকল আয়োজনই করিয়াছেন। এই সময় অপু আবার বিদ্যালয়ের পাঠের সুযোগে সহপাঠিগণের সাহচর্য লাভ করিয়াছে। তাহারা অপুকে পছন্দ করে, খেলার মাঠে তাহার উপস্থিতি বিশেষ ভাবে কামনা করে। তাহার নিজের রচনা স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই আয়োজনে সম্পূর্ণতা দিতে যেন যৌবনীর মেয়ে লীলারও যে প্রয়োজন ছিল, লেখক সে বিষয়েও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। লীলা তাহার সঙ্গে গল্প করিতে ভালবাসে, আগ্রহ করিয়া নিজের বই তাহাকে পড়িতে দেয়, তাহার রচনার প্রশংসা করে। লীলা তাহার ঐশ্বর্যের গৌরবের কথা বলিয়া অপুর সামনে প্রকাশ করিলে, তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেয়, নিজের ব্যবহারের কাউন্টেন পেন অপুকে দান করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে। মায়ের অপরিমিত স্নেহ তো ছিলই, তদুপরি মেজবৌরাণীর স্নেহের পরোক্ষ প্রকাশও উপন্যাসের উপভোগের মধ্য দিয়া, তাহার

লেখা পড়িয়া প্রশংসা করার মধ্য দিয়া, সজীব হইয়া উঠে। এই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় অপুর যাদু আত্মবোধ জাগিয়া উঠিবার পথ পাইয়াছে, তাই এখন আর কোনরূপ হীনতা স্বীকার করিতে তাহার মন সায় দেয় না। লীলার কাছে 'স্কুলে পড়ি না' একথা বলিতে আত্মসম্মানে বাধে, তাই কথাটা এমন ভাবে প্রকাশ করে, যেন এই স্কুলে না পড়াটা একটা খুব বাহাদুরীর বিষয়। বইয়ের এক্‌জেকাদের পরের সূত্রে সেও যে একটা অসমসাহসিক কিছু করিবে, বিস্মিত লীলাকে তাহা জানাইয়া সর্বশিরিত আনন্দ অনুভব করে। এইরূপেই ক্রমশ তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা-প্রবৃত্তি চরিত্রে স্থিতি লাভ করে। লীলার কাছে আত্ম-মর্যাদা রক্ষার আগ্রহ তাহাকে অন্যায় অশোভন কাজে বাধা দেয়। একদিন মায়ের সখ করিয়া সিগারেট খাওয়ার কথা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন অসীম লজ্জার মধ্যেও সে মনে মনে এই ভাবিয়া স্বস্তি পাইল যে লীলা এ কথা শুনে নাই। যাহার কাছে প্রশংসা পাওয়া যায়, তাহার কাছেই নিন্দাভাজন হইবার ভয় মানুষের সব চেয়ে বেশি। কেহ যদি আমাকে পরম বিশ্বাসে সৎ মনে করে, তবে তাহার সেই বিশ্বাসরক্ষার আগ্রহই আমাকে সকল অসৎ কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবে, ইহাই মানব-প্রকৃতির রীতি।

কিন্তু প্রায় সকল মানুষেরই সহজাত প্রবৃত্তি-গুলির মধ্যে দু-একটি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রবৃত্তি থাকে। সৌন্দর্যপ্রিয়তা, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অপুর স্বাভাবিক প্রধান বৃত্তি। শৈশব ও বাল্যে তাহার অন্তর্নিহিত এই ভাবের স্ফুরণে কোন বাধা ঘটে নাই। বাহিরের অনুকূল পরিবেশ অন্তঃপ্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া তাহার অনুভূতিতে, তাহার মনেপ্রাণে, তাহার হৃদয়ে যে অনাবিল সৌন্দর্যের ছবি আঁকিয়া দিয়াছে, তাহার ঔজ্জ্বল্য ও সম্পূর্ণতা অপুকে মুগ্ধ ও কবি করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। এই শৈশবের লীলাভূমি নিশ্চিন্দিপুরের কথা মনে পড়িলেই তাহার মন সেখানে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। লেখক তাঁহার মানসসৃষ্টি অপুর চরিত্রে এই বিশেষত্ব প্রধানতঃ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছিলেন, এবং তাহা যে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

শিক্ষা

এ হি কন্যাপক্বৎ কশ্চিদ্ দুর্গস্থিং তাত পঙ্ক্তিং

১ম বর্ষ	পৌষ ১৩৫৭	২য় সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষকের সংবর্ধনা

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন (জন্ম ১৮৯০) সংযুক্ত প্রদেশে বাল্যজীবন কাটাইয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি. এ., এম্. এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর শ্রীরামপুরে ওকালতি করিবার সময়ে ১৯২০ সালে তাঁহাকে কলিকাতা সারস্বত কক্সির বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কর্মভার লইতে অনুরোধ করা হয়। সত্যরঞ্জনবাবু ১৯২০ ফেব্রুয়ারি হইতে ১৯৫০ আগস্ট পর্যন্ত এই কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও বিবিধ সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রেরা তাঁহাকে সংবর্ধিত করে। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একজন হিন্দীতে ও অপরজন সংস্কৃত ভাষায় 'পদ্য-প্রসূন' তাঁহাকে নিবেদন করেন। প্রাক্তন ছাত্রগণ গত ২৮ জানুয়ারি একত্র হইয়া মানপত্রের সহিত কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ৫০০১৲ পাঁচ হাজার একটাকার এক থলি তাঁহাকে অর্পণ করেন।

সারস্বত কক্সির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৩ সালে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দীভাষী ছাত্রদের বিদ্যার্জনের সুযোগ দেওয়া। ১৯১৮ সালে ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। সত্যরঞ্জন বাবুর পরিচালনাধীনে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া তিন শত হইতে সাত শতে দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফলও সন্তোষজনক। তাঁহার যোগ্যতার সংবর্ধনায় আমরা আনন্দিত। হিন্দী ভাষী ছাত্র বাঙ্গালী শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষা করিতেছে, বর্তমানের প্রাদেশিকতাবিষুক্ত ভারতে ইহা বিশেষ গৌরবের কথা।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন সংবর্ধনা সভার সভাপতিরূপে সত্যরঞ্জন বাবুর হাতে টাকাটা তুলিয়া দিবার সময় বলেন, আজকালকার বাজারে ৫০০১৲ নিতান্ত সামান্য নহে, যদিও এ ব্যাপারে টাকার পরিমাণটা বড় কথা নয়, মর্যাদাটাই বড় কথা। প্রাক্তন ছাত্রমণ্ডল সক্রিয় হইলে যে বিদ্যালয়ের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারে, এবং বর্তমান ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে করিবে, সে কথা বলিয়া তিনি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিলেন।

শিক্ষাব্রতী যতীন্দ্রমোহন রায়

সম্প্রতি কলিকাতায় বাংলাদেশের একজন মহৎ কর্মী, দেশপ্রেমিক যতীন্দ্রমোহন রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আগে তিনি ছিলেন শিক্ষক, তাঁহার কর্ম ছিল ছাত্রদের জীবন গঠন করা। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছাত্রদের বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিতেন, সেই বিপ্লব শুধু রাষ্ট্রীয় বিপ্লব নয়। সামাজিক ও নৈতিক যে সকল দোষ ত্রুটি দেখিয়া তাঁহার বুকে আগুন জ্বলিত তাহাদের সংস্কারের জন্য তিনি দেশে মানুষ সৃষ্টির কাজে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। যুবকদের জন্য তাঁহার অসীম দরদ ছিল, এই দরদভরা হৃদয়টিই দলে দলে যুবকদের তাঁহার কাছে টানিয়া আনিয়াছিল। আজ দেশে এমন শিক্ষক তো বেশি দেখি না।

নিরঞ্জন বৈরাগী স্মৃতি ভাণ্ডার

নির্জনে ফুটিয়া নীরবে ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু কাছের মানুষের চিত্ত সুবাসে ভরিয়া রাখিয়া যায়, এমন লোকের দেখা আমরা কখনও কখনও পাইয়া থাকি। অল্প কালের দীমার মধ্যেই ইহারা নিজেদের কাজ করিয়া সার্থক জীবন লাভ করে। কিন্তু যে দুই চারিটি জীবনকে ইহারা সুমধুর সুরে ভরিয়া দিয়া যায় তাহারা ইহাদের ভুলিতে পারে না।

শিক্ষাব্রতী কুমারী নিরঞ্জন বৈরাগী ছিলেন এমনই একজন নীরব কর্মী। ইনি শিক্ষকতার কাজে আপনাকে একান্ত ভাবে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘদিনের কঠিন রোগের যাতনাও তাঁহাকে এই কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। শিক্ষকতা যাহাদের বৃত্তি, চিত্ত তাহাদের কমই থাকে। কুমারী বৈরাগীর শেষ ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমগ্র জীবনের সঞ্চিত অর্থের অবশিষ্টটুকু দরিদ্র, সুযোগলাভে বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে।

এই অর্থ হইতে সম্প্রতি সুকুমার ঘোষ নামে একজন ছাত্রকে তাহার পুস্তকক্রয়ের জন্য ১৭।০ এবং হিমেশ চন্দ্র সাহুনী নামে অনৈক ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীকে কি বাবদ ৪৲ দেওয়া হইয়াছে।

ত্রুটি স্বীকার

আষাঢ়ের অগ্রহায়ণ সংখ্যার কতকগুলি ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। শিক্ষা বিষয়ক কাগজে ছাপার ভুল থাকা একান্তই অরুচিকর। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলির জন্য পাঠকগণের কাছে দোষ স্বীকার করিতেছি। ত্রুটি মার্জনীয়।

শিক্ষায় নিবেদন

আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, মনি অর্ডার করিয়া টাকা পাঠানো প্রায়ই হইয়া উঠে না। পত্রিকাটি ভি. পি করিলে তাঁহাদের সুবিধা হয়। কেহ কেহ বলেন, সময়মত চাঁদার কথাটি মনে করাইয়া দিলে ভাল হয়। সেজন্য মনে করিতেছি নবম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা আমরা ভি. পি করিব। যাঁহারা ভি. পি চাহেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ডাকযোগে টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শিক্ষা আট বৎসর যাবৎ আপনাদের যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিল, আশাকরি নবম বর্ষেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

ঝাড়গ্রামে কৃষি কলেজ

গত মাসে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু ঝাড়গ্রাম কৃষিকলেজের শিলান্যাস উদ্বোধন করেন। এই কলেজটি কয়েক বৎসর হইল বেশ ভাল কাজ করিতেছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক ডাঃ পবিত্রকুমার সেন ইহার অধ্যক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিতে আই. এ. আই.এস.সি. এবং কৃষিতে আই. এ পর্যন্ত পড়াইবার অনুমোদন করিয়াছেন।

ডাঃ কাটজুর উদ্বোধন বক্তৃতার একটি বিশেষ কথার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, এই কলেজে যেন ঝাড়গ্রামের আশে-

পাশের ছেলেরা কৃষিবিদ্যা শিখিবার জন্যই যেন দলে আসিয়া যোগ দেয়। কৃষিকর্মের প্রকৃত উন্নতি কি ভাবে করা যায় সেই বিষয়ে যেন ছাত্রে কলেজে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সাধারণ ভাবে আই. এ, আই. এস. সি পড়ার সঙ্গে যদি এই দিকে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিতে পারে তবেই এরূপ কলেজের সার্থকতা।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

১৯৫০ সালের ১৮ই মে সংখ্যার গেজেটে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যপালের সম্মতি লাভ করিয়া "পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বিল" পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা আইনে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই আইনের উদ্দেশ্য এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার বিধি, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

আইনের উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নামে একটি বোর্ড সৃষ্টি করা হইয়াছে।

বোর্ডে সর্বসমেত ৪৪ জন সদস্য থাকিবেন, তন্মধ্যে পদাধিকার বলে ৯ জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন, সরকারের শিক্ষা বিভাগের ৩ জন, প্রধান শিক্ষক, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ৪ জন, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ৩ জন, ম্যানেজিং কমিটি ৩ জন, আইন সভা ৩ জন। যেসব স্কুল বোর্ড, বিশ্বভারতী এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া অবশিষ্ট স্থানগুলি পূর্ণ করা হইবে।

কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য বোর্ডে একটি কার্য নির্বাহক সমিতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে আরও নয়টি সমিতি থাকিবে।

বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যবিধি সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের ৩৩-(১) ধারায় বলা হইয়াছে—It shall be the duty of the Board to take such measures from time to time as it deems necessary for making suitable provision for secondary education throughout the state. অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বত্র মাধ্যমিক শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য যে যে উপায় এবং কার্যধারা অবলম্বন করা উচিত, তাহা গ্রহণ করাই বোর্ডের কর্তব্য।

কাজ আরম্ভ করিবার দুই বৎসরের মধ্যে অথবা সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে যাহা প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে বোর্ড সরকারের নিকট একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Plan) পেশ করিবে এবং সরকারের অনুমোদন লাভের পর উহাকে কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালন, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যাহা কিছু করণীয় তাহা বোর্ডই করিবেন এবং সেজন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তাহা বোর্ডেরই কাজ।

এই সম্পর্কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা (number), প্রকৃতি (character) ও সরঞ্জাম (equipment), শিক্ষার মান ও উহার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা, ছাত্রদের প্রয়োজন, ক্ষমতা ও প্রবণতা—ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বোর্ডের কার্যক্রম অনুসৃত হইবে।

এক কথায়, মাধ্যমিক শিক্ষার সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব এই আইনের বলে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাতে ন্যস্ত হইল।

—

শিক্ষাব্রতী যতীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র

[শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল]

আমাদের বিদ্যালয়ের আর দুই জন শিক্ষাব্রতীর কথা পর পর বলিতেছি। যতীন্দ্রনাথ দত্ত এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন জানি না, তবে তিনি শিক্ষাব্রতীই আছেন, কি অন্য কোন কাজে লিপ্ত হইয়াছেন তাহাও অবগত নহি। তবে সেই যে এক বৎসর অঙ্ক ও বাংলা তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলাম তাহা আজিও ভুলিতে পারি নাই। অঙ্ক তিনি জলের মত আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। পরিচয়ের অপেক্ষা ইতিহাসের প্রতি আমার স্বাভাবিক ঝোঁক, পরবর্তীকালে ইতিহাসের সেবাকে জীবন ও জীবিকার অঙ্গ করিয়া লইয়াছি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের শিক্ষাগুণে আমার গণিত-প্রীতি বাড়িয়া যায়, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতকেই বিশেষ বিষয় বলিয়া গ্রহণ করি। তবে তাঁহার বাংলা পড়ানো আমাদিগকে এতই মুগ্ধ করিয়া ছিল যে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।

সপ্তম শ্রেণীতে (Class VII) উঠিয়া আমরা যতীন্দ্রনাথের নিকট বাংলা পড়ি। এবারকার পাঠ্য পুস্তকখানির নাম ছিল 'সাহিত্য-রত্ন'। ইহার নাম সার্থক হইয়াছিল, বাস্তবিক এখানি বাংলা-সাহিত্যের রত্ন। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, নিখিলনাথ, শিবনাথ, হরপ্রসাদের রচনায় পুস্তকখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব বৎসর 'বঙ্গের রত্নমালা' পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে বিভিন্ন রত্ন-মনীষীর চিত্র এবং তাঁহাদের ছোট ছোট ঘটনা ছিল। এবারকার পুস্তকখানিতে তাঁহারা যেন নিজ নিজ রচনার মধ্যে রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করিয়া আমাদের নিকট ধরা দিয়াছেন। যেমন পুস্তকখানি, তেমনই পড়ানো। যতীন্দ্রনাথ এক-একটি নিবন্ধ পড়াইবার সময় যেন তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন, আমরাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতাম। তাঁহার সেই সুস্পষ্ট স্বর, সুমধুর উচ্চারণ, ততোধিক সুন্দর ব্যাখ্যা—সকলে মিলিয়া প্রকোষ্ঠখানি যেন একটি স্বর্গপুরীতে পরিণত হইত। প্রায় প্রতিদিন এক ঘণ্টা তাঁহার নিকট আমরা পাঠ লইতাম। কখন ঘণ্টা শেষ হইয়া যাইত, খেয়ালই থাকিত না। কোন এক অতীন্দ্রিয় জগতে চলিয়া যাইতাম।

জীবনে বহু শিক্ষক ও অধ্যাপকের নিকট পড়িয়াছি। এমন মনোযোগ সহকারে কাহারও অধ্যাপনা শুনিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। যতীন্দ্র নাথ বলিয়া পড়ানোর মধ্যে যে দরদ ঢালিয়া দিতেন তাহাতে আমরাও অভিষিক্ত হইতাম। মাতৃভাষা বাংলা তখনও বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপেক্ষিতা। আমরা কিন্তু যতীন্দ্রনাথের পড়ানোর মধ্য দিয়া ইহার মহিমাসৌষ্ঠব সেই কিশোর বয়সেই ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম। বাংলা সাহিত্য ও ভাষার প্রতি বাঙালীর প্রীতি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এই স্বাভাবিক বস্তুটি বিদেশীর মোহিনী শক্তিতে অস্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছিল। বড় আফসোস, তিনি এই মোহিনী শক্তির মূলোচ্ছেদনের আয়োজন করিয়াছিলেন, আর বড় যতীন্দ্রনাথ, তিনি কিশোর মনে ইহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের নিকট বাংলা অধ্যয়নের ফলে আমরা বাংলার প্রকৃতিকে নূতন রূপে দেখিতে শিখিলাম। বিভূতিভূষণের কলম ধরিবার বহু পূর্বে বাংলার তরু-লতা, ফল-ফুল, নদ-নদী, বন-জঙ্গল, পশু-পক্ষী, নর-নারী এক নূতন রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। দক্ষিণবঙ্গের

সমুদ্রসৈকতের অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালী বনরাজিনীলা আভাতি বেলা' ইত্যাদি কবির কথাগুলি নবকুমারের মনে উদয় হইয়াছিল। একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে নিজ পল্লীতে ফিরিতেছি। শীতের অপরাহ্ণ, বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, ধান উঠিয়া গিয়াছে। খোলা মাঠের মধ্যে দিয়া নিজ গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছি। দূর হইতে পল্লীর অর্ধচন্দ্রাকৃতি তরুরাজি যেন নবকুমারের অংশচন্দ্র হইয়া আমার চোখে ধরা দিল। আরও অগ্রসর হইলাম। যখন কীপনারায়ণ স্রোতস্বিনীর নিকটবর্তী হইলাম তখন 'এক পারে উদয়গিরি, অন্য পারে ললিতগিরি, মধ্যে পুণ্যতোয়া প্রবাহিণী'র কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই যে আমার পল্লীজননীকে নূতন রূপে দেখিলাম, সে দৃশ্য এখনও চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। কালবৈশাখীর ঘন কৃষ্ণ মেঘ, উদ্দাম হাওয়া, অশনি গর্জন, বিদ্যুৎ ঝলক, নিদাঘের রুদ্র তাপ, বর্ষার অবিরাম বারিপাত, শরতের শুভ্র নীলাকাশ, হরিদ্‌বর্ণ ধানের ক্ষেত, শীতের শিশির বিন্দু, নিত্য নূতন চোখে নব নব রূপে দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া কখনও কখনও আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। কোন্ এক নূতন জগতে চলিয়া আসিয়াছি!

একটি দিনের কথা। টিফিনের সময় স্কুল-বাড়ী হইতে দক্ষিণ দিকে এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়াছি। টিফিন শেষ হয় হয়, এমন সময় তাহারই সঙ্গে বিদ্যালয়ের দিকে আসিতেছি। হেমন্ত কি শীত ঠিক মনে নাই, বোধ হয় শীতকাল। স্কুল বাড়ীর ছাদ পাকা নয়, টিনের ছাউনি। দেখিলাম ঢেউ খেলানো টিনের উপর শীতের শান্ত রৌদ্র পড়িয়া পাতার উপর সিন্দুর বিন্দুর মত টল্ টল্ করিতেছে। মনে হইল আমাদের অলক্ষিতে কোন্ এক অদৃশ্য হস্ত এই ক্ষুদ্র পল্লীর স্কুল গৃহের ছাউনির উপর অজস্র মুক্তা বিছাইয়া গিয়াছে। সেদিনকার সেই অপরূপ রূপ দর্শনে আমি বিমোহিত হইলাম। প্রাণে নূতন স্পন্দন অনুভব করিলাম। গত পঁয়ত্রিশ বৎসরে দেশের উপর দিয়া কত ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, বাংলার দুরন্তম পল্লীও তাহার হাত এড়াইতে পারে নাই। ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের জীবনের উপর দিয়া কত কি পরিবর্তনই না ঘটিয়া গেল। কিন্তু সেই অপূর্ব দৃশ্যটি এখনও অপরূপ রূপে আমার নয়নের সম্মুখেই যেন রহিয়াছে। বাংলার জল মাটিকে আমরা এইরূপেই ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। আর ইহার মূলে রহিয়াছে যতীন্দ্রনাথের বাংলা পড়ানো।

ইতিপূর্বে রামায়ণ, মহাভারত পয়ারে পাঠ করিয়াছিলাম। রামায়ণ গান, মনসার ভাসান, রয়ানী (আমাদের ও অঞ্চলে 'রয়ানী' নামে আখ্যাত), টপ্ ও পয়ারলী গান, যাত্রা ও কবি গানও অনেক শুনিয়াছি। ইহার ফলে বাংলার সংস্কৃতির প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রীতি জন্মিয়া গিয়াছিল। পিতৃদেবের আদেশে চিঠিপত্রাদি ও দিনলিপি লিখিয়া স্কুলের 'টাস্ক' ছাড়া আপন মনে লিখিবার অভ্যাসও হইতেছিল। কিন্তু প্রকৃতি দেবীকে এমন করিয়া তো কখনও দেখি নাই। এই দৃষ্টি পাইলাম যতীন্দ্রনাথের পড়ানোর মধ্য দিয়া। বড় নদীর পারে মাতুলালয়ে গিয়াছি। একদিন নদীর পারে বসিয়া সেখান হইতে নবরূপে সূর্যাস্ত দেখিলাম, তাহা কি জীবনে ভুলিতে পারিব? 'ত্বয়া-হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' বলিতে বলিতে গৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া 'মহাদ্যুতি কাঞ্চনশৈলকে' রক্তিমাভ নবারুণ রূপে দেখিয়াছি, সে রকম আর কোথায় দেখিতে পাইব? যতীন্দ্রনাথ বাংলা পড়াইতে পড়াইতে আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেমন চক্ষু খুলিয়া দিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ স্কুল হইতে চলিয়া গেলেন। তখন আমরা বোধ হয় অষ্টম শ্রেণীতে উঠিয়াছি। যতদূর মনে পড়ে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার

P30586

স্বামীজিবিক্ত হইয়া আসিলেন। যতীন্দ্রনাথের শান্ত দৃষ্টি, প্রফুল্লচন্দ্র হইলেন তাঁহার বিপরীত। দীর্ঘকায়, বেশ শক্তিমান পুরুষ এই প্রফুল্লচন্দ্র। উকীল-পত্নী স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখিয়াছি; প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সেইরূপ উকীল পরিয়া স্কুলে আসিতেন। বস্তুত তিনি স্বামীজীর মত শুধু পাগ্‌ড়িই পরিতেন না, তিনি তাঁহার পুস্তকাদি পড়িয়া যৌবনারম্ভেই খানিকটা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্তায় ইহা প্রায়ই প্রকাশ পাইত।

প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের স্কুলে বেশী দিন ছিলেন না। হয়ত এক বৎসর কি তাহার কিছু বেশী কাল ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই তাঁহার তেজস্বিতার বেশ পরিচয় পাইয়াছিলাম। বিদ্যালয় ত্যাগের কারণও ছিল, যতদূর স্মরণ হয়, তাঁহার এই তেজস্বিতা। বিদ্যালয়ে ক্লাসের ভিতরে তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যেও বিশেষত্ব ছিল: তবে আমাদের নিকট আকর্ষণীয় ছিল অন্য কিছু। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনযাপন প্রণালী এবং ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া চলা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই। স্কুল ছুটির পর তিনি প্রায় প্রত্যহই ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলিতেন। অন্যান্য খেলা-ধূলাতেও তাঁহার বেশ উৎসাহ ছিল। ছেলের দল অল্প কালের মধ্যেই তাঁহাকে আপন করিয়া লইল। তিনিও তাঁহাদের হৃদয়ে একটি প্রীতির আসন লাভ করিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমাদের ও অঞ্চলে ভাল রাস্তাঘাট ছিল না। বোধ করি এখনও নাই। বর্ষাকালে ও অঞ্চল জলে প্রায় ডুবিয়া যাইত। জল-কাদা ভাঙিয়া আঁকা-বাঁকা সরুপথে স্কুলের বিদ্যালয়ে যাতায়াত বড়ই কষ্টকর ছিল। ঐ স্কুলে একক্রমে আট বৎসর পড়ি। প্রথম দুই বৎসর ও শেষ দুই বৎসর এই দুর্গম পথে স্কুলে যাতায়াত করিতাম। মাঝের চারি বৎসর পিতৃদেব সমস্ত বর্ষাকালটি স্কুলের নিকটে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। একবার প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে ছিলাম। তিন মাস তাঁহার সহিত বসবাস করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু শিখিয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যালয়ের ছুটির পর এবং রবের দিন তাঁহার বাসস্থান ছেলেদের সমাগমে মুখরিত হইয়া উঠিত। প্রফুল্লচন্দ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বড়ই ভক্ত ছিলেন। তিনি আমাদিগকে স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বীরবাণী', 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইতেন এবং যথার্থ বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার বিবেকানন্দপ্রীতি ছেলেদের মধ্যেও ধীরে ধীরে অনুক্রামিত হইয়াছিল।

ক্লাসে পাঠ্য বই পড়াইতে পড়াইতেই প্রফুল্লচন্দ্র নানা কৌতুককর অথচ শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের অবতারণা করিতেন। একদিন 'ভূত' ও 'ভূত' সম্বন্ধে আলোচনা হইল। প্রফুল্লচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অনেকেই ভূতের ভয় দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ভূত বলিয়া কোন জীব ইহজগতে কেহ দেখিয়াছেন কি? যে জিনিস কেহ দেখেন নাই, যা যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান, তাহা লইয়া এত ভয় কেন? তোমরা বিশ্বাস করিও, তোমাদের ভূত নাই, কাজেই ভয়ও নাই। যাও: রবে সর্বত্র বিচরণ করিবে।" প্রফুল্লচন্দ্রের কথা শুনিয়া ভূতের ভয় কোথায় চলিয়া গেল। নিশীথে বা রজনীর শেষ যামে শ্মশান 'ভীতিপ্রদ' স্থানেও বিচরণ করিয়াছি, কিন্তু কখনও 'ভূত' দেখি নাই, 'ভূতের ভয়ও' পাই নাই। প্রফুল্লচন্দ্রের কথা আমাদের মনে এতই সাহসের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ বা প্রফুল্লচন্দ্র এখন কোথায় আছেন জানি না, কিন্তু তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া আজও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

আমাদের কি শিখতে হবে

[শ্রীরেণু মিত্র]

আমরা বোধ হয় মনে করি শিশুকে শেখাতে হবে ভাষা, শেখাতে হবে অঙ্ক, শেখাতে হবে দেশ-বিদেশের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি। এগুলি একদিন আমরাও শিখে এসেছি, ওদেরকেও শেখাতে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকের দিনের শিশু, বালক বা কিশোরকে আরও কতকগুলি কথা শেখাতে হবে, যা বোধ হয় আমাদের অভিভাবকরা আমাদের শেখাবার কথা মনে করেন নি। মনে করেন নি এইজন্য বলছি যে, আমরা যারা আজ অভিভাবক হয়েছি, সেই আমাদেরই মধ্যে ঐ কথাগুলি না জানার ত্রুটি রয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের আজ আর কেউ শিখতে বললে সেটা আমরা ভাল মনে করব না হয়তো, হয়তো শিখে উঠতেও পারব না। তাই নানা কারণেই মনে হয় সে সব আজ থেকেই আজকের শিশু, বালক বা কিশোরকে যদি শেখাতে আরম্ভ করি, তবে হয়তো একদিন সমাজের চেহারাটা একটু বদলাবে।

সে কথাগুলি একদিক থেকে ছোটই।

কলকাতা সহরের পথ দিয়ে চলবার সময়—কলকাতা বলি কেন, বোধ হয় সর্বত্রই, কেন না সেটা জাতির চরিত্রদোষ, সেটা যে এখানে আছে, ওখানে নেই এমন হতে পারে না—এ দৃশ্য কে না দেখেছেন যে, কর্পোরেশনের জলের কলটাকে দড়ি বা তার দিয়ে বেঁধে নেওয়ার ফলে কলতলায় যখন লোক নেই, তখনও জল সমানেই পড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যতক্ষণ জল পড়বার সময়, ততক্ষণই ওটা দিয়ে জল পড়ছে। এই যে ঘটনাটা, আমাদের কাছে এটা এতই সাধারণ হয়ে গেছে যে, এটার অনপত্তি আমাদের চোখে কিছু ধরা পড়ে না। কিংবা এটার মধ্যে যে অনুচিত কিছু আছে, বোধ হয় জাতি হিসেবেই সে কথা আমাদের জানা নেই। সমস্ত সহর জুড়ে এই ভাবে জল অপচয় করবার কি কল, তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? এত জল নষ্ট করবার অধিকার কি নাগরিক হিসাবে আমাদের আছে?

যে বাড়ীতে অন্তত গঙ্গাজলের কলটা খানিকটা বিগড়ানো নয়, এমন বাড়ীর সংখ্যাই কি কম নয়? সেই কল দিয়ে জল পড়েই যাচ্ছে—আমরা যুক্তি দেখাই, গঙ্গাজলই তো, কিন্তু গঙ্গাজল হলেও এইভাবে জল পড়তে না দেওয়ার যুক্তি কি আমাদের জানা আছে?

মিল বা ফ্যাক্টরী এলাকার কোয়ার্টারে যারা থাকেন তাঁদের কথা জানেন কি? সেখানে সারা দিনে জলের কল যেমন বন্ধ হয় না, তেমনি সারা রাতে ইলেকট্রিক আলো কখনও নেবে না—আর গরমের দিন হলে দিনে রাতে কখনোই পাখা বন্ধ থাকে না। এমনও দেখা গেছে যে, সেখানে উনুন কখনও নেবানো হয় না। সেটা যে কবে ধরানো হয়েছিল, তা আর এখন মনে নাই; বোধ হয় রান্না শেষে সেটা চাপা দিয়ে রাখা হয়, আবার প্রয়োজন-মত চাকনীটি খুলে নেওয়া হয়। সেই স্থানের লোকেরা জানে এখানকার জলের, আলোর বা কয়লার জন্য তো দাম দিতে হয় না;—এর আর অপচয় কি?

এইসব ঘটনাগুলি খুব ছোট। এমনি আরও অনেক ছোট ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কর্পোরেশন রাস্তা পরিষ্কার করে দিনে তিনবার। হয়তো কোথাও দুবার, কোথাও একবার। তথাপি

বহু রাস্তাতেই দেখবেন ময়লা রাস্তার উপর জমেই আছে—এক জায়গায় নয়, বহু জায়গায়। অর্থাৎ ময়লা ফেলবার যে পাত্রটি থাকে সে পাত্রটি আমার বাড়ী থেকে দুটো তিনটে বাড়ী এগিয়ে আছে। আমি দিনের মধ্যে যখন তখন ময়লা ফেলছি (এমন নয় যে জমাদার আসবার সময় আমাদের জানা আছে, ঠিক তার পাঁচ মিনিট আগেই আমরা তা ময়লার পাত্রে না ফেলে অন্যত্র ফেলছি), অথচ দু' পা হেঁটে গিয়ে যে ঐ পাত্রে ময়লাটা ফেলে আসব, তা আমরা করি না। এমন কি এখন আবর্জনা ফেলতেও এতটুকু কষ্ট করি না বেরাল দিয়ে আমার পাশের ঘরের লোকের যাবার পথ কিংবা হয়তো তার বসবার ঘর।

গ্রামের মত সহরে আমরা পাশাপাশি বাস করি না, সভ্যতার চিহ্ন হিসেবে একজনের মাথার উপর আর একজন, তার মাথার উপর আর একজন এই ভাবে বাস করি। ফলেই আমরা উঁচুতে উঠেছি। এখন এইভাবে বাস করতে হলে যে আমাদের চলাফেরারও কিছু পরিবর্তন দরকার, সেটা যেন চলবার প্রয়োজনবোধ আমাদের আজও হয়নি। দোতলা তিন তলার অধিবাসীরা বেডাবে ওপর থেকে ময়লা জল, পানের পিক ইত্যাদি নীচে ফেলে থাকেন, তা বড়ই বেদনাদায়ক। এমনও দেখেছি যে, মা তাঁর বছর তিনেকের ছেলেকে পাশে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে প্রস্রাব করাচ্ছেন পথের ওপর। পথ দিয়ে যারা যায়, তাদের দিকে কি আমাদের এতটুকু ভাবনা আছে ?

জীবনের এমনি ছোট ছোট এই রকম বহু ঘটনা এইটেই প্রমাণ করে যে আমাদের জীবনে কোন সামাজিক বোধ বা সামগ্রিকতার বালাই নেই। যখন রাস্তার কলটাকে বেঁধে রেখে নিজের জলটা নিয়ে চলে আসি, তখন একবারের জন্যও মনে পড়ে না যে ক্রমাগত জল পড়ে যাবার ফলে সামগ্রিকভাবে যে জলটার অপচয় হল, সেটা একটা সামাজিক অপরাধ ; সমাজের একজন হিসাবে এ অপরাধ করবার অধিকার আমার নেই। মিলের কোয়ার্টারে যখন সমানে বাতি জ্বলতে থাকে, পাখা চলতে থাকে, তখন প্রয়োজনের বাইরে সেখানেও যে একটা সামাজিক energy বা শক্তির অপচয় ঘটছে, ব্যক্তিগতভাবে আমার পরসা দিতে না লাগলেও অনর্থক অপচয়ই যে সামাজিক অপচয়, সেটা যে আমার করা উচিত নয় এ বোধ আমাদের নেই। আমরা বুঝলে একমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত অপচয়টাই বুঝি, কিন্তু সামাজিক অপচয় বলে যে অপচয়টা, সেটাও যে পরোক্ষভাবে আমারই অপচয়, সমাজের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধবোধ আমাদের নেই।

পরাধীন দেশে বাস করে এতদিন আমাদের এ বোধ না থাকলেও হয়তো চলে গেছে কিন্তু স্বাধীন দেশের আমাদের ছেলেমেয়েদের এ বোধটা জন্মানো একান্ত প্রয়োজন। আমাদের পৌরনীতি-জ্ঞান এত কম কেন ? আমরা একটা কথা শুনেছি যে, 'ধ্যান করবে মনে বনে কোণে।' আমরা কোণে বা বনে বসে মনে মনে ধ্যান করতে জানি। সেইজন্যে ব্যক্তিগতভাবে ঔৎকর্ষের দৃষ্টান্তের অভাব আমাদের দেশে নেই। কিন্তু সামাজিক বোধ বলে আমাদের কিছু নেই. নেই একতা, নেই সঙ্ঘ—কেন না সামাজিক শিক্ষা আমরা কিছু পাই নি। অনেক সময় একটা জিনিষ আমাদের মোহগ্রস্ত করে যে, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মান, গান্ধীজি জন্মান, কিন্তু সঙ্ঘের ক্ষেত্রে আমরা এত দুর্বল কেন ? দুর্বলতা যে আমাদের কত ব্যাপক, তা ঐ পূর্বে উদ্ধৃত ছোট ছোট ঘটনাগুলি থেকেই প্রমাণ হবে। তবে মুস্কিল আছে একটা এই যে, ঐ ঘটনাগুলি যে দুর্বলতার পরিচয়, এ বোধ পর্যন্ত আমাদের লোপ পেয়ে গেছে বা কোনকালে জন্মায়ই নি। কিন্তু সত্যিই ঐগুলি আমাদের সামাজিক ও সামগ্রিক বোধের অভাবপ্রসূত। পাশ্চাত্যের পৌরজীবনে এ দুর্বলতাগুলি পাওয়া যাবে না।

তাই আমাদের শিশু, বালক ও কিশোরকে আজ এই সামগ্রিক চেতনাই দিতে হবে কিংবা তাবাবেগে এ-ও বলতে পারা যায় যে, আমাদেরই শিখতে হবে। আমরা না শিখলে তাদের শেখাবে কে? আমরা যেমন করে চলব, যেমন করে ভাবব তারা তো তেমন তেমনই শিখবে? সমগ্র সমাজের একজন হিসেবেই আমরা প্রত্যেকে সার্থক, একার সার্থকতাকে সার্থকতা বলব না, এ কথাটা যেন আমরা শিখি। তাহলে কল দিয়ে সমানে জল পড়তে দেখলে কল আমরা বন্ধ করে দেব, রাস্তায় কল বড়ি বা তার দিয়ে বেঁধে রেখে নিজের জলটি নিয়ে চলে আসব না। আলো চাওয়ার জন্য পয়সা না লাগলেও অনর্থক জ্বালিয়ে বা চালিয়ে রেখে সামাজিক অপচয় ঘটতে দেব না, রাস্তায় কল জমাদারের আসার সময়ে ময়লা ফেলব, নয়তো ময়লার পাত্রে ফেলব, অন্যের বাড়ীর দোরগোড়ায় ফেলব না, দু পা এগিয়ে যাব, দোতলা তিনতলা থেকে অনবধানতা বশতঃ ময়লা জল, পানের পিক বা ময়লা নীচে ফেলব না।

ছোট হলেও এগুলির প্রতি মনোযোগ দিয়েই একটি জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হতে পারে।

শিক্ষা ও জীবন

[শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দে]

যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি আসলে তাহা একটি অখণ্ড পূর্ণ সত্য। উহার এক একটি দিকের সহিত আমাদের জীবনের যোগাযোগ এক একটি বিশেষ জ্ঞানের রাজ্য। বিশ্বের সৌন্দর্যের দিক আমাদের সাহিত্য, কলা ও শিল্প, উহার আকৃতি এবং প্রকৃতি আমাদের ভূগোল, প্রবহমান মানুষের জীবনধারা আমাদের ইতিহাস, উহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব আমাদের দর্শন, তথ্য আমাদের বিজ্ঞান। আমরা এমন কোন পৃথিবীকে জানিনা যাহার একটি স্তর পারিপার্শ্বিক, অপর স্তর প্রাকৃতিক, অপরটি ঐতিহাসিক। আসলে সব কিছুর সমন্বয়ে একটি পূর্ণ বিশ্বকে আমরা জানি—যেন একটি শতদল পদ্ম, উহার এক একটি পাপড়ি এক একটি জ্ঞানের রাজ্য।

পাপড়ি দল হইতে একটি পাপড়ি তুলিয়া লইলে যেমন তাহা নিমেষেই প্রাণহীন, শুষ্ক ও অসুন্দর হইয়া যায়, তেমনি অন্য সকল অংশের সহিত যোগাযোগহীন কোন একটি বিশেষ জগতের মধ্যে যখন আমরা নিজেদের লিপ্ত করিয়া রাখি তখন আসলে আমরা বিশ্বের বিরাট প্রবাহের সহিত যোগ হারাই।

আমাদের যাহা শিক্ষণীয় বিষয়, আসলে তাহা সমস্ত বিশ্ব সত্তার এক একটি দিক। আমাদের জীবনের সহিত প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। শিশু তাহার জন্মমুহূর্ত হইতেই এই বিচিত্র জগতের সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। যে সংসারে সে জন্মগ্রহণ করে সেই সংসারের লোকজনের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ হয় তাহা মূলত ব্যক্তিগত। কিন্তু এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জগৎ ক্রমশ বৃহত্তর হইয়া বিশ্বজগতের সহিত এক হইয়া যায়। যে শিশু একদিন তাহার পিতা মাতা ভাই বোন ব্যতীত আর কাহাকেও

চিনিত না, জীবনের শেষ পর্যায়ে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের সহিত একদিন তাহারই জীবন শ্রথিত। এই যে বৃহত্তর জগত, যেখানে একদিকে অসুরের প্রাকৃতিক সম্পদ, অপরদিকে ক্রমবর্ধমান মানবিক সম্পদ, একদিকে বহির্জগতের বিপুল সীমাহীন সমারোহ, অপরদিকে অন্তর্জগতের গভীরতম রহস্য, ইহাই সত্য জগৎ। ভারতজগৎকে অস্বীকার করিয়া যিনি কেবল বস্তুজগৎকেই দেখিলেন, বাড়ী, গাড়ী, কলকারখানা, ইঞ্জিন, পদমর্যাদা, অর্থ, সম্মান, প্রভৃতি-পত্তি ইহারাই যাঁহার কাছে সর্বস্ব তিনি বড়জোর বিশ্বের একাংশ মাত্র তিনি দেখিয়াছেন। কেবল এই খণ্ড ক্ষুদ্র বিশ্বের সহিত পরিচয় থাকার ফলে তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ। আবার যিনি বাস্তব সম্পর্ক রহিত ভাবলোকেই বাস করেন, সুখ দুঃখ সোপাধিত বিপুল মানবলোকের বহুশাখাবিস্তৃত বিচিত্র জীবনের সহিত যাঁহার কোন যোগাযোগ নাই, তিনিও আসলে পৃথিবীর প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা শিক্ষনীয় বিষয়ের নানান পর্যায়ে ভাগ করিয়া আমরা পরিবেশন করি, তাহার সহিত বিশ্বজীবনের কতটা যোগাযোগ আছে, শিশু কত সহজ ভাবে, ধীরে ধীরে প্রাণের আনন্দে, এই বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহাই শিক্ষার আজ মাপকাঠি। তোতা পাখীর মত ইতিহাসের সাল, ভূগোলের রাজধানী, জ্যামিতির উপপাদ্য, পদার্থের সূত্র, সাহিত্যের ভাবার্থ কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষার খাতায় সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া পাশ তালিকায় নাম দেখিতে পাইলেই আমরা ধন্য হইয়া যাই। ধন্য তবু ছাত্র নয়। ধন্য হন ছাত্রের অভিভাবক, আত্মীয় স্বজন, এমন কি শিক্ষক। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন বিদ্যালয় পাশের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইলেই শিক্ষক ভাগ্যহত হিসাবে ব্যর্থ হইয়া গেলেন—এইরূপ একটি বিপজ্জনক মনোভাব আমাদের সকলের মধ্যে অলক্ষিতে কাজ করিতেছে। একদিকে শিক্ষাকে জীবনের সহিত যোগ করিয়া শিক্ষাকে সার্থক করিবার চেষ্টা শিক্ষা-শিক্ষা বিদ্যালয়গুলির মারফৎ গড়িয়া তোলা হইতেছে, অন্যদিকে কেবল মাত্র পরীক্ষা পাশের ফুলাদতে শিক্ষকের সকল প্রচেষ্টা ও সাধনার পরিমাপ করা হইতেছে—এই অস্বাভাবিক পরিবেশে আমাদের দেশে সুগঠিত শিক্ষাব্যবস্থা কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে, তাহাই আজ বিশেষ ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যালয়কে বৃহত্তর চলমান জগতের সহিত আজও আমরা যোগ করিতে পারি নাই। পারি নাই বলিয়াই আমাদের দেশের গ্র্যাজুয়েটরাও বাস্তব জীবনে অন্ধ। জাতির দিক দিয়া ইহা যে আসলে কত বড় ক্ষতি তাহার হিসাব করা যায় না। কোন একটি সভায় হঠাৎ ইলেকট্রিক আলো নিভিয়া গেলে আমরা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা অসহায়ের মত ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে থাকি। সাহিত্যের গ্র্যাজুয়েট নয়, বিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েটেরও এই অবস্থা। মিস্ত্রী না আসিলে আলো আর জ্বলেনা। অথচ ইউরোপের, আমেরিকার যে কোন স্কুলের ছেলে ইহা জানে।

পাশ করা এবং পাশ করান আমাদের মাথায় ভূতের মত চাপিয়া বসিয়াছে। কবে যে এই ভূত আমাদের মাথা হইতে নামিবে তাহা কে জানে?

এই অবাস্তব শিক্ষা যে দেশকে ধ্বংসের গহ্বরে লইয়া যাইতেছে গান্ধীজী তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষার পিছনে যে জীবনদর্শন তাহা আসলে পরিপূর্ণ মানবের জীবন। ভাব ও বস্তু, জ্ঞান ও কর্ম, বৃত্তি ও ব্রত উভয়কে তিনি উচ্চতর সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যেখানে উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার মধ্যেই, আমাদের প্রতি-

মুহূর্তের কর্মপ্রবাহের মধ্যেই বিশ্ব পরিচয়ের প্রচুর মালমসলা রহিয়াছে।

সেই মালমসলা পুথির বিষয়বস্তু হইতে অনেক বেশী আনন্দময় ও জীবন্ত। সহজ আনন্দের এই চিরন্তন উৎস হইতে দূরে বিদ্যালয়ের এক অবাস্তব পরিবেশে আমরা সন্তই ইতিহাস বিজ্ঞান বিধাই না কেন, বড় হইয়া সে শিক্ষা শিশু কখনই জীবনে কাজে লাগাইতে পারিবে না।

শিক্ষাকে কাজে লাগানোর এই নূতন তত্ত্ব গান্ধীজীর শিক্ষা-পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গ। Learning-এর সাথে earning-কেহ কেহ হয়তো মোটেই পছন্দ করেন না—তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, আসলে earning এখানে সামাজিক যোগ্যতা (Social efficiency) টাহারা এবখাটি ভুলিয়া যান। এই কর্মমুখর বৃহৎ বিশ্বে শিশু তাহার পরিশ্রম, বুদ্ধি ও শক্তিকে কাজে লাগাইয়া নূতন কিছু দিতে পারে, ইহা শিশুর নিজের দিক দিয়াও কত বড় আনন্দের উৎস! আমার বেশ মনে পড়ে, ছোটবেলায় রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে আমাদের ক্লাসে শিচবোর্ড কাটিয়া কাগজের বাক্স তৈয়ারি করা শেখান হইয়াছিল। আমি সেদিন প্রথম একটি বাক্স তৈয়ারি করিলাম এবং সকলেই উহাকে 'সত্যিই একটা ভাল বাক্স হইয়াছে' বলিয়া যখন স্বীকার করিলেন, তখন আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম সে আনন্দ আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। আমি যে সেদিন সত্যই পৃথিবীতে একটা মূতন কিছু দিয়াছিলাম—এই বোধ আমাকে অন্য কাহারও কাছে কোন মূল্য দিক বা না দিক, আমার কাছে নিশ্চয়ই দিয়াছিল। ইহাই ত কাজের পরম মূল্য। বাহিরের সমাজ ও নিজের ব্যক্তিত্ব—এই উভয় দিক দিয়াই কাজ আমাদের পরিপূর্ণতার দিকে লইয়া যায়।

কাজের সহিত যুক্ত হইয়া আমাদের শিক্ষা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে না বলিয়া শিক্ষা আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হয় না। উহা যেন মাথার মুকুট, অথবা মূল্যবান পরিচ্ছদ—আমাদের রক্ত, মাংস ও মজ্জার মত আমাদের অস্তরের অঙ্গ নয়।

বি-এ, এম এ পাশ করিয়াও আমরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারি না, একটা পরিবারের ভার বহন করিতে পারি না, ইহা যে শিক্ষার কত বড় ব্যর্থতা সে সম্বন্ধে শুধু ভাবিবার নয়, আজ করিবার দিন আসিয়াছে। কোথাও যদি ভাগ্যক্রমে চাকুরি জুটিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিলাম লেখাপড়ার কাজ দিল। বুঝিলাম, আমার পড়াশোনা সার্থক হইয়াছে। আর যদি না জুটিল? বুঝিলাম, আমার বিদ্যার কোন দাম নাই—আমি পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের বোঝা হইয়া গেলাম। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, একটি দশ বারো বছরের ছেলে, যে হোটেলে কাজ করে, পরদের কাগজ বিক্রী করে, রাস্তার ধারে বসিয়া জুতা পরিষ্কার করে, সেও তো সমাজের বোঝা নয়। সে যে অন্ন গ্রহণ করিতেছে, তাহার বিনিময়ে সমাজকে তো সে কিছু দিতেছে—মাথের বাক্স তৈয়ারি সিনেমা হেকোঁরা শিগারেট বিড়ির খদ্দের তাহাকে যোগাড় করিতে হয় না। ঐ সব চলছাড়া ছোকরা যাহাদের আমরা কোন সামাজিক মূল্য তো দূরের কথা, সাধারণ মানবত্বের মূল্য পর্যন্ত দিই না:—তাহারাই সমাজকে ধরিয়া রাখিতেছে। আর আমাদের স্কুলে-পড়া, পাশ-করা ছেলেরা, মধ্যবিত্ত, ধনীগৃহের এই 'শালিত' সন্তান-সন্ততিরা যে কি করিয়া বিদ্যালয়-উত্তর দিনগুলি কাটায়, তাহার বিশেষ বর্ণনা এখানে নাই বা দিলাম।

পরিবার ও সমাজের বোঝা না হইবার যে শিক্ষা সেই শিক্ষা যতদিন আমরা না দিই ততদিন আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমাদের শিক্ষাতত্ত্ব, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী, আমাদের শিক্ষানীতি—সব কিছুরই শেষ পরিণতি যে মানুষ তৈরী, এ কথা আমরা কখনই যেন না ভুলি।

সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সঙ্গীত—সভ্যতার যা কিছু সুন্দর ও মহনীয়—সব কিছুরই মূলে যে অর্থনৈতিক জীবন, সে কথা সকলেই জানেন। শিক্ষা যদি এই অর্থনৈতিক জীবনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অন্যের মত অগ্রসর হয়, তবে তাহার পরিণতি কি ভয়াবহ হইতে পারে তাহা সত্যই কল্পনা করা যায় না। দারিদ্র, বেকার সমস্যা, বিবাহ সমস্যা, নীতি, ধর্ম, রাষ্ট্রের দায়িত্ব, শিক্ষা—একটি অপরটির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু করিতে গেলেই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা যেন কখনই না ভুলি—to give education এবং to educate এই দুটা কথার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের আসল উদ্দেশ্য কি to give education না to educate? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই আমাদের আন্তরিকতা, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের কাজের ইচ্ছা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমার অভিজ্ঞতা

[শ্রীদুর্জটী সায়েক]

কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকিলেও সে বিষয়ে তর্ক করিতে বা মত পোষণ করিতে আমাদের অনেকেরই কুণ্ঠা বোধ হয় না। মুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধেও যে অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন তাহার মূলে এই অভিজ্ঞতার অভাবই বর্তমান। সাধারণত আমাদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত যে বুনিয়াদি শিক্ষা, সাকাই ও কাতাই ছাড়া আর কিছু নহে। যাঁহারা শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার পক্ষপাতী তাঁহারা তাহার অনেক অংশই মহাত্মা গান্ধীর, 'শিক্ষা শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ'—এই সুচিন্তিত অভিমত ভুলিয়া গিয়া শিল্পকে শুধু উপায় নহে, লক্ষ্য বা পরিণতি বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত বুনিয়াদী শিক্ষা যে অবাস্তব কিছু নহে,—শিশুর আগ্রহ, উৎসুকা, স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার পরিচিত ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে তাহাকেই লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা এই বাণীপুর শিশুভবনের কার্যপ্রণালী না দেখিলে, শিশুদের সহজ, সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ জীবন যাত্রা লক্ষ্য না করিলে, অন্যের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা আমাদের দেশে নূতন হইলেও শিক্ষা-জগতে নূতন নহে। কিন্তু আমাদের দেশে অনেকের মত আমারও এ সম্বন্ধে ধারণা খুবই অস্পষ্ট ছিল। এখানে অর্থাৎ বাণীপুরে আসিয়া এই নূতন ভাবধারাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা আমি সাগ্রহে লক্ষ্য করিতে থাকি। কিছুদিন পূর্বে শিক্ষানবিশী ছাত্র হিসাবে আমি যখন উক্ত শিশু ভবনে দ্বিতীয় (ক) শ্রেণীতে একটি উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া শিক্ষাদান করিতে অগ্রসর হই, তখন শিশুদের কোনও আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে, সেই শিক্ষা যে শিশুপ্রতিভার সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়ক হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে।

শিশুদের শিক্ষাদানকালে আমি কোন একটি 'প্রজেক্ট'কে লইয়া কার্য করিব ভাবিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কাটোয়া বেসিক্ ট্রেনিং স্কুলের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষয়িত্রী শিশুভবনের শিশুদিগকে একখানি চিঠি লেখে,—চিঠির উত্তর কিভাবে দেওয়া চলে

সেই প্রসঙ্গে পোষ্টাফিসের কথা উঠে, ফলে পোষ্টাফিস প্রজেক্ট লওয়া স্থির হয়। ইহাতে শিশুদের চিঠিপত্র লেখা, পড়া ও আদান প্রদান সম্বন্ধে কৌতূহল বর্দ্ধিত হয়। শিশুদের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহাদের লইয়া সেইদিনই বাণীপুর ডাকঘরে আসি। তথায় তাহারা পোষ্টমাষ্টারকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া পোষ্টকার্ড ও খামের দর, মণিঅর্ডার, পার্শেল প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এবং নিজেদের শ্রেণীতে আমার সাহায্যে একটি ডাকঘর তৈয়ারি করে। ডাকঘরের যাবতীয় জিনিস যথা—কার্ড, খাম, টিকিট, ডাকবাক্স ইত্যাদি তৈয়ার করিতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাহা সমাধান করে। এই কাজের ভিতর দিয়া অতি অল্পসময়ে নিজের ভাব গুছাইয়া লিখিতে শিখে এবং পঠন ও লিখনের দিকে তাহাদের আগ্রহ দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। পেন্সিল ছবে কার্ড, খাম, টিকিট বেড়াকেনা, মনি অর্ডার পাঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহারা সমস্যামূলক মিশ্র যোগ, বিয়োগ ও গুণ শিখে। গল্পের ও ছবির মধ্য দিয়া তাহারা আধুনিক ও প্রাচীন কালের বিবিধ উপায়ে চিঠি প্রেরণের ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হয়। ডাকঘরের নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে যাইয়া তাহারা কার্ড খাম কিনিতে লাইন করিয়া দাঁড়াইতে, শুদ্ধ ব্যবহার করিতে ও সময় রক্ষা করিয়া চলিতে কতকটা শিক্ষালাভ করে।

পরিশেষে তাহারা তাহাদের অন্তরের ভাবের অভিব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র নাটিকায় (ডাকঘর) প্রকাশিত করে। এই নাটিকার অধিকাংশ পরিকল্পনা, ছড়াগুলি ব্যতীত অধিকাংশ গদ্য ও বাক্য শিশুরাই সংযোজিত করিয়াছে,—এভাবে শিশুদের জড়তা নাশ করিয়া আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অভিজ্ঞতার সীমা বিস্তৃত হইয়া দেখা দেয়। নূতন জ্ঞান আহরণের জন্য এই যে আগ্রহ, কর্ম্মের প্রতি এই যে অদম্য উৎসাহ, ইহাকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে সুপরিচালিত করিতে পারিলে, শিশুমনীষা যে স্বাভাবিক রূপে স্বতই বিকশিত হইয়া উঠিবে, সে সম্বন্ধে আমার অনুমাত্র সন্দেহও নাই। ইহাদের সাফল্য ও কৃতিত্ব দেখিয়া আমি সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি।

শিশুদের অভিনীত নাটকখানি সহৃদয় পাঠকবর্গের আস্বাদার্থে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'ডাকঘর'

১ম দৃশ্য

[গ্রাম—বাণীপুর, একটা নিশান উড়ছে, জন কতক ছেলেমেয়ে নানাকাজে ব্যস্ত]

নন্দ—ভাই, তোমরা এখানে নিশান উড়িয়ে কি করছো ?

চন্দ্র—আমরা এখানে একটা ডাকঘর তৈরি করছি।

নন্দ—ডাকঘর—ডাকঘর আবার কি ? কিসের ঘর ?

পরেশ—ও হরি, ডাকঘর তুমি দেখনি ? কত দেশ-বিদেশের খবর তোমাদের বাণীপুরে আসবে—

হাসি—আসবে যাবে চিঠি খাম,
ঠিকানাতে লিখবে নাম।
নানান্ ভাবে আসবে কত
এই দুনিয়ার খবর যত।

নন্দ—আমার নামেও চিঠি আসবে ?

পারুল—হ্যাঁ, দেখো তোমার নামেও আসবে,—
কত রংবেরংয়ের চিঠি, কত সুন্দর সুন্দর বই—

নন্দ—কে লিখবে ?

পারুল—কেন, তোমারই মত অন্যদেশের ছোট ছেলেমেয়েরা।

নন্দ—কে আমায় চিঠি এনে দেবে ?

চন্দ্র—কেন, ডাকহরকরা দেখোনি ? ঐ যে মাথায় পাগড়ি বেঁধে বড় বড় গুম্ফা এঁটে ঘুরে বেড়ায়।

নন্দ—তাহলে আমিও একখানা চিঠি লিখবো।
[স্বগত] কাকে লিখি ?—ও ঠিক ঠিক,

সাহায্যকে লিখবো। রোজ একটা করে চিঠি লিখবো। সাহায্য নিশ্চয়ই আমাকেও চিঠি দেবেন। কিন্তু ডাকহরকরা যদি আমায় না চেনে? আচ্ছা—আমি রোজ একবার এসে দেখে যাব।

২য় দৃশ্য

[বাণীপুরের ডাকঘরের কাজ সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলে যাচ্ছে, পোষ্টমাষ্টার খাম, পোষ্টকার্ড, টিকিট বিক্রি করছেন—ক্রেতারা সারি দিয়ে কিনছে—সিওন চিঠিতে সীল দিচ্ছে।]

নন্দ—সিওন ভাই, এই নাও আমার চিঠি, তুমি ভাই আমার সাহায্যকে দিয়ে দিও।

সিওন—ঐ যে লাল বাক্স দেখছো, ওর ফাঁক দিয়ে ফেলে দাও।

নন্দ—তাহলে তুমি কি করে নেবে?

সিওন—কেন, আমি বাক্স খুলবো।

নন্দ—কখন খুলবে?

সিওন—বিকেল চারটায়। (হঠাৎ চিঠির দিকে তাকিয়ে ও চিঠিটি হাতে নিয়ে) এযে দেখছি, তুমি টিকিট লাগাওনি।

নন্দ—টিকিট আবার কোথায় পাওয়া যায়?

সিওন—ঐ যে চশমাপরা মাষ্টারবাবু বসে কাজ করছেন, ওঁর কাছে চাইলে পাবে।

নন্দ—ও মাষ্টারবাবু, আমায় একটা টিকিট দিন।

পোষ্টমাষ্টার—ক' পয়সার টিকিট?

নন্দ—তাত আমি জানি না। এই যে (খামখানি দেখিয়ে) আমি খামে চিঠি দেব।

মাষ্টারবাবু—তাহলে তোমাকে দু আনার টিকিট লাগাতে হবে। খামের টিকিটের দাম দু' আনা। (পয়সা নিলেন ও টিকিট দিতে দিতে) এই নাও টিকিট।

(নন্দ খামে টিকিট লাগিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিচ্ছে)

৩য় দৃশ্য

[ডাক পেয়াদা ঘাড়ে লাঠি নিয়ে, লাঠির একদিকে (পিঠের ওপরে) চিঠির থলে ও অপর প্রান্তে মুদুর ঝোলান,—ডাকঘরের দিকে আসছে।]

ছেলে মেয়েরা কতক সামনে, কতক পিছনে ও কতক পাশে—

ডাক পেয়াদা, ডাক পেয়াদা,
কোথায় তুমি যাও?
মোদের কাছে একটু থামি
চিঠিটে তুমি নাও।

ডাক পেয়াদা—

রাস্তা ছাড়ো, রাস্তা ছাড়ো,
রাস্তা ছাড়ো ভাই,
চিঠোবার সময় মোটেই নাই।

(একটার পর একটা ছু বার করে বলবে)

ছেলে মেয়েরা—

শরতের রোদ্দুরে
যাবে ভাই কদ্দুর?
যায় পড়ে নর্ নর্
যাবে তুমি কার ঘর?

ডাক পেয়াদা—

টুং টাং টুং টাং
পথ চলি একলা।
বৈশাখের গ্রীষ্মে বা
বর্ষায় মেঘলা।
কাঠফাটা রোদ্দুরে
মাঠ তেতে গন্ গন্,
থাকে মোর পিঠে বোঝা
হেঁটে চলি হন্ হন্।
হুম্ হুম্ রাত্তিরে
গায়ে দিয়ে উড়্নি
তালপুকুরের ধারে
ঘোরে শাঁকচুন্নি।

গ্যাট্ গ্যাট্ হেঁটে চলি,
পেছে ঘোর শব্দ—
পেন্সীর ছেলে পুলে
হয়ে যায় জব্দ।

আমি ডাকহরকরা—
সময়ের মূল্য
মোর কাছে খুব ভাই,
নেই তার তুলা।

ছেলে মেয়েরা—

ডাক পেয়াদা, ডাক পেয়াদা
যাচ্ছো যেথায় যাও,
একটু হেথায় থেমে গিয়ে
চিঠি নিয়ে যাও।

যবনিকা

[খাম, কার্ড, ডাকবাক্স, চিঠির থলে, ডাক পেয়াদার লাঠি, পাগড়ি, চশমা প্রভৃতি সমস্ত জিনিষই শিশুরা নিজেরা তৈয়ারি করিয়াছে।]

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

কথা-শেখা। শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীগোবিন্দমোহন গুপ্ত। দি সিটি বুক কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। ৪২ পৃঃ।

সুচিত্রিত বর্ণপরিচয়। ছড়া ও ছবির সাহায্যে শিশুদের প্রথম পাঠ সহজ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চিত্রগুলি সুনিপুণ শিল্পীর হাতের, খুবই সুন্দর হইয়াছে। ছবির বই বলিয়া ইহাকে বাহবা দেওয়া যাইতে পারে। বর্ণপরিচয়ের অনুরোধে নূতন শব্দযোজনা যেখা গেল, যেমন 'আমি খাচ্ছি পিঠে বড় ঘৃণা করি'—আশা করি ইহাতে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কুশ ধারণা জন্মিবে না। অক্ষরের আকারগত বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি—অক্ষরের আকারের সম্বন্ধে ক্রমিক পরিবর্তন চালানো যাইতে পারে। বইখানির আদর ভাল।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা ২৷৷০ টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।৵ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা সম্পাদক, ১ ভোডার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ভোডার লেন, পোঃ বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ছেলেমেয়েদের প্রাইজের ও বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রুতপাঠ্য
—কয়েকখানি পুস্তক—

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

(প্রতি খণ্ড পাঁচ সিকা)

জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা প্রণীত

গল্পের ফোয়ারা ১৲

পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা ১৷৷০

কপালেকুণ্ডলা

আনন্দমঠ

দেবী চৌধুরাণী

মৃণালিনী

কৃষ্ণকান্তের উইল

এস্ ওয়াজেদ আলী প্রণীত

সভ্যতা ও সাহিত্যে ইস্‌লামের দান ১৷৷০

আকবরের রাষ্ট্রসাধনা ২৲

সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

মহামানবের জীবন কথা ১৷৷০

পনেরোই আগষ্ট ৩৲

কিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত

রুশিয়ার রূপান্তর ২৷৷০

মানুষ কিসে বড় হয় ১৷৷০

মহাপুরুষদের কথা ১৲

কিশোর রামায়ণ ১৷৷০

নবযুগের প্রবর্তক ১৷৷০

মানবতার পূজারী ১৷৷০

কিশোর মহাভারত ২৲

জ্ঞানের সন্ধান ১৷৷০

বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ১৷৷০

যামিনীকান্ত সোম রচিত

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ ১৷৷০

ছেলেদের বিদ্যাসাগর ১৷৷০

দি সিটি বুক কোম্পানী : ১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট : কলিকাতা

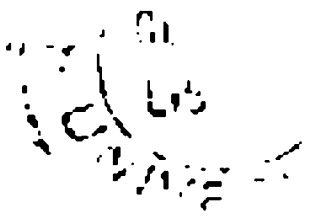

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

৯ম বর্ষ	মাঘ ১৩৫৭	৩য় সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষণবিভাগের তর্কবিচার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের একটি বিতর্ক সভায় গণতন্ত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভায় নেতৃত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ এবং প্রধান বক্তা হিসাবে আলোচনার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এই বিতর্কে যোগ দেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধিমেয়। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গে উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনেক বেশি সত্ত্বেও উপযুক্ত শিক্ষকের এই অভাবটি দুঃখের কথা। তিনি বলেন শিক্ষার ভালমন্দ অনেকখানিই নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও বৃত্তিগত শিক্ষার উপরে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে শিক্ষক শিক্ষণের নূতন প্রচেষ্টার কথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহাতে ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষা সম্বন্ধে উচ্চতর গবেষণা করিবার সুযোগ পাইবে।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শীঘ্রই যে নূতন প্রবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কাজ আরম্ভ হইবে তাহা যেন দেশে উদার সর্বমুখী ও বলিষ্ঠ শিক্ষা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া করে। গতানুগতিক নীতির অনুসরণ করিয়া সমাজে কেবল অকেজো মানুষের সৃষ্টি না করে। বর্তমানের মাধ্যমিক শিক্ষায় দেশের ছেলেমেয়েদের যে দারুণ অপব্যয় হয় তাহা বন্ধ করিয়া বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টায় ইহাদের ভিতরকার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইতে পারিলে তবে না এই বোর্ডের সার্থকতা। দেখে তিনি মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলার প্রসঙ্গে বলেন, কতগুলি জ্ঞানের কথা বলিয়া তাহাদের মস্তিষ্ককে বোঝাই করিয়া দিলেই শিক্ষকের কর্তব্য শেষ হয় না। স্বাধীন দেশের উপযুক্ত দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইবে। তাঁহার মতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেই প্রকৃতপক্ষে এই দায়িত্বজ্ঞান অর্জনের প্রশস্ত সময়।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার কথা নয়। কিন্তু গণতন্ত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার দিকেও আমাদের দৃষ্টি থাকা দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষার উপযোগিতা

সম্বন্ধে ঐ দিন নানা দিক দিয়া আলোচনা হয়। উচ্চ শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন এই দুই কারণেই মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা। এই চাহিদা মিটাইতে হইবে, কিন্তু বিশেষ সতর্কনে পথ চলিতে হইবে।

এখনও বহু দূরে

আমাদের মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। ফাল্গুন চৈত্র দুই মাস পিছাইয়া পড়িয়াছি। এই পিছাইয়া পড়ার জন্য পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমার প্রার্থী। অনেকে দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র দিয়াছেন, অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন। সকলের কাছেই আমরা ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। পিছনের ত্রুটি ভুলিয়া সমুখের দিকে তাকাইতে অনুরোধ করিতেছি। আশাকরি বৈশাখের মধ্যে আমরা এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিতে পারিব।

মূকবধির শিক্ষা

কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামের হলে মূকবধির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে গত ৭ই মার্চ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। উদ্বোধন করেন ডাঃ কাটজু। মূকবধির বালক বালিকারা চরকায় সুতো কাটে; তাহাদের হাতে তৈয়ারি নানাবিধ জিনিস দেখান হয়। উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত প্রীত হন।

মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে বলিয়াই মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ--যে মানুষের সেই প্রকাশের ভাষা নেই সে হতভাগ্য। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবলে সকল অক্ষমতাকে জয় করিতে চায়, ইন্দ্রিয়বিশেষের অভাবে যেন চিন্তাধারা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে না হয়। আর অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে একটি ইন্দ্রিয় দুর্বল হইলে প্রায়ই অপর ইন্দ্রিয়গুলি অধিকতর সক্রিয় হয়।

সেইজন্য মূকবধিরদের মুখে ভাষা দিবার প্রয়াস তো আছেই, তাহাড়া অন্য ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনা করিয়া তাহারা যেন সকল রকম শিক্ষা লাভ করিতে পারে সেদিকে এই প্রতিষ্ঠানটি আজ বহু বৎসর যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছেন। বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা দিয়া ইহাদের দ্বারা সমাজের অত্যাবশ্যক নানা জিনিস উৎপাদন করান হয়, যেন শ্রমের বিনিময়ে ইহারা নিজেদের জীবিকা উপার্জন করিতে পারে, সমাজের বোঝা না হয়। প্রদর্শনীতে নানাবিধ শিল্পকাজ দেখিয়া বেশ বোঝা গেল, সুযোগ পাইলে এই সব বঞ্চিত নরনারীরাও নিজের ও দশের কাজে লাগিতে পারে। অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকিবার দরকার নাই। বিক্রয়ের জন্য কো-অপারেটিভ দোকান করিয়া দিলে এই সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রাপ্ত বালক-বালিকারা নিজেরাই নিজেদের কাজ চালাইতে পারে।

শুধু বৃত্তি শিক্ষা দিয়া অন্ন সংস্থানের পথ করিয়া দিয়াই ইঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন নাই। এই প্রতিষ্ঠানে বালকবালিকাদের চিত্তের সৌন্দর্য বিকাশের জন্য এবং আনন্দবিধানের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা আছে। নৃত্য গীত অভিনয়, ছবি আঁকা, পুতুলসজ্জা প্রস্তুত করা, নানা রকম বিদ্যা শিক্ষা দিয়া সমাজের অন্য ছেলেমেয়েদেরই মত করিয়া ইহাদের মানুষ করার চেষ্টা করা হয়।

ডাঃ কাটজু তাঁহার অভিভাষণে শিক্ষকদের কাজের সুখ্যাতি করেন। বাস্তব শিশুকে শিক্ষা দিলে ভাবের আদান প্রদানে শিক্ষক যে আনন্দ পান এক্ষেত্রে তাহার একান্ত অভাব। কাজ অনেক সময়ই একঘেয়ে হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণ শিক্ষক অপেক্ষা ইঁহাদের কাজের মূল্য তাই বেশি। বিদ্যালয়ের সভাপতি বলেন যে, এই বিদ্যালয়টি সমগ্র বাংলা দেশের কয়টি শিশুরই বা সেবা করিতে পারে? দেশবাসী সচেতন হইলে সরকারি ও বেসরকারি আরও বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। সমাজের সকল অঙ্গকে সচল ও সক্রিয় করিয়া না তুলিলে স্বাধীন ভারত যে পঙ্গু হইয়া থাকিবে।

বাস্তুহারা শিক্ষার্থীর ভরণপোষণ

কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার উভয়েরই এখন উদ্বাস্তু সমস্যা একটি চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অদৃষ্টের তাড়নায় যাহারা নিজেদের বাস্তুভিটা ও বিষয় সম্পত্তি ছাড়িয়া এই রাষ্ট্রে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের পুনর্বসতির দায় রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়কেই লইতে

হইবে। এই ব্যাপারে উদ্বাস্তু বালকবালিকা, যুবকযুবতীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাও অন্যতম সমাধানের মতই গুরুত্বপূর্ণ। উভয় সরকারই এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। এইদিকে সচেতন হইলে সরকারি চেষ্টার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও আপনি হইয়া যাইবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে শিল্পক্ষেত্র প্রভৃতি বিবিধ জনকল্যাণমূলক কর্মপ্রচেষ্টা আবশ্যক। ফলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে আজ শিক্ষার এমন ধারা প্রবর্তিত করিতে হইবে যাহাতে জীবিকা অর্জনের নূতন নূতন পথ তাহারা খোলা পায়।

শিক্ষা কোন দিকে ?

[অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য]

কথাটা আগে রাজনীতিজ্ঞরাই বলতেন, সেদিন দেখলুম একজন শিক্ষাব্রতীও গোড়ে গোড় দিয়েছেন। ইংরেজ এদেশে এসে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলন করেছিল তাতে শুধু কেরানিই তৈরি হয়েছে, আর সেই উদ্দেশ্যই তাদের ছিল। কিন্তু উক্তিটা কি পুরোপুরি সত্যি ?

ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হল গেল শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তার আগে আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা এইরকম ছিল—প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো পাঠশালায়, আর ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষালাভ করত টোলে, মাদ্রাসায়। পাঠশালায় শিক্ষা চার পাঁচ বছর ধরে চলত। ছাপা বই-এর চল ছিল না, অক্ষর পরিচয়ের পর ছাত্ররা চিঠিপত্র-দলিল লিখতে শিখত, জমিদারী হিসেব রাখা অভ্যাস করত, আর এইখানেই অধিকাংশ ছেলের লেখাপড়া খতম হত। উচ্চ শিক্ষার জন্যে কতক ছেলে টোলে যেত, সেখানে সংস্কৃত পড়ান হত। কিন্তু তখনও মনুর বিধান বলবৎ—ন মূদ্রায় মন্ত্রিং দদ্যাৎ। অতএব টোলে প্রবেশের অধিকার ছিল শুধু ব্রাহ্মণ সন্তানের। এদের মধ্যে কতক পৌরোহিত্য করবার মতো জ্ঞান নিয়ে চলে আসত, আর কতক কাব্য ব্যাকরণ দর্শন পড়ত। মুসলমান ছেলেরা উচ্চ-শিক্ষা পেত মাদ্রাসায়। ফারসী তখন রাজভাষা, কোন কোন হিন্দুছেলে রাজ-সরকারে চাকরি পাবার আশায় ফারসী শিখত।

এখন এল ইউরোপীয় বণিক আর সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান মিশনারি। মিশনারিরা বাংলা ভাষা শিখল, মুদ্রাযন্ত্র বসাল, বাইবেল বাংলা ভাষায় তর্জমা করে তা ছাপাল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগল। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা-পদ্ধতি এক নূতন রূপ নিল। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল এসব বিষয়ের বই লেখা হল, তা ছাপান হল, ওই সব বিদ্যালয়ে তা পড়ান হতে লাগল, একাধিক ক্লাস হল, একাধিক শিক্ষক নিযুক্ত হল, শিক্ষা-পদ্ধতির কাঠামোটা একেবারে বদলে গেল। মিশনারিদের উদ্দেশ্য হল, এই সব শিক্ষায়তনকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কেন্দ্র করে গড়ে তোলা। দেশের লোক এই সব নতুন বিদ্যালয়ের ফলকে মুগ্ধ হল, এর দিকে আকৃষ্ট হতে থাকল।

কোম্পানির রাজত্ব এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কথা উঠল কোম্পানি এই রকম শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করবে কি না। বিলেত থেকে কিছুটা নির্দেশ

পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি নিষ্ক্রিয় রইল। লেখা-পড়া শিখিয়ে ইংরেজ আমেরিকা হারিয়েছে, আবার তাই করে কি ভারতবর্ষ খোয়াবে। এমন সময় দেখা দিলেন রামমোহন রায়। শিক্ষায়, সাহিত্যে, ধর্মে, রাজনীতিতে তিনি ভারতবর্ষকে এক নতুন যুগে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। উদার-হৃদয় ডেভিড হেয়ার তখন এদেশে এসেছেন। রাম-মোহন, হেয়ার ও কয়েকজন সুধীর চেষ্টায় হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। ইংরেজ অধ্যাপক এল, এদেশের ছেলেরা পাশ্চাত্য দেশের কয়েকজন মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করল। দেশে এক নতুন যুগের হাওয়া বইল।

১৮২৩ সালে আর একটা সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করবার প্রস্তাব হল। রামমোহন রায় এর প্রতিবাদ করে লর্ড আমহার্স্টকে লিখলেন—

As the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy, with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a College furnished with necessary books, instruments and other apparatus.

দেশীয় লোকের উন্নতিসাধনই যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তবে উচ্চতর ও উদারতর শিক্ষানীতির প্রবর্তন করিতে হইবে। যাহার মধ্যে থাকিবে গণিত দর্শন, রসায়ন, শারীর বিদ্যা ও অন্যরূপ হিতকর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান। যে টাকা বরাদ্দ হইয়াছে তাহাতেই ইউরোপে শিক্ষিত বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পুস্তকাদি ও উপযুক্ত সরঞ্জামসহ একটি কলেজ চালানো যাইতে পারে।

রামমোহন রায়ের চিঠি সম্বন্ধে পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনের সাধারণ সমিতি এই মন্তব্য করেন—

The application to government against the cultivation of Hindu litrature, and in favour of the substitution of Eurpean tuition, is made professedly on the part, and in the name of the natives of India. But it bears the signature of one individual alone, whose opinions are well known to be hostile to those entertained by almost all his countrymen. The letter of Ramwohan Roy does not therefore express the opinion of any portion of the natives of India, and its assertion to that effect, is a dereliction of truth, which cancels the claim of its author to respectful consideration.

হিন্দুর সাহিত্য প্রভৃতির পরিবর্তে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছে তাহা নামে মাত্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে—আসলে উহাতে স্বাক্ষর কেবল একজন মাত্র লোকের, যাঁহার মতামতকে সকলেই এদেশবাসীর বিরুদ্ধ বলিয়া জানেন। কাজেই রামমোহন রায়ের পত্রে দেশবাসীর মত প্রকাশ পায় নাই। দেশের লোকে এই শিক্ষা চায় বলিলে সত্যের অপলাপ হয়, এবং সেজন্যই লেখকের দাবী বিবেচনারও যোগ্য নয়।

কিন্তু রামমোহন রায়ের পিছনে যে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন তার মূর্তিমান প্রমাণ ছিল হিন্দু কলেজ আর রামমোহন প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিদ্যালয়। যা হোক, তখনকার অবস্থা দাঁড়াল এই: রামমোহন রায় প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষা আমদানির পক্ষপাতী। সাহেব কর্মচারীরা এর বিরোধী।

আর গভর্ণর জেনারেল ঠিক করতে পারছেন না কি করা উচিত। এমন সময় এলেন মেকলে, তাঁর উপর শিক্ষানীতি স্থির করবার ভার অর্পিত হল। মেকলে এদেশের শিক্ষাপদ্ধতিকে কষে একচোট গাল দিয়ে নিলেন। তারপর পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশে প্রবর্তনের জন্য তর্ক বেন্টিঙ্ক এক সুচিন্তিত রিপোর্ট দিলেন। তিনি বললেন—

These subjects having become instructed in the European knowledge may in some future age demand European institutions. Whether such a day will ever come I know not. But never will I attempt to avert or retard it. Whenever it comes, it will be the proudest day in English history.

ইহাদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ফলে কালে হয়তো ইহারা ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানও চাহিয়া বসিবে। এমন দিন সত্যই আসিবে কিনা জানি না। কিন্তু আমি কখনও সে দিন পিছাইয়া দিব না বন্ধ করিয়া রাখিব না। যখনই সেদিন আসিবে তাহা ইংরাজ ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবের দিন হইবে।

বেন্টিঙ্ক মেকলের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হল। এই শিক্ষায় কেরানি তৈরি হয়েছে এটা যেমন ঠিক তেমনি একথাও বলা যায় যে সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষ, জহরলাল এই শিক্ষারই সৃষ্টি। আর ইংরেজের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করেছে এরাই, যাদবের বিদ্যারত্ন বা হরিহর তর্কাচার্য নয়। তাছাড়া, রামমোহন রায় প্রমুখ দেশের সুধীবৃন্দ তো এই শিক্ষাই চেয়েছিলেন।

মোটের উপর এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে তিন দল ইংরেজের তিন রকম উদ্দেশ্য ছিল। একদল এই শিক্ষা চেয়েছিল কারণ এতে রাজকার্যে সহায়তা করবার জন্যে কম মাইনের কর্মচারী পাওয়া যাবে; লেখক শুধু এদের কথাই বলেছেন। দ্বিতীয় দলের মনোগত ভাব ছিল যে এতে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধা হবে। হ'ল, কিন্তু বাধা পেল রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম সমাজের কাছ থেকে। আর তৃতীয় একদল ইংরেজ ছিল যারা সত্যিই তাদের যেটা ভালো সেইটেই এদেশ-বাসীকে দেবার চেষ্টা করেছিল। এ কথাটা আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে।

আচ্ছা ধরুন যে শুধু কেরানি তৈরি করবার জন্যে ইংরেজ ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করেছিল। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হল, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা গড়ে তোলবার কথা উঠল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীগণ জাতীয় শিক্ষার এক পরিকল্পনা তৈরি করলেন। ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হল, অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে এসে এর অধ্যক্ষ হলেন। এই জাতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার রূপের কিছু কিছু অদল বদল হলেও মূল কাঠামো কি ঠিক রইল না? এর সঙ্গে যেদিন টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট খোলা হল, এর চাহিদা ছিল, এখানে দলে দলে ছেলে আসতে থাকল, আর সেইটেই আজ পল্লবিত হয়ে যাদবপুর কলেজে দাঁড়িয়েছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হলেন। সেনেটে বিরুদ্ধবাদী সাহেবদের বিপক্ষতা সত্ত্বেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের মনোমত করে গড়ে তুলতে থাকলেন। তারপর বসল স্যাডলার কমিশন, দেশের শিক্ষাপদ্ধতি প্রায় সমগ্রভাবে আলোচিত হল। কমিশনের রিপোর্ট বেরল, এতো ভালো রিপোর্ট সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু কেউ তো পুরানো কাঠামো ভেঙেচুরে দেবার প্রস্তাব করলেন না। স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট ভালো হলে কি হয়, তা ধামাচাপা রইল। তার একমাত্র কারণ হল, ওতে শিক্ষার নতুন রূপ দিতে টাকার কথাটা

একটু লম্বা ছিল। লম্বা মানে হ'ল, এদেশে এতো দিন শিক্ষার জন্যে যা খরচ করা হচ্ছিল তার তুলনায় বেশি, অন্য সভ্য দেশে শিক্ষা বাবদ যা খরচ করা হয় তার ধারেও যায় না। কিন্তু এ টাকা জুটল না। শিক্ষা তখন এদেশী মন্ত্রীর হাতে এসেছে, কিন্তু তাঁরা বললেন, টাকা তো দেবেন সরকারের অপরপক্ষ। সুতরাং কিছুই হল না।

১৯৩৭ সালে মহাত্মাজী শিক্ষার এক নতুন পদ্ধতি কল্পনা করলেন। এতোদিন শিক্ষাপদ্ধতি যে পথে চলে আসছিল এতে তার আমূল পরিবর্তন হল। এতে সবচেয়ে বড়ো কথা হইল এই যে, এ পদ্ধতিতে টাকার জন্যে সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। মহাত্মাজী বললেন—

Primary education extending over a period of 7 years or longer and covering all the subjects up to the matriculation standard, except English, *plus* a vocation used as the vehicle for drawing out the minds of boys and girls in all departments of knowledge should take the place of what passes today under the name of primary, middle and high school education.

আজকের দিনে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার নামে যে শিক্ষা চলিতেছে তাহার স্থলে প্রাথমিক শিক্ষাই সাত বা ততোধিক বৎসর ধরিয়া দেওয়া হইবে। তাহাতে ইংরেজি ভিন্ন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের উপযোগী সকল বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হইবে। উপরন্তু দেওয়া হইবে একটি বৃত্তি শিক্ষা আর এই বৃত্তি-শিক্ষার মধ্য দিয়া ছেলেমেয়েদের মনের সব বৃত্তিগুলির বিকাশের পথ করিয়া দেওয়া হইবে।

তারপর বলছেন—

Such education, taken as a whole, can and must be self supporting.;;in fact, self-support is the acid test of its reality.

এইরূপ শিক্ষা সমগ্রভাবে স্বাবলম্বী হইবে। প্রকৃতপক্ষে, স্বাবলম্বী হইতে পারিলেই হবে এই প্রণালীর সার্থকতা।

মহাত্মাজীর এই পরিকল্পনা আলোচনা করবার জন্যে ঐ সালের অক্টোবর মাসে একটি নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন হয়। তার অধিবেশনে ডক্টর জাকির হোসেন বলেন—

But there is a danger in over-emphasising the self-supporting aspect of education. Teachers may become slave-drivers and exploit the labour of poor boys. If this happens, the *takli* will prove even worse than books. We shall be laying the foundation of hidden slavery in our country.

কিন্তু স্বাবলম্বনের দিকটায় বেশী জোর দেওয়ায় একটা বিপদ আছে। শিক্ষকগণ ছাত্রের শ্রমকে শোষণ করিতে পারেন অর্থাৎ নিজের কাজে লাগাইতে পারেন। সেরূপ ক্ষেত্রে বই অপেক্ষা তকলি বেশী ক্ষতি করিবে। প্রচ্ছন্নভাবে দাস-প্রথার বীজ উপ্ত হইবে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ক্রমে দূরে সরিয়া যাইবে।

এই সভায় অধ্যাপক কে-টি সাহা বলেন—

If you make self-supporting education your ideal the ministers will naturally take full advantage of the situation and the result will be that instead of the present evil of cramming, the evil of over-work and undue extraction of labour from the students will silently but surely creep in and the real aim of education will recede into the background. You can imagine the consequences of this evil, if this scheme is launched throughout the country.

যা হোক, মহাত্মাজীর পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে এই বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, তার মধ্যে ওয়ার্ধার বিদ্যালয় প্রধান। চৌদ্দটি ছাত্র এখানকার শিক্ষা শেষ করে যখন বেরুল তারা জীবনের কি পাথেয় সঞ্চয় করল জানবার কৌতূহল হয়। যা জানলুম তা এই। জাকির হোসেন কমিটি যে পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করে সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ পঠনীয় বিষয়ের অর্ধেকও ওই ছাত্রেরা শেষ করতে পারে নি। না পারবার কারণ এই যে, নিজেদের আর তাদের শিক্ষকদের প্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করতে যে পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়েছে, তাতে তাদের আর বিশেষ কিছু শেখবার অবসর হয়নি। বেশি কথা কি, তারা খেলাধূলা করবারও সময় পায়নি। স্বাধীন ভারতকে গড়ে তুলতে এখন অনেক এঞ্জিনিয়ার অনেক চিকিৎসকের প্রয়োজন হবে। ওয়ার্ধায় শিক্ষিত একজন ছাত্রকে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকতে হলে তাকে নতুন করে কি কি শিখে যেতে হবে দেখা যাক। পদিতের মধ্যে সে পাটীগণিতের অঙ্ক কিছু জানে, আর ভগ্নাংশ থেকে জ্যামিতির দু একটা কথা শুনেছে, এই অবধি। রান্না দেখে পদার্থবিদ্যা আর কাপড়ের পাড় বুনা করা থেকে রসায়নবিদ্যা শিখেছে। কি যে শিখেছে সহজেই অনুমান করা যায়। এটা মনে রাখা দরকার, ওয়ার্ধা পদ্ধতিতে কোন ন্যাকরেটারি বা কোন পুস্তকাগারের কোন স্থান নেই। তারপর ইংরেজি ভাষা। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এঞ্জিনিয়ারিং-এর এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমাদের মাতৃভাষায় লেখা হবে না। ইংরেজি তাকে আনতেই হবে, আর এ-বি-সি চেনা থেকে আরম্ভ করতে হবে। তের চৌদ্দ বছর বয়সে ওয়ার্ধা থেকে বেরিয়ে যদি তাকে এই সব শিখতে হয়, তবে সে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকবে কত বয়সে? আর এ সব শেখবার স্থানই বা কোথায়? সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা খুবই ভাল কথা। কিন্তু বিপদ ঘটায় and এর বদলে through, সাধারণ শিক্ষা দিতে হবে কারিগরি শিক্ষার ভিতর দিয়ে। দেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রে সর্বত্র ওয়ার্ধা পরিকল্পনা গৃহীত হলে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারত গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ডের অবস্থায় চলে যাবে, আর পাশের যে কোনও দেশ জয় করে আসবে, সেই ভারতকে নিয়ে নেবে।

যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য গবর্মেণ্ট যে পরিকল্পনা করেন তা প্রধানত শিক্ষার বিস্তৃতি সম্বন্ধে। এই পরিকল্পনা অনুসারে পুরোপুরি কাজ হলে যুক্ত বাংলার জন্য শিক্ষাবাবদ খরচ দাঁড়াত তিন কোটির জায়গায় সাতাশ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনা যখন প্রকাশিত হয়, তখন দেশবাসী খুব উল্লসিত হয়েছিল, শুধু অর্থমন্ত্রী একটু মুচকে হেসেছিল।

আমাদের কংগ্রেসের মন্ত্রীরা মহা ফাঁপরে পড়লেন। তাঁরা উঠতে একবার, বসতে একবার মহাত্মাজীর নাম নেন, কি করে তাঁরা মহাত্মাজীর এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন, অথচ তাঁরা খুবই বোঝেন যে এই পরিকল্পনা চালু হলে দেশের সমূহ বিপদ। তাঁরা এইভাবে সমস্যার সমাধান করলেন। তাঁরা মহাত্মাজীর এই 'বুনিয়াদী' কথাটা রেখে কতকগুলি শিক্ষায়তন গড়তে থাকলেন, পশ্চিম বাংলায় বাঁশীপুরে এই রকমের একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হল। কেউ যদি যান দেখবেন, সেটা মাছও নয় মাংসও নয় সুস্বাদু হেরিংও নয়, সেটা ওয়ার্ধা, সার্জেণ্ট ও মামুলি পদ্ধতির এক অপূর্ব জগাখিচুড়ি। কিন্তু তা বলেই যে এটা মন্দ সে কথা আমি বলছি না। তবে এই রকমের প্রতিষ্ঠানগুলি মহাত্মাজীর পরিকল্পনা সম্মত নয়। এর বড়ো প্রমাণ হল এই, এদের পিছনে বছর বছর টাকা গুঁজতে হচ্ছে। Self-support is the

acid test of its reality, এই তো ছিল মহাত্মাজীর কথা।

যা হোক, শিক্ষাব্যবস্থায় যে কাঠামোটা বেঙ্গলের সময় থেকে চলে আসছিল মহাত্মাজী তার আমূল পরিবর্তন করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মহাত্মাজীর পরিকল্পনাকে কবরস্থ করে দেশকে সর্বনাশের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। এই একটা কাজের জন্যে মন্ত্রীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষার রূপকে মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা দরকার হয়। ভারত স্বাধীন হল, স্বাধীন ভারতে শিক্ষা কি রকম হবে তা ঠিক করবার জন্যে সরকারী রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে একটা কমিশন বসল। কমিশন রিপোর্ট দাখিল করল। এখন মনে হয়, স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টের মতোই এরও গতি হবে। মূল কথাটা হল টাকা নেই। আমাদের বক্তব্য এই, ভবিষ্যতে কোন কমিশন বসবার আগে সভ্যদের ডেকে সরকারের এই কথাটা বলে দেওয়া ভালো —বন্ধুগণ, পয়সা কড়ি যা দিচ্ছি তাই দেবো, এর মধ্যে যত পারেন শিক্ষার উন্নতি করুন। সভ্যদের রিপোর্ট বোধ হয় এক কথাতেই শেষ হবে। ছেলেদের বিয়ে সভায় মাটি কোপান যেতে পারে, তাদের দিয়ে চরকাও ঘোরান চলে, কিন্তু তাদের শিক্ষা দিতে গেলে টাকা খরচ করতে হবে।

২

শিক্ষার জন্যে টাকা মিলছে না কেন, সেইটে এখন অনুসন্ধান করা যাক।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থিতি তাকে নিরাপদ করেই রেখেছিল। পূবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে বিস্তৃত জলরাশি, আর উত্তরে অলঙ্ঘ্যভেদী উচ্চ হিমালয় আজও অনতিক্রম্য। শক হূণ গ্রীক পাঠান মুঘল যারা বারা এসেছে তারা উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়েই এসেছে। এদের আগে তখনই সম্ভব হয়েছিল যখন ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে কোন ঐক্যবোধ ছিল না, যখন অধিবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগেনি। তার নৌশক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়ল তখনই এই স্বর্ণভূমিতে সাম্রাজ্যলোভী ইউরোপীয় জলদস্যু ও বণিকদের আগমন। ইংরেজ এসে রাজত্ব স্থাপন করল, তাদের অধিকৃত এই দেশকে বহিঃশত্রু ও অন্তর্বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করতে সৈন্য বসাল। শেষ শতাব্দীর শেষের দিকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে দেশাত্মবোধ দেখা দিল, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। কংগ্রেস দেশের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের জন্যে একটু স্থানের প্রার্থনা জানাল, সৈন্য পোষণের জন্যে অত্যধিক খরচের প্রতিবাদ করল। কিন্তু ইংরেজ ওই মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কথায় কান দেবে কেন?

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গবিভাগের ফলে যে আন্দোলন দেখা দিল তা সর্বপ্রথম জনগণের চিত্তকে আলোড়িত করল। এই আন্দোলনের নায়ক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। সেদিন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নবযৌবনের জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত প্রভাতে দেশহিতের জাহাজে হাল ধরিয়া যেদিন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন সেদিন ইংরেজি শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকগণ একটিমাত্র বন্দরকেই আপনাদের গন্তব্য স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সেই বন্দরের নাম রাজপ্রসাদ। সেখানে আছে সবই, লোকে যাহা কিছু কামনা করিতে পারে, অন্ন-বস্ত্র, পদ-মান সমস্তই রাজ-ভাণ্ডারে বোঝাই করা হইয়াছে। আমরা কর্ণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চাহিতে আরম্ভ করিলাম, আমাদের দরিদ্রাগার মনোরথাঃ অনুপ অধ্যবসায়ের সহিত অবিশ্রাম নিবেদন করিয়া চলিলাম। এই ভাবে কত দিন, কত বৎসর কাটিত বলিতে পারি না। এমন সময় এই নিঃসহ নিষ্ফলতার মধ্যে বিধাতার কৃপায় পশ্চিম আকাশ

হইতে হঠাৎ বড়ো রকমের ঝড় উঠিল। আমাদের দেশহিতৈষী জাহাজটাকে পূবের মুখে হুহু করিয়া ছুটাইয়া চলিল। বিধাতার কৃপাকল্প হুগেন্দ্রনাথের সেই জাহাজকে যে ঘাটে আনিয়া ফেলিয়াছে তাহার নাম আত্মশক্তি।"

এর কয়েক বছর পরে কংগ্রেসের হাল ধরলেন মহাত্মাজী। মহাত্মাজী দাঁড়ালেন ভারতের "বহু কোটি দরিদ্রের দ্বারে, তাদেরই আপন বেশে, আর তাদের আপন ভাষায়।" ভারত জুড়ে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হল। ইংরেজ প্রমাদ গণল, তার পেষণ ও দমন নীতি চরমে উঠল। এমন সময় এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ যুদ্ধে শেষ অবধি ইংরেজ জয়ী হল বটে, কিন্তু হিটলার ইংরেজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেল। ভারতের পূব সীমানায় ইংরেজ সুভাষের এই আই-এন-এ সৈন্য হটিয়ে দিল, তাদের বন্দী করল। এদের বিচার হল। এই বিচারের সময় ইংরেজ একটা গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে একেবারে মুষড়ে গেল। জানল যে তার অধীনস্থ প্রায় সমগ্র ভারতীয় সৈন্য ওই আই-এন-এ দের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই মনোভাবাপন্ন সৈন্য নিয়ে আর বেশী দিন রাজত্ব চালানো যাবে না। এইবার একদিন ইংরেজ নৌ-বাহিনীর ভারতীয় কর্মচারীরা ধর্মঘট করল। পর দিন পার্লামেন্টে ঘোষিত হল যে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করতে প্রস্তুত। চলে যাওয়ার উপায় আলোচিত হতে লাগল।

যাবার সময় ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা এক ফাঁদ পাতলেন, আর আমাদের কংগ্রেসী নেতারা সেই ফাঁদে পা দিলেন, অতি গোপনে ভারত-বিভাগ প্রস্তাবে দস্তখত করলেন। মুসলিম লিগ তো এই বিভাগ চেয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা গলা কাটিয়ে বলে আসছিলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ও অখণ্ড ভারত এই হল কংগ্রেসের লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের কি ইচ্ছা জানা হল না, এই আন্দোলনের যিনি নেতা, যাকে ওঁরা জাতির জনক বলে থাকেন, তাঁকেও লুকিয়ে এই কাজ হল। ভারত খণ্ডিত হল।

সামরিক অভিজ্ঞতার দরকার নেই, ভারতের মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অখণ্ড ভারতের যে প্রাকৃতিক নিরাপত্তা ছিল তা আর রইল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার পাস পাকিস্থানের অধিকারে এল। আজ পাকিস্থান যদি মার্কা করে বা স্বেচ্ছায় এই গিরিপথ খুলে দেয় তবে আক্রমণকারী শত্রুকে ঠেকাতে যে বিপুল সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজন ভারতকে তা রাখতে হচ্ছে। তাছাড়া আমরা এক দীর্ঘ প্রতিবেশী সৃষ্টি করলুম। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের নিরাপত্তার জন্যে সামরিক ব্যয় ছিল সমগ্র খরচের শতকরা ৪২·৪ ভাগ। তখন ভারত ইংরেজের অধীনে, ভারতকে ইংরেজ সৈন্য পুষতে হয়েছে। আজ ভারত স্বাধীন, সৈন্যবিভাগের আন্তীয়করণ হয়েছে। শেষ বাজেট অধিবেশনের সময় অর্থ মাধাই জানালেন, মোট ৩৩৭ কোটি টাকা খরচের মধ্যে নিরাপত্তার জন্যে ব্যয় হবে ১৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ৫০·৪ ভাগ। এই খরচ কত কাল ধরে যে চালিয়ে যেতে হবে কে জানে! ভারত খণ্ডিত না হলে তার বুকের উপর এ জগদ্দল পাথর বসত না। কথা হতে পারে তখন রাজি না হলে ভারতের স্বাধীনতা তো আসত না। নিশ্চয়ই আসত, আর আসতে বেশি বিলম্বও হত না। বর্মার রাজাগোপালাচারি, জহরলাল, প্যাটেল ছিলেন না, তবু ভারতের আগেই বর্মা স্বাধীন হয়েছে। সিংহলও স্বাধীন হয়েছে। এ তো হল, কিন্তু ওই যে কথা 'আমরা ভারতকে স্বাধীন করলুম', ইতিহাসে এই কথাটা তো থাকা চাই। শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি তো একবার বলেছিলেন, পাঞ্জাব, বাংলা না হয় খণ্ডিতই হবে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা তো অপেক্ষা করতে পারে না। আজ হয়তো তিনি বুঝছেন যে হাত-পা কাটা গেলে ব্যথা

সমস্ত মেয়েতেই ২৯। কাশ্মীর যুদ্ধে আজ অবধি খরচ হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা, পাকিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্যে বরাদ্দ টাকার অঙ্ক ১০০ কোটিতে পৌঁছল। এই আড়াইশ কোটি টাকায় কত গ্রামকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করা যেত, কত অঞ্চল থেকে নিরক্ষরতা দূর করা চলত। চলতি বছরে অর্থ সচিব-এর কর্মে দেখা যায় মোট ৩৩৭ কোটি টাকা খরচের মধ্যে মাত্র ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে জাতিগঠনমূলক কাযাবলীতে। এ ছাড়া তাঁর আর করবার কি ছিল ?

অন্য দিকে বেসামরিক ব্যয়ও হুহু করে বেড়ে চলেছে। ইংরেজ সম্বন্ধে আমাদের বড় একটা অভিযোগ ছিল এই, সিভিল-সার্ভিসের সাহেবেরা এদেশের অনেক টাকা বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। সেটা একরকম বন্ধ হয়েছে, সেদিক থেকে যাবার অন্য কিছু আছে। কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতের সম্ভ্রম বজায় রাখতে ভারতীয় দূত ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্যে যে টাকাটা বিদেশে খরচ হচ্ছে তার অঙ্কটাও বিশেষ কম নয়। এখানকার শাসন কার্যে একটার পর একটা পদের সৃষ্টি হচ্ছে, অনেক সময় লোকের দিকে তাকিয়ে, প্রয়োজনীয়তার তাগিদে নয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পাস কাটাবার জন্য অভিনব কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে, তার জন্যে অঢেল মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, অথচ মূলধনের অভাবে তার অধিকাংশই যে কোনদিন চালু হবে না এ বেশ আমরা। কলকাতায় সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করার হাস্যকর কল্পনা এর একটা উদাহরণ।

কর্তারা বলছেন, খরচ হোক, নানা রকমে আয় বাড়ান যাবে, কোন চিন্তা নেই। দেশের শিল্পকে জাতীয়করণ করা হবে, জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবে। শিল্প জাতীয়করণ হলে সরকারি তহবিল কি রকম স্ফীত হবে তার নমুনা দেখলুম স্টেটবাস্ সার্ভিসে। আর ভারতীয় শাসনবিধিতে ব্যবস্থা হয়েছে যে, জমির বর্তমান মালিককে যথাযথ মূল্য দিয়ে জমি নিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ জমি জমিদারের হাত থেকে প্রজার হাতে আসবে, আর তার জন্যে যাবে তোমার আমার টাকা, যারা জমিদারও নয় প্রজাও নয়। কথা উঠবে, এতে সরকারের আয় বেড়ে যাবে, সেটা তো জাতির একটা সম্পদ। বাড়বে তো নাই, কমবে। কারণ জমিদারের দশ পনর টাকা খাইনের পোষ্যতা তশিলদারের বদলে বসবে হাজার দেড় হাজার টাকার মাইনের ডেপুটি, স্পেশাল অফিসার।

কিন্তু যে টাকা আছে তাও যদি সুবিবেচনার সঙ্গে খরচ হত তবে মনটা সান্ত্বনা পেত। ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনায় কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, আর সেই সব পরিকল্পনা তাসাদার পর্যবসিত হয়েছে। এ কথা বলেছেন কোন বাইরের সমালোচক নয়, খাস সরকারের ঘরের লোক, বৈদ্যনাথের অর্থ মন্ত্রী।

অনেক সুসভ্য দেশে রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে প্রত্যেক বয়স্ক লোক ভোটের অধিকারী হয়। আমরা কি পিছিয়ে থাকতে পারি ! কিন্তু দেখা গেল, এদেশে শতকরা ৮৫ জন নিরক্ষর, আর সে-সব দেশে নিরক্ষরতা নেই বললেই হয়। কোমর বেঁধে লাগ আমাদের দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে। কেন্দ্রীয় সরকার বৎসরে কিছু টাকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সে টাকাটাও কি রকম খরচ হচ্ছে, বলছি। পশ্চিম বাংলায় বয়স্কদের শিক্ষার জন্য একটা কমিটি বসল। কমিটি সিদ্ধান্ত করল যে প্রতি নিরক্ষরকে এক বছর শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষার জন্য একটা পাঠ্যতালিকা ঠিক হল। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী বিধান দিলেন, কমিটি যেটা এক বছরে শেখাবার কথা বলেছে সেটা তিন মাসে শেখাও। এর ফল হচ্ছে এই, একজন নিরক্ষর যে ভিড়িয়ে ছিল তিন মাস পরে সেই ভিড়িয়েই ফিরে গেল। তা থাক, সরকারি খাতায় কমিটি যা বলেছিল তার চারগুণ

লোকের তো নিরক্ষরতা দূর হল। আমাদের একটা প্রস্তাব আছে। নব্বই দিনের বদলে ওটা একদিনে শেষ করান হোক। তা হলে এক বছর পরে যে সাধারণ নির্বাচন হবে, অবশ্য যদি তা হয়, তাতে নিরক্ষর বলে আর কোন ভোটার থাকবে না। অদৃষ্টের কি পরিহাস!

দু একটা ছোটখাটো ঘটনার কথা বলি। দেশ স্বাধীন হল। শিক্ষামন্ত্রী ছটফট করছেন, কি করবেন কি করবেন, নতুন কিছু তো সব করতে হবে। আচ্ছা, কতকগুলি ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে দাও। তারা গেল, এক বছর পরে তারা ফিরল। এখন মন্ত্রী মশায় বিপদে পড়ে গেলেন, তাদের নিয়ে কি করবেন। যাকে যে চাকরিতে লেলেন বসিয়ে দিতে লাগলেন, তারা যা শিখে এল আর এখানে যা করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে তার কোন মিলই রইল না।

ছোট ছোট মৌলিক গবেষণার দরকার, আর এমন সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হবে যা দেশবাসীর কাজে আসবে। একটা গবেষণার বিষয় হল কর্পূর, গাছের পাতা থেকে কর্পূর নকল করতে হবে। এর রাসায়নিক পদ্ধতি আছে, রসায়নবিদ্যার ছাত্রদের তা জানাও আছে, প্রণালীটা খুব মহার্ঘ নয় কষ্টসাধ্যও নয়। গবেষণা শুরু হল, শিবপুর কোম্পানীর বাগানের দুএকটি গাছকে নিষ্পত্র করা হল, ছমাস ধরে কাজ করবার পর তৈরি হল এক কাঁচা কর্পূর। এখন কিন্তু দেখা গেল, ওরকম গাছ বাংলাদেশে আর নেই। সুতরাং বাংলাকে কর্পূর যোগান দেবার কাজ ওখানেই শেষ হল। এদিকে রাস্তায় চার পয়সা প্যাকেট জাপানি কর্পূর আজও অঢেল বিক্রি হচ্ছে।

অনভিজ্ঞতাজনিত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, থাকবারও কথা। কিন্তু কি ক্ষেত্রে কি প্রণালে নিয়োগকর্তাদের মধ্যে স্বজনপক্ষপাতিত্বের যে কথা উঠেছে তা কি শুধু বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের কুৎসা?

কালোবাজার, লাইসেন্স, পারমিটের প্রভাবে দেশের বাতাস কলুষিত। এই পূতিগন্ধ আবহাওয়ায় স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কি করে গড়ে উঠবে! আজ কোথায় সে মহামানব যিনি ভারতকে তার পূর্বচিত্তায় প্রতিষ্ঠিত করবেন? তবে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমরা স্মরণে রাখব— মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে আমরা চরম বলে বিশ্বাস করব না।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ]

ছাত্রদের তাণ্ডব আবার আরম্ভ হয়েছে, সুবিনীত আচরণে কয়েকদিন আগে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব তখনকার মত পণ্ড হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা হয়তাল করিতেছে। বিনয় ছাড়া বিদ্যালাভ হয় না। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের বিদ্যার্থীরা কি অ-বিদ্যার পথেই চলিতেছেন না? কাল যাহারা সমাজের বিভিন্ন ভার বহন করিবেন সেই বিদ্যার্থীরা যদি সুবিনীত ও অসংযত হন তবে সমাজের দশা কি হইবে! ইহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। 'সংযোগে' যাহা ধর্মাধিকারী এই বিষয়েই চর্চা করিয়াছেন।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্—

বিদ্যার মূল আধার বিনয়

অধিকারী ও সংস্কারবান পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন, বিনয় বিদ্যার সাধন, আর ফলও বটে। বিনয় হইতে বিদ্যা লাভ হয়। আবার বিদ্যা লোককে বিনয়ীও করে। তাই যেখানেই বিদ্যার বিধান, সেখানেই নম্রতা ও বিনয়ের অনুশাসন দেখিতে পাই। বিনয় ও নম্রতা ব্যতীত যে বিদ্যা লাভ করা যায় না সে কথা ধর্মগ্রন্থমাত্রেই উপাখ্যানে, দৃষ্টান্ত ও কাহিনী অবলম্বনে লোকের কাছে ধরার চেষ্টা হইয়াছে। অহংকারী দেবগণের গর্ব পরিহারের অতীব জ্ঞানগর্ভ একটি উপাখ্যান কেনোপনিষদে আছে। অহংকারী দেবতারা নিরহংকার ও নম্র হইয়া উমার শরণ লইলেন—তবে না তাঁহারা বিদ্যালাভে অধিকারী বিবেচিত হইলেন।

বিদ্যালাভের পক্ষে বিনয়ের মহত্ত্বের কথা অপর উপনিষদেও নানাভাবে ধরা হইয়াছে, বৃহদারণ্যক হইয়াছে। যথা—'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং'—সেই ব্রহ্মোপলব্ধির নিমিত্ত হাতে কাঠ লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শ্রোত্রিয় গুরুর কাছে তাঁহার যাইতে হইবে। এই অনুশাসন ও 'তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' তাঁহাকে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জান'—গীতার এই অনুশাসন বিনয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতেছেন। বিদ্যার আরম্ভ হয় বিনয়ে, আর তাহা পরিণতিও লাভ করে বিনয় দ্বারা।

বিদ্যালাভের অন্যতম উপায়—সংযম

প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্জনের কালকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বলা হইত। উপনয়নের সময়ে বালকের হাতে একটি দণ্ড দেওয়া হইত। দণ্ড উঁচাইয়া ঔদ্ধত্য করার জন্য নহে, পরন্তু সে নিজেই নিজকে সংযত রাখিতে পারে তজ্জন্য। সেই দণ্ড ছিল নির্ভয়তার প্রতীক, উচ্ছৃঙ্খলার নহে। দণ্ড হাতে লওয়ার সময়ে ব্রহ্মচারী প্রতিজ্ঞা করিত :

অণাঙং মনসিষা মার্গে সংযানম্ যম্
তন্তু তয়ে দিন্তো বয়াং তথাং রক্ষন্তো ভয়ম্।

—নিজ ঔদ্ধত্য সংযত করিয়া ব্রহ্মচারী নির্ভয়ের প্রতিজ্ঞা করিতেছে।

তাৎপর্য এই, বিদ্যালাভের প্রধান উপায় ছিল দুইটি, বিনয় ও সংযম। বিনয় হইতে পরিমার্জিত বিদ্যালাভ হয়, আর সংযম হইতে চরিত্রবল। তাহা হইতে মানুষ 'অমৃতোদ্ভব' হইয়া থাকে।

অসংযমের একদেষ

কিন্তু আজ দেখিতে পাইতেছি, সব কিছুর মূল্য ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে।

গৌরব ভিত্তিহীন হইতে চলিয়াছে। সকল ক্ষেত্রেই নিয়মশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এই অনিয়মানুবর্তিতার ভাব আমাদের বিদ্যাপীঠে বিদ্যালয়ে ও বিদ্যামন্দিরে পর্যন্ত ক্ষত ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহা মারাত্মক ও সংক্রামক। এই অবস্থা যদি অধিক দিন চলিতে থাকে, তবে বিদ্যার্জন ও বিদ্যাদানের ভবিষ্যৎ এ দেশে উজ্জ্বল নহে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতেই যে আদলে গলদ এ বিষয়ে দ্বিমত কোথাও নাই। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা ও প্রমাণপত্রের উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, বিদ্যা তথা জ্ঞানের উপর ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই পরীক্ষার সময়ে ধার করা অথবা চুরি করা বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণকে ছাত্রেরা চাতুর্যের বিষয় মনে করে। আর ছাত্রদের অধিকাংশ উৎরাইয়া গেলেই হইল, শিক্ষক নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। না আছে ছাত্রদের বিদ্যার্জনের আগ্রহ, আর না আছে শিক্ষকদের বিদ্যাদানে আগ্রহ।

শিক্ষক ছাত্রে সংঘর্ষ

ফল হইয়াছে এই, বিদ্যার ক্ষেত্রে পদস্খলনের প্রভাব আঁকিয়া বসিয়াছে। বেত হইয়াছে শিক্ষকের আয়ুধ ও শিক্ষানুশাসনের প্রতীক। বই-বেত-পড়ুয়া এই তিনের সম্বন্ধ অবাধী বলিয়া বিবেচিত। বইয়ের বিদ্যা বেতের দ্বারা ঠাসিয়া ঠাসিয়া বালকের মগজে ভোড়-অবরুদ্ধতি করিয়া দেওয়া হইতেছে। বলপ্রয়োগে যে জিনিষ ঢোকান হয় অধিকাংশ স্থলে তার প্রতি একটা বিদ্বেষ (অরুচি) জন্মিয়া যায়। আজিকার বিদ্যার্থীদের মধ্যে দুইটি লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—বিদ্যায় অরুচি আর শিক্ষকে অশ্রদ্ধা। ফলে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে নিয়ত এক প্রকারের শ্রেণীসংগ্রাম চলিতেছে। ছাত্র শিক্ষককে যত অধিক হতবীর্য ও হতপ্রভ (অপদস্থ ও লাঞ্ছিত) করিতে পারে নিজেকে সে ততই গৌরবভাগী মনে করে। বেত অনুশাসনের প্রতীক। অতএব ঔদ্ধত্য সহকারে বেতকে অগ্রাহ্য করাই হইতেছে ছাত্রের কাছে মর্যাদার ব্যাপার। বিদ্যালয়ে অনুশাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাকে শিক্ষক নিজ কর্তব্য জ্ঞান করে। আর তাই বুঝি তাহা ভঙ্গ করাকেই ছাত্র তার কর্তব্য মনে করে। ফলে কারখানা বা আপিসে যে দৃশ্য দেখা যায় বিদ্যালয়ে ও ছাত্রাবাসে সেই দৃশ্যই পরিলক্ষিত হইতেছে। হরতালের ধারার পরম।

অসন্তুষ্ট শিক্ষকের অসামর্থ্য

ছাত্র সেকালে 'সমিৎপাণি' হইয়া বিনীতভাবে গুরুর কাছে যাইত, তাঁহার সেবা সৎকার করিত আর গুরুর প্রসন্নতার সুযোগ লইয়া পাঠ গ্রহণ করিত। আজও কোন অভীষ্ট কলা যখন কেহ আয়ত্ত করিতে বা কোন বিদ্যা অপর কাহারও কাছ হইতে অর্জন করিতে চাহে, তো সে ওস্তাদ বা শিক্ষককে সন্তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট হয়। অসন্তুষ্ট শিক্ষক বিদ্যাদানে অক্ষম।

সদ্ অসদ্ বিবেক

কারখানায় হরতাল হয়। মজুর-কারিগরেরা বলে—এই যাকল তোমার কাজ, উৎপাদন আমরা করব না। মালিক ও সমাজ উভয়কেই তাহারা সংকটে ফেলে। বিদ্যাদানের ভূমিকা ইহা হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। অবোধ বালককে শিক্ষা দান করা সমাজের কর্তব্য। অতএব বালকের মনোরঞ্জন করিয়া, তাহাকে প্রসন্ন রাখিয়া, আবার কখনও কখনও বা, লোকে চারাগাছকে যেমন বেড়া দিয়া রক্ষা করে, তেমন আবেষ্টন দ্বারা রক্ষা করিয়া তাহাকে বিদ্যা দান করা সমাজের দায়। কিন্তু বয়প্রাপ্ত শিক্ষার্থী যদি বলে—'বিদ্যা আমি শিখিব না' তবে শিক্ষকের বিষাদ অবশ্যই হইবে। কিন্তু সে বলিতে পারে—'ঠিক কথা, সে তোমার ইচ্ছা, আপন ভালমন্দ বিচার করার শক্তি তোমার হইয়াছে। তুমি শিখিতে না চাও, না শিখিলে।

অন্ত আগ্রহশীল শিক্ষার্থী আসিবে। আর যদি কেহই শিখিতে না চাহে তো জোর করিয়া ত আর বিদ্যাদান করা যায় না।'

জ্ঞানের পসারী

কিন্তু এখন তো শিক্ষকেরাও হরতাল করিয়া থাকে। ছাত্রেরা তো করেই। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষত্বই এই—তথায় বিদ্যামন্দির পর্যন্ত দোকানে পরিণত হইয়া যায়। শিক্ষক জ্ঞান বিক্রয় করে; বিদ্যার্থী তাহার কাছ হইতে তাহা ক্রয় করে। হোটেলে লোকে যায়, আপন মর্জি মাফিক খায়। ছাত্রেরা তেমনই এই সব জ্ঞান-বিপণী হইতে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জ্ঞান খরিদ করিতে চাহে। ফলে সার্থকতা না হইয়া বিদ্যা হয় অনর্থকরী। ইহা হইতে কদাচিৎ পরিমার্জিত বুদ্ধি লাভ হয়।

ভূতের হাতে মশাল

ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স্ (Hobbs) যখন নবযুগে ক্যাসেলে (প্রাসাদে) ছিলেন, তখন পড়িতে পড়িতে তাঁহার মন পাঠে বিরূপ হইয়া ওঠে। তিনি বলিয়াছেন—ঐ আবর্জনা স্তূপ হইতে এখন আমি দূরে দূরে থাকি। এখন আমি একখানা বই-ই কেবল পড়ি, 'ইউক্লিড্'। কিন্তু তাহাও আমার আর ভাল লাগিতেছে না। তার কারণ 'ইউক্লিড' বেজুব লোকদেরও নিরর্থক তর্ক করিতে শিখাইয়াছে।' আমাদের রাষ্ট্রপিতা আমাদিগকে সত্যাগ্রহের মত অদ্ভুত অস্ত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কি জানিতেন যে বিষাদপরায়ণ লোকে ইউক্লিডের ন্যায় যে ভাবে পরিশোধ করিতেছে, আমরাও তেমনই তাঁহার ন্যায় পরিশোধ করিতে যাইতেছি। রাষ্ট্রপিতা সমর্থ হনুমানের হাতে মশাল দিতেছেন মনে করিয়া আমাদের হাতে মশাল দিয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবেন নাই যে আমরা কেবল হনুমানের জাতিই মাত্র বলিব।

সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ গণবিপ্লবের অনুপনীয় অবার্থ অস্ত্র। কিন্তু নিষ্ঠাপরায়ণ সহযোগ ও নিয়মানুবর্তিতা হইতেই মাত্র এই অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার (যোগ্যতা) জন্মিয়া থাকে। উপবাস আর অনাহার এক কথা নহে, এ দুয়ের অনেক ব্যবধান। উপবাসে মনের বল বৃদ্ধি পায়, আর অনাহারে হয় দুর্বল। বিশ্বামিত্র অনশন করিয়াছিলেন, আর তার ফলে তাঁহার তপোবল ও তেজ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু যেদিন তিনি ক্ষুধায় কাতর হইলেন সেদিন বাসি মাংস চুরি করিতেও তাঁহার বাধে নাই। সত্যাগ্রহের যোগ্যতা জন্মে সত্যাগ্রহের অনুকূল গুণসমূহের বিকাশ হইতে। ক্রোধও উদ্বেগজনিত প্রতিকার চেষ্টা সত্যাগ্রহ নহে। নিরস্ত্র প্রতিরোধ ও সত্যাগ্রহের মধ্যে ব্যবধান যে কি, তাহা সুস্পষ্ট করিতে গান্ধীজী বারবার এ কথার উপর জোর দিয়াছেন। সত্যাগ্রহে সত্যাগ্রহী ও তাহার প্রতিপক্ষ উভয়ের শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পকারের বাক্যের পক্ষে ভয়

লোকরাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখনকার কাজ হইতেছে লোকরাজের সুযোগ সুবিধা কি ভাবে আদায় করিতে হয়, প্রাপ্ত অধিকার কিরূপে সংরক্ষণ করিতে হয়, জনতার মধ্যে সেই শক্তির উন্মেষ করা যায়, তাহা দেখা। বিপ্লবী বলিয়া যাহারা আত্ম-পরিচয় দেয়, যাহাদের ধমনীতে নূতন রক্তের প্রবাহ, যাহাদের মগজে নূতন চিন্তা ও যাহাদের মনে নবীন প্রেরণা সেই নবযুবাদেরই তো এই কাজ। অনিয়ন্ত্রিত আবেগ যৌবনের গুণ নহে, তাহা উহার দোষ। আমাদের সুশিক্ষিত বিদ্যার্থী ও সুবুদ্ধি যুবক যদি যথেচ্ছাচারিতার ও বৈর-বৃত্তির আদর্শই জনতার কাছে ধরিতে থাকে, তবে প্রাচীন নীতিকারদের সুরে সুর মিলাইয়া আমাদের বলিতে হইবে যে ছুরি-কাঁচি-কাতে ছেলেদের খেলনা নহে।

লোকরাজ পাঁচজনের তথা জনতার রাজ।

লোকে বলে, ঈশ্বর জনতার মুখে কথা বলেন। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরের মুখ ব্রাহ্মণও নহে, আর অগ্নিও নহে। ভগবান শিবের মত উহা পঞ্চমুখ। তাই তো যে সংঘমুখে বিকুর পবিত্র ধ্বনি নিঃসৃত হইয়া দশদিক প্রতিধ্বনিত হয়, তাকে 'পাঞ্চজন্য' বলা হইয়াছে। কিন্তু 'পাঞ্চজন্য' হইতে যদি ভগবান বিকুর ধ্বনি নিঃসৃত না হয়, তবে তাহা 'বিকৃত ধ্বনি' মাত্র। গান্ধীজীর দেওয়া অবাধ অস্ত্র হইয়া যে ধেলোয়াড়ি মনোভাব আজি প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে পঞ্চায়েতরাজের 'চৌপটরাজে' পর্যবসিত হওয়ার ভয় আছে। আর তাই এই সাবধানতার কথার অবতারণা। *

*'সর্বোদয়'-এর সৌজন্যে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা

[শ্রীসুধীরকান্ত নন্দী]

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গোলমাল নিবারণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, বালকদিগকে কোন না কোন কার্যে ব্যাপৃত রাখা; তবে আর তাহারা গোলমাল করিতে পারিবে না। বালকদিগের প্রকৃতি চঞ্চল, সর্বদা কোন না কোন কার্যে ব্যস্ত থাকাই তাহাদের স্বভাব। শিক্ষক কোন কার্যে নিযুক্ত না রাখিলে, তাহারা নিশ্চয়ই গোলমাল করিবে।

শিক্ষক মহাশয় নিজে কখনও চীৎকার করিবেন না বা, খুব বড় করিয়া কথা বলিবেন না। বিনা প্রয়োজনে তিনি বেশী কথা বলিবেন না, অতি শান্তভাবে স্বাভাবিক স্বরে মিষ্ট করিয়া কথা বলিতে অভ্যাস করিবেন। ছাত্রগণের ঘন ঘন বাহিরে যাওয়া, শ্রেণীর মধ্যেও ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করা প্রভৃতি কার্যে গোলমাল হয়। এ সমস্ত অভ্যাস, শাসনের দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে। গোলমাল নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম চালানো যাইতে পারে :—

(১) শিক্ষক মহাশয় যখন পড়াইবেন, তখন বালকেরা মনোযোগপূর্বক তাঁহার কথা শুনিবে। নিজেরা কোন কথা বলিবে না।

(২) শিক্ষক সাধারণতঃ কোন বিশেষ বালককে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না। প্রশ্ন সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন; কে তাহার উত্তর দিবে, প্রথমে তাহার নির্দেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহারা সেই প্রশ্নের উত্তর জানে তাহারা হাত তুলিবে। যাহারা জানে না, তাহারা হাত তুলিবে না। যাহারা হাত তুলিবে সেই সকল ছাত্রের মধ্য হইতে শিক্ষক ইচ্ছামত যে কোন ছাত্রকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিবেন। ছাত্রটি প্রশ্নের উত্তর দিতে দাঁড়াইলেই অন্য সকল বালক হাত নামাইয়া লইবে।

আর এক কথা—প্রায় সমস্ত কার্যই নিয়ম মত করিয়া করাইতে পারিলে উত্তম হয়। গোলমালের সম্ভাবনা খুবই কম হয়। শ্লেট লও, দেখ, খাতা লও, একে একে বাড়ী যাও প্রভৃতি সমস্ত কার্যই ড্রিলের প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা

হইলে ছাত্রেরা ইচ্ছামত গোলমাল করিয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতে পারে না!

বাংলাদেশে যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা এই প্রথা প্রচলন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। অনেক শিক্ষক গোল থামাইতে গিয়া নিজেই অধিকতর গোল করিয়া বসেন। চৌকির আসনই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আসন। যেদিকে একটু গোল হইতেছে, শিক্ষক কেবলমাত্র একবার সেই দিকে চাহিবেন, আর সব গোল থামিয়া যাইবে। কিন্তু একটু স্নেহ কি সহানুভূতির ভাব না দেখাইয়া, যদি দিন রাত কেবল কঠোর শাসনের অধীন রাখিতে চেষ্টা করা যায়, তবে তাহাতে কোনও ফল হয় না, তাহা অভিজ্ঞ শিক্ষকমাত্রে জানেন। বালকদিগকে স্বাধীনতা দিতে হইবে—তবে সেই স্বাধীনতার সঙ্গে যাহাতে সংযম শিক্ষা হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মুখভঙ্গী করিয়া ঠাট্টা করা, কঠোর ভাষায় ভৎর্সনা করা, সামান্য ত্রুটিতে শাস্তি দেওয়া, অপরিমিত পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া প্রভৃতি কারণে বালকেরা সংযম শিখিতে পারে না। এ বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা ২৷৷০ টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।৵ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিক্ষা

ম ধি কল্যাণকৃৎ কস্তিদ্ প্রশস্তিং ভাত গচ্ছতি

১ম বর্ষ | ফাল্গুন ১৩৫৭ | ৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার

১৯০৪ হইতে আজ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন ব্যবস্থা অনুযায়ী চলিয়া আসিতেছে। ১৯১৬ পর্যন্ত ইহা শুধু স্কুল কলেজ অনুমোদন করিত, এবং পরীক্ষা গ্রহণ করিত। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয় সাক্ষাৎ ভাবে স্নাতকোত্তর বিভাগ চালাইবার জন্য কয়েকজন অধ্যাপক নিয়োগ করিলে ভারত সরকার হইতে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনা করিয়া দেখিবার জন্য ১৯১৭ খ্রীঃ স্যাডলার কমিশন নামে তদন্তসমিতি নিযুক্ত হয়। কিন্তু মোটামুটি এই কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠিত হইলেও, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক হইতে কিছুই করা হয় নাই—ত্রিশ বৎসর একই ভাবে (১৯১৯ হইতে ১৯৪৯ পর্যন্ত) চলিয়া আসিয়াছে। ফলে কলেজগুলির পরিচালনা অতি নিম্ন ধাপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং সিনেটের শতকরা ৮০ জন সদস্য আজ পর্যন্ত ভাইসচ্যান্সেলরের পরামর্শমত চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত হইয়াই আসিতেছেন।

এ ব্যাপারের পরিবর্তন করিবার জন্য শিক্ষামন্ত্রী চৌধুরী মহাশয় গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এক আইনের প্রস্তাব পরিষদের সম্মুখে পেশ করেন। ইহাতে কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে, যথা:—

(১) ভাইসচ্যান্সেলর বেতনভুক কর্মচারী হইবেন; তিনি অন্য কোথাও কর্ম করিতে পারিবেন না। তিনি চার বৎসর কার্য করিতে পারিবেন এবং সিণ্ডিকেট যে তিনটি নাম পাঠাইবেন তাহা হইতে চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এ বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকার চ্যান্সেলর মহাশয়কে পরামর্শ দিতে পারিবেন। ভাইসচ্যান্সেলরের বেতন হইবে আনুমানিক ৩০০০৲ টাকা।

(২) একজন কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন।

(৩) কর্পোরেশন হইতে একজন, বিধানসভা সদস্য হইতে একজন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ হইতে একজন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ, পশ্চিম বঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে এক একজন,

রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের মধ্য হইতে ২০ জন; একাডেমিক কাউন্সিল হইতে ২০ জন—তাহার মধ্যে অন্তত দশ জন অনুমোদিত কলেজের অধ্যাপক হইবেন না, কিন্তু অধ্যাপক হইবেন; পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ হইতে ২ জন ও ব্যবস্থাপক সভা (কাউন্সিল) হইতে ১ জন; বৃত্তিশিক্ষার বা professional কলেজ ভিন্ন অন্য সংযুক্ত কলেজের অধ্যাপকদের মধ্য হইতে ৮ জন; অনুমোদিত (affiliated) ও সংযুক্ত (constituent) কলেজের কার্যনির্বাহক সমিতি হইতে পাঁচ জন;—এই হইল সিনেটের নির্বাচিত সভ্যদের সংখ্যা। তা ছাড়া চ্যান্সেলর পনের জন সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন, তাহার মধ্যে তিনি দেখিবেন যে অন্তত দশ জন যেন বৃত্তি, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিনিধিরূপে সিনেটে যোগ দিতে পারেন।

এ পর্যন্ত যাঁহাদের কথা বলিলাম তাঁহাদের সভ্য থাকিবার কাল তিন বৎসর নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ ছাড়া আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের অবৈতনিক সভ্য ছিলেন তাঁহারা সকলে এবং চ্যান্সেলরের অনুমোদিত পাঁচজন পর্যন্ত আজীবন সভ্য থাকিবেন।

কিন্তু সিনেট অতিরিক্ত আর একটি পরিষদ্ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহার নাম একাডেমিক কাউন্সিল। শিক্ষাকার্য পরিচালনা ও পরীক্ষাদি গ্রহণের জন্য কর্তৃত্ব একাডেমিক কাউন্সিলের থাকিবে। এই কাউন্সিলই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন করিবে, এবং ইহার প্রায় পঞ্চাশ জন সভ্যের মধ্যে প্রায় চল্লিশ জনই শিক্ষক হইবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য ব্যতীত অন্য সমস্ত পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকিবে; অবশ্য পূর্বাহ্নে বিজ্ঞাপিত করিয়া পরিদর্শন হইবে, এবং উহার ফলাফল যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইতে হইবে।

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তরিকতার বিভাগ দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশা করা যায়, নূতন আইনে এ বিভাগের কোনও খর্বতা সাধিত হইবে না। কিন্তু শুধু আইন করিয়া কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়? খানিকটা যায় বটে। তবে যদি জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি না হয়, দেশের শিক্ষাব্যাপারে দেশবাসী যদি উৎসাহী না হন, তাহা হইলে শিক্ষাব্রত এখনকার মতই চলিবে।

ইতিমধ্যে পরিষদ্ হইতে নিযুক্ত হইয়া সিনেট্ কমিটি শিক্ষাসচীর প্রস্তাবটি খুঁটিয়া দেখিয়াছেন; শোনা যায়, তাঁহারা ডাইরেক্টর অব্ এডুকেশনের বেতন কমাইয়া তিন হাজার হইতে আড়াই হাজারে আনিয়াছেন, আরও কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। অবশ্য মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস ঘটাইতে চাহিলে উক্ত বেতন আরও কমানো উচিত ছিল। আমরা ত্যাগের কথা কতই না শুনি, কিন্তু যদি উপরের দিক্ হইতে ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করা না হয়, যদি ত্যাগ শুধু নিম্নতম কর্মচারীর জন্যই রাখা হয়, তবে তাহাতে কি ফল হয়! তাহাতো ক্ষুধার্তকে বাজ করার মতই শুনায়। সিনেট যখন পরিষদের নিকট পুনরায় উপস্থিত করা হইবে, আশা করি তখন ইহার ভাল মত আলোচনা হইবে এবং প্রস্তাবটি অচিরে কার্যে পরিণত হইবে। শিক্ষিত দেশবাসীর এ আলোচনায় উৎসাহ প্রদর্শন করা কর্তব্য।

কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগের কর্মতৎপরতা

১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের কার্য আরম্ভ করেন। কলিকাতা মিউনিসিপাল এক্ট (১৯২৩) কর্পোরেশনের পক্ষে বৎসরে একলক্ষ টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা আবশ্যিক

করিয়া দেয়। দেশবন্ধু ছিলেন প্রথম মেয়র, তিনি ৩২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩২টি মন্তেল স্কুল খুলিবার পরিকল্পনা করেন। ১৯৪৯-৫০ সালে ছেলেমেয়ে একত্রে ৫৮,১৮৬ জন কর্পোরেশন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেছে। বৎসর বৎসর শিক্ষক সংখ্যাও সামান্য কিছু বাড়িতেছে। ১৯৪৯-৫০ সালে শিক্ষাকল্পে কর্পোরেশন হইতে ১৯,৬৪০০০ টাকা খরচও হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তিকায় ব্রতচারীর কথা সাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত ৩রা এপ্রিল সান্ধে পাঁচটায় কর্পোরেশনের কাউন্সিল হলে এক আলোচনা সভা হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষ কে. ডি. ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রিয়রঞ্জন সেন, মিস লায়লা খাঁ ও অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষার আধুনিক প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম তিন জন বক্তার পর তাঁহার নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ও কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগকে সংবর্ধিত করিয়া কার্যান্তর জন্য সভাত্যাগ করিলে, অধ্যক্ষ বিভেন্দ্রমোহন সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং স্পষ্ট ভাবে কর্পোরেশনের শিক্ষার বর্তমান অবস্থার সমালোচনা করেন। বক্তৃতা ও আলোচনা সমস্তই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিক্ষক সম্মেলন

বিগত ৮ই এপ্রিল গোখরতাড়ায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিক্ষকদের এক সম্মেলন হয়। বিভিন্ন জেলা হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ ইহাতে যোগ দেন। এই সম্মেলনের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল, নবগঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

উদ্বোধন বক্তৃতায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা তিনটিকেই সমান ভাবে দেখা দরকার। তবে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব তিনি বেশি মনে করেন এইজন্য যে, মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই জনে গিয়া প্রাথমিক শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিবেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতিতে আমরা ছাত্রদের মধ্যে কতখানি শক্তি ও আনন্দের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি তাহা যাচাই করিতে হইবে। সেই অনুসন্ধানের পর ভাঙিয়া গড়িয়া নূতন পদ্ধতি রচনা করিতে হইবে।

তাঁহার মতে উচ্চতম শিক্ষার স্তর পর্যন্ত বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য—শুধু বে-সরকারি চেষ্টায় এই কাজ সম্ভব হইবে না। সরকারকেও এ কাজ করিতে হইবে। তিনি শিক্ষার্থীদের উপর 'অতিরিক্ত' শিক্ষণীয় বিষয়ের চাপ দেওয়ার পক্ষপাতী নহেন। শিক্ষার্থীদের বয়স ও স্বাস্থ্য বিবেচনা করিয়া পাঠ্যতালিকাকে সহজ ও চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। ইংরেজি শিখিবার জন্য অতিরিক্ত চাপ দেওয়া অনুচিত। পড়িতে ও বুঝিতে পারিলেই হইল, তবে যদি কেহ স্বেচ্ছায় ইংরেজি সাহিত্য পড়িতে চায় সে যত খুশি পড়িতে পারে। তিনি ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলেন যে এই অবনতি আমাদের দূর করিতেই হইবে।

শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শিক্ষকেরা যে বেতন পান, কোন সওদাগরী আপিসের দারোয়ানও সে বেতনে কাজ করিতে রাজি হইবে না। শুধু আদর্শের কথা না বলিয়া শিক্ষকদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকেরা যাহাতে আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত। নৈতিক শক্তি-বৃদ্ধির উপায় না করিয়া কেবল সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি করিলেই দেশ-শাসন চলে না।

সভাপতি ডাঃ শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য

সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের তথা সমাজ-দেহের সর্বত্র যে শিথিলানুবর্তিতার ও শৃঙ্খলার অভাব দেখা যাইতেছে, তাহার উল্লেখ করেন। কোনরূপ উত্তেজনাকে উপলক্ষ করিয়া ছাত্রদের নিয়ম-শৃঙ্খলা হইতে "ছিনাইয়া" লইবার যে মনোভাব, শিক্ষকেরা যেন তৎপর হইয়া তাহা দূর করেন।

উদ্বোধক ও দণ্ডাপত্তি মহাশয়দের ভাষণ হইতে সংস্কারের চেষ্টার আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কি দাঁড়াইল এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা কি হইতেছে তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। কার্যে পরিণত না করা পর্যন্ত সকল হিতকথাই ব্যর্থ।

শিক্ষার গতি

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

শিক্ষা সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার রাজনীতিকদের আছে কি না, এবিষয়ে শিক্ষাব্রতীদের মনে সন্দেহ জাগিতে পারে। যার যেখানে অধিকার। বিশেষ করিয়া শিক্ষা যেখানে রাজনীতির সঙ্গে মিশে দায়, রাজনীতি যেখানে শিক্ষার ধারা নিয়ন্ত্রিত করে বলে মনে হয়, সেখানেও শিক্ষার বিশুদ্ধি, শিক্ষার জন্যই শিক্ষা—এসব কথা আমরা অর্থাৎ শিক্ষকেরা অনেক সময় বলিতে চাই। কথাটা পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। 'ইংরেজি শিক্ষায় দেশবাসীকে কেরানি বানিয়েছে' একথা রাজনীতিকেরা বলুন, শিক্ষকেরা বলিতে পারেন কি? কিন্তু রাজনীতিকেরা তো অস্পৃশ্য নহেই, শিক্ষালয়কে ও অন্য সমাজে এতদিন ছিল তাঁদের অবারিত প্রবেশ; বরং শিক্ষা-সম্মেলনে বা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে তাঁদের এক-আধটু কৃপাদৃষ্টির জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করি। তাহলে রাজনীতিক ব'লে আমাদের বিরাগ নয়, আমাদের মনোভাব কথা নয় বলে বিরাগ। রাজনীতিককে দেশের সব কথাই বিচার করিতে হয়, সব কথাই ভাবিতে হয়, যে বাস্তব নিয়ে রাজনীতি তার শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সময় পরামর্শও দিতে হয়, শক্তি থাকলে দেশের শিক্ষাকে সেভাবে চালিতও করেন তাঁরা। একদিকে হিটলারের শাসনে বা স্ট্যালিনের শাসনে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা, অন্যদিকে জীবন-সায়াহ্নে রাজনীতিকদের মধ্যে দেখি মানুষ গড়ার আকাঙ্ক্ষা। আমেরিকার একজন রাজনীতিকেরই কথা পড়লাম—Political work is more or less ephemeral, though none the less highly useful. Educational work has in it the elements of permanent utility. The empire of the teacher is an ever-enduring empire. The teachers are the masters of the future. এ মন্তব্য করা হয়েছে বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে। সুরেন্দ্রনাথ একাধারে শিক্ষক ও রাজনীতিক ছিলেন, যদিও তাঁর রাজনীতিজ্ঞতা শিক্ষকতাকে আড়াল করে রেখেছিল। সকল যুগেই শিক্ষক ও রাজনীতিকে এভাবে তুলনা করা চলে।

ইংরেজি আমলে শিক্ষা, যা ছিল কেরানি গড়ার শিক্ষা, সে বিষয়ে রাজনীতিক কেন, যাঁরা এ যুগের শিক্ষার ইতিহাস লিখতে বসেছেন তাঁরা সকলেই তো স্বীকার করেছেন। না করবেনই বা কেন?

ইংরেজি আমলে দরকার চেয়েছিলেন একদল interpreter—কোম্পানি তো শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় নাই—এই interpreter-এর কাজ তাঁরা প্রথমে পরের মুখে ঝাল খেয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে সুবিধে হল না বলে নিজের লোকদের ওপর ভার দিতে চাইলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ শুরুদের বাংলা কায়দা দিয়ে তাঁরা আর এদেশের রীতিনীতি শিখতে চেষ্টা করল। চলল কিছুদিন, কিন্তু এ-ও টিকল না। রাজা যেমন ছড়িয়ে পড়ল, কোম্পানির লোকেরও তেমনি অভাব হতে থাকল। কোম্পানি কিন্তু এদেশে শিক্ষাবিস্তারে উদাসীন। ১৮১৩ খ্রী: কোম্পানি পার্লামেন্টের কাছে যখন সুবিধাপ্রার্থী হ'য়ে হাজির হল, তখন পার্লামেন্টের একজন সভ্য জোর করে একটা শর্ত বসিয়ে দেন, কোম্পানিকে বৎসরে অন্তত এক লাখ টাকা খরচ করতে হবে দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য। কি করে শিক্ষাবিস্তার হবে? টাকা আর খরচ হয় না। পরে পরিবর্তন হল, কিন্তু সময় লেগেছিল।

রাজা রামমোহন রায় অবশ্যই নূতনের আলো এনে দিয়েছেন, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা যা'তে এদেশে প্রবর্তিত হয় তার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টায় আমাদের দেশের অনেক সংশয় কেটে গেছে। কিন্তু রামমোহন এবং মেকলে এক পথের পথিক নন। মেকলে যে দৃষ্টিতে, যে অবজ্ঞার ভঙ্গীতে ভারতীয় পাণ্ডিত্যকে দেখেছিলেন, রাজা সেরকম দেখেন নাই। বিদ্যাসাগর মশায়ও বলেছিলেন, খেতে বসতে শুতে সব বিষয়েই ইংরেজ শ্রেষ্ঠ। আমাদের মনের মধ্যে সেভাব আছে, এবং শিক্ষার পরিকল্পনায় সেই ভাবটা আমরা এখনও অস্বীকার করতে পারছি না। ইংরেজি শিক্ষার সুফল কুফল দুই-ই নিশ্চয় আছে; আজকেও আমি দু জায়গায় দেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইউরোপীয় ইস্কুলে পড়াশুনোর অনেক বেশি যত্ন নেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার বিদ্যালয়ের সঙ্গে ইউরোপের Industrial Revolutionএর যুগের তুলনা কতদূর সঙ্গত, জানি না। তাহলেও একথা বলব যে যতদূর জানি প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে আমাদের দেশে কিছু ছিল না, এবং উচ্চশিক্ষা জাতিগত ছিল—জাতিবিশেষের অধিকার। জাতিভেদের সংকীর্ণতা অস্বীকার করব কেন? তবে সেকালের প্রাথমিক শিক্ষার কোন চিহ্নও যদি আজ না থাকে, কাকে দায়ী করব? আডাম সাহেবের রিপোর্টে ছিল বাংলা দেশে (মিহত বিভাগ শুদ্ধ) লক্ষ পাঠশালা—সে পাঠশালায় বা শেখানো হত এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় তাকে কি নাম দেব? কোথায় গেল আমাদের সেই লক্ষ লাখ পাঠশালা?

সেকালে মধ্যশিক্ষা বলে কিছু ছিল না; পাঠশালার পরেই টোল। নাই বা থাক, তাতে কি হয়েছে—এখন আমরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা বলে যা চালাচ্ছি, তার মধ্যে আমরাও ছেলেবেলায় মাধ্যমিক যা পড়েছি, তাতো এক জিনিসেরই রকমফের। মাইনরের আগে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যা পড়েছিলাম, তার পরের পাঁচ বৎসর ঐ এক জিনিসই ইংরেজি ভাষায় পড়েছি। সেকালে কি রকম অসুবিধা হত জানি না। কিন্তু যদি আট বৎসরের বুনিয়াদি শিক্ষা হয় তবে তো তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, দুটোই নিয়ে। আট বৎসরব্যাপী বুনিয়াদি শিক্ষায় মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ না হলেও তা'র খানিকটা পর্যন্ত এনে পৌঁছে দেয়।

প্রচলিত শিক্ষায় অসন্তোষ ছিল বলে দেশে বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা হয়েছে নতুন ধরণের শিক্ষা প্রবর্তন করবার। আজকের দিনে নয় শুধু, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দিনে যাঁরা নতুন ক'রে দেশ গড়তে চেয়েছিলেন, তাঁরাও ইংরেজি শিক্ষার অশেষ কীর্তিগানে মুখর ছিলেন না।

শুচরিতেষু, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ এঁরা রাজনীতিকের চেয়েও এগিয়ে গিয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে সমস্যাটা ঢেলে সাজতে চেয়েছিলেন। পারলেন না তাঁরা; জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ ইঞ্জিনীয়ার তৈরি ক'রে শুধু-একটা পথ দেখেন। জয় হোক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর। কিন্তু সেদিনও যখন সাহেব বলেছেন, শুধু ইঞ্জিনীয়ার তৈরি করেই যদি আমরা খুশি থাকি, তবে ইউরোপের কুলী হয়ে থাকার মতই হবে—বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের যদি চর্চা না করি। যাক, সেকথা এ প্রসঙ্গে অবান্তর; কিন্তু যে কথা বলছিলাম, জাতীয় সমর্থনের অভাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইতি হোল। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের কত আদরের ধন; তাঁর প্রতিষ্ঠাও মুখেও প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে অসন্তোষ, কেরানি তৈরি করার শিক্ষা নয়। রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে চলবার শক্তি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেরও থাকল না। সরকারি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ রাখতেই হল। এ ইতিহাস দেশের ও দশের কলঙ্ক। ইংরেজি শিক্ষার আদর্শের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, দৃঢ় প্রতিবাদ —এতদূরেই আমি আমাদের জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ ও শান্তিনিকেতনের আদর্শকে দেখছি।

এখন বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যাপারে আসা যাক। বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯৩৭ সালে যে চিন্তা ও যে অবস্থা ছিল আজ তা নাই। যখন যখন বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মেলন হয়েছে তখন তখনই তার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া গেছে। ১৯৩৭ সালে গান্ধিজী বলেছিলেন বুনিয়াদি শিক্ষা প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার স্থান গ্রহণ করবে। Should take the place of what passes to-day under the name of primary, middle and high school education. আদর্শ আরও স্পষ্ট করতে চেষ্টা হয়েছে পরে। সেই আদর্শ নির্ণয়ের মধ্যে বলা হয়েছে, অন্য সব কথার মধ্যে যে "(১) শিল্পের বিভিন্ন মূলপাতি ও কার্য-প্রণালীর অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তার প্রাথমিক জ্ঞান থাকবে।

(২) খাদ্য ও কাপাসে চাষ, বয়ন ও তৎসংশ্লিষ্ট কাজ, শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ, নিজের ও সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পল্লীসেবা, এই সকলের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে তার সঙ্গে তার পরিচয় থাকবে।"

এর ব্যবস্থা করতে গেলে let this be a test tube বলে ব্ল্যাকবোর্ডে চক খড়ি দিয়ে আঁকলে যে চলবে না, তা সকলে ভাল করেই জানেন। বুনিয়াদি বিদ্যালয় সম্বন্ধে ১৯৪২ সালে বোধ করি মনস্তাত্ত্বিক একজন পরীক্ষা করেছিলেন চম্পারন এলাকার ছাত্রদের; তা'তে বিদ্যা ও প্রবণতা পরীক্ষা ক'রে মোটামুটি সন্তোষজনক ফলই তিনি পেয়েছিলেন। বুনিয়াদি শিক্ষার ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণীতে তা বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। ভদ্রলোক বাঙালী। ১৯৪৭ সালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখনও বুনিয়াদি শিক্ষার সমর্থন করেন বলেই মনে হয়েছিল।

বুনিয়াদি শিক্ষার acid test সম্বন্ধে একটু বলি। আমরা অবশ্য একেবারে সাহিত্যের লোক, নিতান্ত দায়ে পড়লে নক্ষত্রের মত দূরে রাখি। আমাদের হিসাবে কিন্তু যদি এ শিক্ষায় সামান্য কিছু মুনাফাও হয় তবে সেই কারণেই অন্য শিক্ষার চেয়ে এ ভো ভাল। বুনিয়াদি শিক্ষায় টাকা আনা পাই হিসাবে কত আয় হয়? অঙ্কের হিসাব থেকে বলছি। বালিগঞ্জ থেকে ১৬ মাইল দূরে একটি বুনিয়াদি বিদ্যালয় এখনও আছে। পাঁচ ছয় বছর চলছে। শুধু মুড়ো কেটে ছাত্রেরা প্রথম শ্রেণীতে মাসে জন প্রতি /১৫, দ্বিতীয় শ্রেণীতে জন প্রতি ৸০, তৃতীয় শ্রেণীতে মাসে জন প্রতি ১৷০ রোজগার করেছে। যত ওপরের শ্রেণী হচ্ছে, আয়ও তত বেশি হচ্ছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কতখানি অগ্রসর তা দিয়ে বুনিয়াদি শিক্ষার সত্য

সত্য, জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী বা শঙ্কিত তাঁরা একবার প্রত্যক্ষ দেখে এলে ভাল হত।

ডক্টর জাকির হোসেন ১৯৩৭ সালে যা বলেছেন, তা'র পরে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সব সম্মেলনে যুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি সভাপতিত্ব করেছেন। ৩৭ সালের কথা নিশ্চয় ৫০ সালের কথা নয়। Through-এর বদলে and দেওয়ার কথায় তাঁর অমত নেই, বরং বাংলা দেশে এসে এই কথাই বলেছিলেন, প্রায় দু বৎসর আগে। তিনি বলেছিলেন যে, জোর করে না চাপিয়ে বরং and craft রাখলে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রকৃত পটভূমিকা তৈরী হতে পারে। আমাদের দেশে যে কোর্সে যাঁরা এন্ট্রান্স পাশ করেছেন, এতদিন তাঁরাও তো কোনও সুবিধে করতে পারেন নাই—আমাদের সমাজে তাঁদের কি দুর্গতিই না হয়েছে। And এর বদলে through না হলে সেই অবস্থাই হবে কি না সে আশঙ্কা হয়।

ইংরেজি না শিখলে বাস্তবিক পরাধীনতা আসবে, এই কথা যখন মনে করি, তখন ইংরেজির ফাঁস যে কতদূর পড়িয়েছে তা বোঝা দরকার। আমাদের কথাবার্তায় এবং মনের মধ্যে ও জিনিস একেবারে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়, এমূল না গত হলে নতুন শিক্ষা ঠিকমত আরম্ভ করাই সম্ভব হবে না।

দুধের সুদুরে আমরা সকলেই জল চালছি। মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে তথাকথিত শিক্ষাব্রতী ও সাধারণ, সকলে কতদূর কি করেছি তা দেখা কঠিন নয়। শুধু মন্ত্রীর কথা নয়। পি-পু-কি-সুর মনে আমরাও গোড়ে গোড়ে দিয়ে চলেছি।

কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা? তার কি হবে! ইরাণ তুরাণ চীন আপান তাঁরা যেমন করে শিখেছে আমাদের পক্ষে কি তা সম্ভব হবে না? আর সংস্কৃতির কথা? এতদিন ইংরেজি পড়ে আমের মঞ্জরীর যে চাবি পেয়েছি সে চাবি যে হাতেই থেকে যায়, মঞ্জরী থাকে বন্ধ—চাকরির খাতিরে যেটুকু পড়বার পড়ি; এর চেয়ে বেশি কিছু করি কি? কিন্তু যাঁরা বাস্তবিক আনন্দের জন্য এবং সত্যিকার সংস্কৃতির জন্য পড়েন, আশা করি তাঁরা তখনও পড়বেন। বুনিয়াদি শিক্ষায় শিক্ষিত হ'লে হাতের কাজে বা বস্তুবিদ্যায় প্রবণতা ও সরীসৃপতা দুই-ই হবার যুক্তিসঙ্গত আশা করা যায়।

অতএব যাউঃ।

আন্দামানের শিক্ষা-ব্যবস্থা

[শ্রীপ্রবাসী]

আজকাল আন্দামান বাংলা দেশের সঙ্গে নূতন ভাবে যুক্ত হইতেছে; এতদিন যাহাদের 'কালা-পানি' পার হইয়া যাইতে হইত বা রাজদণ্ডে দ্বীপান্তরিত হইতে হইত, তাহাদের জন্যই প্রধানত আন্দামান নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু আজ পট-পরিবর্তন হইয়াছে। বহু বাঙালী পরবাসী পরিবার সেখানে গিয়া পাকাপাকি বাস করিবার ব্যবস্থা করিতেছে, তাই সেখানে শিক্ষা-ব্যবস্থা কি আছে তাহা জানিলে মন্দ হইবে না। বিশেষ করিয়া যাহারা আন্দামান যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে বিদ্যালয়ে পড়িবার মত বয়সের অনেকেই থাকিবে, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি হয় তাহা জানিতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।

এবাডীন অঞ্চল হইল আব্বামানের কেন্দ্র, সেখানে একটি মাত্র উচ্চ বিদ্যালয়; এই উচ্চ বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত, এখান হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া যায়। দূরবর্তী গ্রামে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও আছে, তবে তার মধ্যে সব চেয়ে বড় হইল এবাডীনের প্রাথমিক বিদ্যালয়; সেখানে ছাত্রসংখ্যা সব চেয়ে বেশি, তাহার দেখাশুনার ব্যবস্থাও সব চেয়ে ভাল। এবাডীন হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে পরাচেয়ম গ্রামে, বন্দরের প্রধান রাস্তার পাশে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তাহাতে আরও উচ্চমানে শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রায় মধ্য বিদ্যালয়ের মানে শিক্ষা দান করা হয়। বাকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় বারো, তাহারা বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত।

আব্বামানে শিক্ষার মাধ্যম হইল উর্দু, সম্প্রতি দুই এক জায়গায় 'টুটাফুটা' হিন্দী, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইতেছে। গোটা স্কুলের শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা কম, তাহাও আবার 'হিন্দীতে'। উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক ইত্যাদি সহজমত কিনিতে পাওয়া যায় না, তেমন ভাল বইয়ের দোকানও নাই। লোকদের মধ্যে এমন বিস্তর আছে যাহারা হিন্দীকে সুনজরে দেখে না। অধিবাসীদের বেশির ভাগ হিন্দু হইলেও উর্দুই হইল সরকারি ভাষা। ইহার কারণ বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

আব্বামানের শিক্ষা-ব্যবস্থা চারি বৎসর আগেও অধিকারের কাঁসে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; এখনও সে ক্ষতির পূরণ হয় নাই। বাড়ির ছেলেমেয়েদের আব্বামানের বাহিরে ভারতবর্ষের কোন না কোন জায়গায় পাঠানো ব্যয়সাধ্যও বটে, অন্য দিক্ দিয়াও সহজ নহে; অগত্যা সরকারি কর্মচারীদের কেহ কেহ একত্র হইয়া সম্প্রতি একটি সামান্য ধরণের বে-সরকারি বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। শিক্ষক নয়, শিক্ষিকারাই সেখানে বেশির ভাগ পড়াইতেছেন। অবশ্য কর্মচারীরা বিভিন্ন প্রদেশের, সুতরাং এই বে-সরকারি বিদ্যালয়ের ভাষা-সংকট বড় কম নয়।

উপরে বলিয়াছি, আব্বামানে শিক্ষিত বা ট্রেইন্ড্ শিক্ষকের সংখ্যা বড় কম। মোট শিক্ষকের সংখ্যা হইল ৬৬; তাহার মধ্যে অন্য যায়ো শিক্ষিকা। এই ৬৬ জনের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট জন ছয়েক, এবং জন বারো হইল 'শিক্ষিত'। বাকী 'শিক্ষিত' তো নহেই, হয়তো ম্যাট্রিকুলেটও নহে। এ বিষয়ে বড় কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, তথাপি এ পর্যন্ত তেমন প্রতিকার করা হয় নাই: কথা হইল এই যে, 'শিক্ষিত' শিক্ষক আব্বামানে পাওয়া যায় না। শিক্ষকদিগকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া 'শিক্ষিত' করার কথা ভাবা যায় না, তাহাতে যত টাকা লাগিবে তাহার পরিমাণ বড় বেশি, সময়ও বড় কম লাগিবে না। তবে কি বাহির হইতে 'শিক্ষিত' শিক্ষক চাই? তাহাতেও আব্বামানের লোকের আপত্তি— আব্বামানের শিক্ষক আব্বামানের লোক হইতে দেওয়া চাই। না হইলে টাকা খরচও অনেক বেশি, আর সে টাকা তো আব্বামানের লোকদেরই দিতে হইবে। এই সমস্যার সমাধান হয়, যদি বাংলা বা বিহার হইতে শিক্ষিত শিক্ষকদের তিন বৎসরের মেয়াদে আব্বামানে আনা যায়। এরূপ শিক্ষকের মন যদি আব্বামানে বসিয়া যায়, তবে মেয়াদ তিন হইতে বাড়াইয়া পাঁচ বৎসর করা যাইতে পারে, অথবা তিনি আব্বামানে বরাবর থাকিয়াও যাইতে পারেন।

আব্বামানে স্কুলে পড়িবার মত অনেক কয়টি মেয়ে আছে। এখন যে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহা সকলের মনঃপূত নয়। সুতরাং একটি মধ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে অনেকেই তাহা পছন্দ করিবেন। শোনা যায় সরকার এরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের অনুকূলে, এবং এরূপ বিদ্যালয় মঞ্জুরও করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্যত কিছু

হয় নাই। যে সব পরগণাতীকে সম্প্রতি আন্দামানে পাঠানো হইয়াছে তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্যও আরও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা বিশেষ দরকার।

সবে ধন নীলমণি ঐ উচ্চ বিদ্যালয়টিতে কিন্তু বিজ্ঞান পড়াইবার বিশেষ সাজ-সরঞ্জাম কিছু নাই। ভাল পুস্তকাগারও উল্লেখ করিবার মত নাই; খুলে খেলার পারদর্শী ছাত্র আছে, অথচ খেলার মাঠ নাই; নাই নাই বলিতে একটি হস্টেলও নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনেরও সুব্যবস্থা নাই। আন্দামানের শিক্ষাব্যবস্থা যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ আনি, পরিবর্তন হয় নাই।

"শিক্ষা কোন্ দিকে ?"

(আলোচনা)

[শ্রীনির্মলকুমার বসু]

'শিক্ষা' পত্রিকায়

সম্পাদিকা মহাশয়া সমীপেষু

মাঘ মাসের "শিক্ষায়" অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত "শিক্ষা কোন্ দিকে ?" প্রবন্ধটি পড়িলাম। এ সম্বন্ধে পাঠকগণের নিকট এবং অধ্যাপক চারু বাবুর সমীপে নিবেদন করিবার মত কিছু আছে। আশা করি তাহার সুযোগ দিয়া আপনি আমাকে বাধিত করিবেন।

উল্লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে ভারতবর্ষ এবং বাংলা দেশের দুষিত কংগ্রেসী রাজনীতির বিষয়ে অনেক কঠোর সমালোচনা রহিয়াছে এবং তৎসহ বিগত শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কেও কিছু কিছু উল্লেখ বর্তমান। এগুলির উদ্দেশ্য হইল, বর্তমান কালে শিক্ষা যে অধোগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করা। প্রবন্ধের শিরোনামায় কিন্তু প্রকাশ যে, শিক্ষাসম্পর্কেই তাঁহার অনুসন্ধান। অতএব রাজনৈতিক বিশ্লেষণে তিনি যদি মাত্রাজ্ঞানহীনতার কোন পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা আমাদের উপেক্ষার বস্তু হওয়া উচিত। কেবল শিক্ষাসম্পর্কেই তাঁহার যাহা বক্তব্য, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের পক্ষে উচিত হইবে।

অধ্যাপক মহাশয়ের প্রথম বক্তব্য হইল, বিরুদ্ধ পক্ষ যাহাই বলুক না কেন, ভারতে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি সর্বৈব দোষের জিনিস না হইয়া ভালর দলের মেশানো জিনিস। ইহার সপক্ষে অন্তত দুইটি যুক্তি দেওয়া চলে। পূর্বকালে উচ্চ শিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণাদি বর্ণের একচেটিয়া আয়ত্তের মধ্যে ছিল। বিদেশী শাসনপর্বের সময়ে ইহাতে আপামর সর্বসাধারণের অধিকার জন্মিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ভারতের কূপমণ্ডূকবৎ শিক্ষাব্যবস্থার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া ইহা আমাদিগকে জগতের

প্রবহমান জীবনস্রোতের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়াছে।

অবশ্য ইহার সংস্কার যে প্রয়োজন হইয়াছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সংস্কারের চেষ্টা সময়ে সময়ে ভ্রান্ত পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী শিল্পের মাধ্যমে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহার ব্যয়-নির্বাহ ছাত্রগণের মজুরির উপরে নির্ভর করে, তাহাকে তিনি এইরূপ একটি ভ্রান্ত সংস্কার-প্রচেষ্টা বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং কংগ্রেসি মন্ত্রীমণ্ডল কার্যত মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবে চালু করিবার ফলে পরোক্ষভাবে দেশের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন বলিয়া লেখক উক্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শিক্ষার সংস্কারের যে প্রয়োজন আছে ইহা স্বীকার করার পর এবং শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ হওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করার পর তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

(১) শিক্ষার জন্য টাকার যোগাড় গভর্ণমেণ্টকেই করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট যদি বহু টাকা অপচয় করিতে পারেন, তাহা হইলে সদ্ব্যয়ই বা করিতে পারিবেন না কেন?

(২) শিক্ষাকে বর্তমান জগতের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে, এবং এতদুদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বহু বিষয় শিক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে, বিশেষত যাঁহারা "শিক্ষা"র মূল প্রবন্ধটি পাঠ করিলে পাঠক-বর্গের ধারণা হইতে পারে যে, ইংরেজের শাসন-কালে, প্রবন্ধকারের আমলে যেমন অসুবিধার পড়িলে ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, তীব্র আলোচনা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, অথচ সত্যের পথে হাঁটিতেও ভয় পাইতেন না, উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে সেই মনোভাব বহুলাংশে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। চারু বাবুর বিশ্লেষণ যদি নির্ভুল হয়, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারীদের দুর্বুদ্ধির ফলে যদি শিক্ষার অধোগতি প্রকৃতপক্ষে সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রতিকার রাষ্ট্রনৈতিক উপায়েই সম্ভব হইতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক রোগের প্রতিকার রাজনৈতিক উপায়ের দ্বারাই সম্ভব। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রকে আগাছার নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদানের সুযোগ লাভ করিবার জন্য, হয়তো শিক্ষাব্রতীগণকে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ইহার জন্য উপস্থিত শিক্ষাব্যবস্থাকে মূলমুখী রাখিতে হইতে পারে। লেখক কি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণকে এবিষয়ে অগ্রসর হইতে বলিবেন, না শুধু রাজনৈতিক কর্মীগণের পিছনে থাকিয়া তাঁহাদিগকে মানসিক ও নৈতিক সমর্থন দান করিয়াই কৃতার্থ বোধ করিবেন?

দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরেই যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের সত্যসত্যই অর্থাভাব ঘটিয়াছে, তবে শিক্ষাবিস্তারের কার্যকরী উপায়ই বা কি হইবে? বস্তুত, এই সমস্যার সমাধানকল্পে গান্ধীজী ১৯৩৭ সালে ওয়ার্ধা পদ্ধতি রচনার কার্যে ব্রতী হন। গান্ধীজী মনে করিতেন, গ্রাম-দেশে প্রয়োজনীয় কোনও শিল্পপদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া একখানীন যদি শরীর ও মনের বিভিন্ন বৃত্তির উন্নতিসাধন করা যায়, এবং ছাত্রগণ সাত বৎসর অধ্যয়নকালে স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা যদি শিক্ষার চলতি ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের মত দরিদ্র দেশে শিক্ষাবিস্তার সহজ এবং কার্যত সম্ভব হইতে পারে। অধ্যাপক চারু বাবু ইহার সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, কোথাও ইহা কার্যত সম্ভব হয় নাই, উপরন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণতার অজুহাতে ছাত্রদিগকে কলের মজুরের সমশ্রেণীতে নামাইয়া প্রকৃত শিক্ষা এবং আনন্দ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

প্রবন্ধে উল্লেখ আছে যে, লেখক এতদ্বুদ্দেশ্যে ওয়ার্ধায় একটি বিদ্যালয়ে ১৪ জন ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। ওয়ার্ধা পদ্ধতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি শিল্পের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষাদানের প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু হয়ত তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা গান্ধীজীর আবিষ্কার নহে। ইউরোপে কোথাও কোথাও প্রাথমিক শিক্ষাজগতে ইহা যে একটি প্রমাণিত রীতি, এই সংবাদ লেখককে জানাইয়া, তিনি যে প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কেবলমাত্র নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ ইঙ্গিত করা আদৌ আমাদের অভিপ্রায় নহে। গান্ধীজীর পদ্ধতিতে মৌলিক বিশেষত্ব ইহাই ছিল যে, তিনি ছাত্রগণকে শিক্ষাদানকালে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী কোনও কার্যকরী বৃত্তি সম্পর্কেও শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেন, এবং শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করার জন্য শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল হইতে বলিতেন। ইহার সমালোচনা চারু বাবু করেন নাই, তবু মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভার যোগান দিতেই হইবে। এই দাবি পেশ করা ছাড়া অর্থাৎ নাগরিকের অধিকারের উল্লেখ করা ছাড়া তিনি পথনির্দেশের দায়িত্ব আদৌ গ্রহণ করেন নাই।

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সপক্ষে লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী, রুডইয়ার্ড কিপলিং এই শিক্ষায়ই সৃষ্টি। বিরুদ্ধ পক্ষে ওয়ার্ধা পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে ১৪ জন ছাত্রকে তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহারা আদৌ দেশের প্রয়োজনানুসারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকিবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই। বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা ছাত্রদের সমকক্ষ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ১৪ জন কেন, ১৪০০০ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা এমন ছাত্র এক বাংলা-দেশেতেই পাওয়া যাইবে যাহাদের মধ্যে শিবপুর বা যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের কোনও যোগ্যতা জন্মায় নাই। সেই অজুহাতেই কি লেখক বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে সরাসরি বাতিল করিয়া দিতে প্রস্তুত হইবেন?

এত অল্প পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া এত জোরের সঙ্গে যদি কেহ স্বীয় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকে প্রচার করেন, তখন স্বভাবতঃ সন্দেহ হয় যে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে লেখক পূর্বাহ্ণ হইতেই পৌঁছিয়া বসিয়া-ছিলেন; কেবল স্বীয় মতকে সাধারণের গ্রহণ-যোগ্য করিবার জন্য অল্প সাক্ষ্যকে অত্যধিক মূল্য দিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না।

বৈজ্ঞানিকের নিকট আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অধিকতর বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগের আশা পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে জীবনের সহিত সম্পর্কহীন বিজ্ঞান শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার সদ্য সদ্য ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, দেশের বহু বৈজ্ঞানিক স্বীয় নিভৃত পরীক্ষাগারকোষ্ঠে উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রতিদিবসের জীবনক্ষেত্রে তাঁহারা বিজ্ঞানবুদ্ধিকে অন্ধবিশ্বাস সংস্কারের তমোবন্ধন হইতে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হন না, বরং সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের নির্জলা-অচরিতার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরাস্ত হইয়া যায়। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে সেরূপ অঘটন ঘটিয়াছে, ইহা আমরা ইঙ্গিত করিতেছি না। বরং বলিতে চাই, তিনি যদি মুক্ত মন লইয়া উপযুক্ত বুনিয়াদি শিক্ষকের দ্বারা চালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার ফলাফল কিরূপ হইতেছে, তাহার সমালোচনামূলক রিপোর্ট দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন, তবে শুধু দেশের জনসাধারণ নহে বুনিয়াদি শিক্ষায় নিযুক্ত কর্মিবৃন্দ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে চিরদিন স্মরণ করিবে। আর যদি বুনিয়াদি শিক্ষা বা

প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি নিজেকে যোগ্য পরিদর্শক বলিয়া মনে না করেন, তবে ঐ পথ ত্যাগ করিয়া বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে সংস্কৃত করিবার কোনও কার্যকরী পন্থার বিষয়ে তিনি চিন্তা করুন।

স্বীয় প্রবন্ধের শেষে তিনি লিখিয়াছেন, "আজ কোথায় সে মহামানব যিনি ভারতকে তা'র পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবেন?" অর্থাৎ তিনি কি আমাদিগকে অবতার পুরুষের জন্য অপেক্ষা করিতেই নির্দেশ দিবেন, আমাদের পুরুষকারকে এমন করিয়াই উপেক্ষা করিবেন?

যে গান্ধীজীকে তিনি যজ্ঞ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, তিনি আর যাহাই করুন, আমাদের অন্তত এই শিক্ষাটুকু দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাহিরের দুর্যোগ যতই বিপদসঙ্কুল, অন্ধকার যতই ঘন হউক না কেন, প্রতি মানুষের অন্তরের দীপালোক যতই ক্ষীণ হউক না কেন, সে যদি সেই দীপকে নির্বাপিত হইতে না দেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে জয়ের আশা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না।

চারু বাবুর লেখনী হইতে সেরূপ আশার বাণী নিঃসৃত হয় নাই। তাহার এক কারণ হয়তো এই যে, যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে আমরা সকলে মানুষ হইয়াছি, তাহা কালেভদ্রে এক আধজন সুচারু বা অসাধারণের সৃজন করিয়া থাকিলেও অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষকে আত্মশক্তি বিষয়ে অভাবগ্রস্ত করিয়া যায়। যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির অপর যে কোন দোষই থাকুক না কেন, তাহা ছাত্রগণের আত্মনির্ভরশীলতাকে আংশিক ভাবে জাগ্রত করে, শিক্ষাকে জীবন-প্রবাহের সহিত সম্পর্কযুক্ত করে। শুধু এইটুকু সাধন করিবার জন্যও হয়তো গান্ধীজীর নাম ভারতের শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে মানুষ কৃতজ্ঞ চিত্তে ভবিষ্যতে স্মরণ করিবে।

শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা

[শ্রীআদিনাথ সেন]

আজ আমাদের দেশের আবহাওয়ায় অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও, দেশে কিছু কিছু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তান এই সব কলকারখানায় নিজেদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কায়িক পরিশ্রমের কাজ করা আজকাল ভদ্রসন্তানের পক্ষে মোটেই নিন্দনীয় নয়। ভদ্রসন্তানদিগকে শিল্পবিদ্যা শিখাইবার জন্য বর্তমানে বাংলা দেশের অনেক জেলায় একটি করিয়া সরকারি শিল্প বিদ্যালয় (Technical School) আছে। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ভদ্র যুবকদের নানারকম লোহার কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি শেখানো হয়। অনেক ভদ্রসন্তান এই সব বিদ্যালয়ে কাজ শিখিবার পর কলকারখানায় প্রবেশ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে যথেষ্ট উন্নতি করেন। আজিকার দিনে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার মধ্যে নূতনত্ব তেমন কিছু নাই; কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। এমন একদিন ছিল যখন ভদ্র যুবকদের পক্ষে এইসব কাজ শিক্ষা করা পরম নিন্দার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন পিতামাতাই চাহিতেন না যে তাঁহার ছেলে শিল্প-বিদ্যা শিখিয়া সামান্য মজুরদের সঙ্গে কলকারখানায় কাজ করে।

তখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল—দেশে শিক্ষিতের আধিক্য ছিল না; কাজেই শিক্ষিতের পক্ষে চাকুরী পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার ছিল। সব পিতামাতাই আশা করিতেন যে তাঁহার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই সরকারি চাকুরী পাইয়া যাইবে। মোট কথা, তখনকার দিনে পরের দাসত্ব করায় আপত্তি ছিল না—আপত্তি ছিল কায়িক পরিশ্রমে। বাঙালী চিরকালই কায়িক পরিশ্রম এবং চাকুরীর মধ্যে বিভিন্নতার সীমারেখা নির্দেশ করিয়া আসিয়াছে। বাঙালী যে সাধারণত স্বাধীন ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে না, অনেক কারণের মধ্যে ইহাও তাহার একটা কারণ। চাকুরিজীবী বাঙালীর এই মনোবৃত্তি অসুস্থ। বাঙালী বুঝিতে পারে নাই যে এরকম সুখের অবস্থা চিরকাল থাকিবে না। যতই শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িবে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ততই জটিল হইবে, এবং এ সুখের অবস্থায় ভাঙন ধরিবে। দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে যে নানারকম গলদ আছে, তাহা লইয়া এখনও অনেক আলোচনা হয়, কিন্তু এ সমস্যার সমাধান আজও হইয়া ওঠে নাই।

দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থার ছবিতে দেখিতে পাই যে চিরদিনই আমাদের দেশে কৃষি-সভ্যতা থাকিবে না। পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের দেশেও একদিন যন্ত্রশিল্পকে প্রসার লাভ করিতেই হইবে। সেই যন্ত্র-শিল্প এবং যন্ত্র-সভ্যতার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে শুধু সাধারণ শিক্ষা পাইলেই চলিবে না—তাহার সঙ্গে হাতে কলমে কাজ শেখাও চাই। যন্ত্র-শিল্প পরিচালনার জন্য কায়িক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়; সে কায়িক পরিশ্রম মোটেই নিন্দনীয় নয়। আজিকার দিনেও বাঙালী শিক্ষিত সমাজে কায়িক পরিশ্রমের প্রতি ঘৃণাবোধ যে না আছে এমন নয়; কিন্তু বর্তমানকালে অর্থনৈতিক কারণে সে ঘৃণাবোধের তীক্ষ্ণতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। আজকাল অনেক শিক্ষিত বাঙালী যুবককেই কলকারখানায় কায়িক শ্রমবিভাগে আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যায়।

ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সরকারি বা ইউরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্যের নিম্নস্তরের চাকুরিয়া তৈয়ার করা। ইহা শাসন বা বাণিজ্যের জন্যই দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবাসীকে উচ্চপদ দেওয়া ইংরেজ শাসন ও বাণিজ্য-নীতিবিরুদ্ধ ছিল। যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠিত না, তথাপি বাহ্যত অযোগ্যতার দোহাই দিয়াই ভারতবাসীকে উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত করা হইত। উচ্চপদ না জুটিলেও নিরাপদে যে বেতন মিলিত, সে সময়ে তাহাতে সংসারের অভাবাদি পূর্ণ করিবার কোন অন্তরায় হইত না। এই স্বাচ্ছন্দ্য ভবিষ্যৎ যুগের জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা ও কঠিনতর জীবন যাত্রা সম্বন্ধে ইহাদের সকলেই প্রায় উদাসীন ছিলেন বলিলেও হয়। পারিবারিক বৃত্তি অথবা কোন অর্থকরী পেশা ব্যতিরেকে, সকলেই এই চাকুরীর পথে ধাবিত হইত। লাভজনক শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। ধনীর টাকাও নিরাপদে অর্থ বিনিয়োগার্থে শুধু জমিদারী কিনিতেই ব্যয় হইত। জমিদারী আধুনিক প্রগতির বিরোধী; জগতের অগ্রগতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে না হইলে এবং জীবনযাত্রার মান (standard of living) উন্নতর করিতে হইলে দেশের কৃষি-সম্পদ মূল্যবান হইলেও যথেষ্ট নহে। ইহার জন্য শিল্পবাণিজ্যের দরকার। দুর্ভাগ্য-বশত তখনকার শিক্ষিত শ্রেণীর (অপ্রচুর অর্থ-সামর্থ্য, অনুপযুক্ত শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার অভাব যাহার জন্য দায়ী), এই অদূরদর্শী প্রগতির সহায়তাই করিয়াছিল। শিক্ষামন্দির হইতে সোজাসুজি

চাকুরীর পথও ক্রমে সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইল। প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার সহিত অন্যান্য বিশেষ বিশেষ কারণ যুক্ত হওয়ায় অবশেষে তাহাও একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। শিল্প-বাণিজ্যের দিকে তখন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, কিন্তু অনেক বিলম্বে। সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত অর্থকরী কার্য পাওয়ার উপায়ই শিল্প-বাণিজ্য। আরও একটি কথা বলা দরকার। এদেশে পূর্বে বৃহৎসংখ্যক অতি ক্ষুদ্রকায় শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ভারতের কারুশিল্প সমস্ত জগতে আদৃত হইত। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় গৃহে বসিয়াও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের অসুবিধা হইত না। তখন শৈশুক শিক্ষা বা ওস্তাদের শিক্ষানবীশি ব্যতিরেকে শিল্প-কার্যে জীবিকা অর্জনের জন্য সাধারণ শিক্ষার আবশ্যকতা বোধ হইত না। এ যুগে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনই মূল সমস্যা নহে। বাণিজ্য ও বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য মনোহর বিজ্ঞাপন ও প্রচুর প্রচার-কার্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার জন্য সাধারণ শিক্ষা অতিশয় আবশ্যক। আমার ইসারায় ব্যক্তি বা গণবিশেষের কোন জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্তে পক্ষপাতিত্বের দুর্বলতাবশত, দরিদ্রতাকে অর্থের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া অথবা সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়া, অশিক্ষিতের নিকট দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক সমস্যা ঘোরালো করিয়া তোলা প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ বর্তমান জটিল অবস্থায় সাধারণ শিক্ষা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক সভ্যদেশে জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূরীভূত করা হইয়াছে। ভারতের শাসন কার্যে ইহার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া, এদিকে দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে, অযৌক্তিক ব্যয় সাধ্য ও কার্যকলাপে, দেশ হিংসাত্মক অরাজকতায় ও অন্ধ আশঙ্কায় প্রেতভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। পরন্তু এখনকার ক্রমবর্ধমান ব্যয়সাপেক্ষে, শিক্ষিত লোকের মারফত চিঠি অথবা সাক্ষাৎ সংস্পর্শ (interview), অশিক্ষিতের অযৌক্তিক, উদ্দেশ্যহীন, অর্ধস্ফুট বা অসংলগ্ন কথা (যাহা ঠেকা করিয়া বুঝিতে হয়) হইতে অধিকতর কার্যকরী হয়, এই কারণেও সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করিয়া বাস্তব কার্য ও চেষ্টায় সামঞ্জস্য রক্ষা করে। সুতরাং সামঞ্জস্য জ্ঞানের অভাবে, বিচার করিবার বা প্রকাশ করিবার ক্ষমতার বিকাশ না হওয়ার ফলে, কোন বিষয় বা বস্তুর প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধির অন্তরায় হয়। বাণিজ্যের প্রসারের নিমিত্ত, জনসাধারণের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নামিবার জন্য যেমন ব্যবহারিক শিক্ষা অপরিহার্য, তেমনই প্রাক্তন সাধারণ শিক্ষাও নিতান্ত আবশ্যক। আজিকার দিনে এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান, কিন্তু শুধু কৃষিতে কোনও জাতিরই অধিক উন্নতি হইতে পারে না, ইহা সর্বাধিসম্মত। বাণিজ্যে এবং শিল্পে লক্ষ্মীর বাস। একদিন একথা মানিয়া দেশ-দেশান্তরে ভারতের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন দেশের লোকে গুণগ্রাহী ছিল। আজ প্রতিযোগিতার দিন, সভ্যতার আদর। আজই তাই বিশেষ শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

———

বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা

[সংকলিত]

আমরা সকলেই সংস্কৃত শিক্ষার উপকারিতার কথা মুখে মুখে বলি, অথচ সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিয়া দুঃখ করি। গলদ কোথায়?

এমন যে দক্ষিণ ভারত, যেখানে আমরা সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন বা চর্চা সমধিক বলিয়া গৌরব করি, সেখানেও সংস্কৃত পড়াশোনার বেগ ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। উত্তর ভারতে অনেকে তো ভয়ই করে যে, সংস্কৃতের চর্চা বাড়িলে নাকি মাতৃভাষার চর্চা কমিয়া যাইবে।

এ অবস্থা তো নূতন নয়। তবে সম্প্রতি যে আশঙ্কার কলরব শোনা যাইতেছে, তাহার মূলে আছে সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ, বিরাগ নয়। আমাদের সংস্কৃতির দিক্ হইতে ইহার মূল্য এত বেশি যে ইহার চর্চা কমিয়া গেলে পৃথিবীর অগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে আমাদের স্থানও সংশয়াকুল হইবে।

এ কথা সত্য যে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা ধীরে ধীরে কোনঠাসা হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু বিদ্যালয়ই তো সংস্কৃত শিক্ষার বা শিক্ষার একমাত্র ক্ষেত্র নহে। মানুষের মধ্যে যে বিশ্ব গুপ্ত রহিয়াছে তাহাকে পাখিদের অনুভূত করিবার বিস্তর জায়গা আছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইল, এমন নয়; পরিবারে, গোষ্ঠী, সমাজ—সর্বত্র শিক্ষা দিতে ও পাইতে হয়। জীবনে যত দুঃখ কষ্ট তাহার প্রতিকার করিতে হইলে শুধু নূতন পথ বাহির করিতে হইবে, দেখা নয়, হয়তো দীর্ঘকাল তোষের সম্ভাবনায় এমন সব ঔষধ সেবন করিতে হয় যাহা আশুফলপ্রদ নহে, বরং দূরে তাহার ফল দেখা যাইতে পারে। মহাভারত, রামায়ণ, উপনিষদে যে সংস্কৃতি আছে, তাহার ফল ব্যাপক, আজও তাহার প্রভাব জীবনে দেখা যায়। যুগে যুগে এই প্রাচীন সংস্কৃতির নব নব রূপ দেখিতে পাই, তাই না ইহার এত আদর। সেই সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যোগ কত দৃঢ় তাহা অনুভব করিতে হইবে।

সংস্কৃত ভাষার চর্চায় চিন্তার যাথার্থ্য (accuracy of thought) ও প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গতি (exactness of expression) বৃদ্ধি পাইবে। সংস্কৃত শেখা যে কঠিন, তাহা তো নয়; আজকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালীর ফলে যাহা সহজ তাহাকে কঠিন করিয়া তোলা হইয়াছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় যে সব শব্দ তৎসম, তাহাদের সংস্কৃত রূপ শেখানো প্রথমে প্রয়োজন। তাহার পর চাই অমরকোষের সঙ্গে পরিচয়, এবং সহজভাবে ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি পড়ানো। তখন সংস্কৃতের ভয় আর থাকিবে না।

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

বর্ণ পরিচয় ও লেখা : খেলা ও পড়া ১ম ভাগ—প্রকাশক, কিণ্ডারগার্টেন হোম। ৬৪ পৃষ্ঠা সচিত্রিত বোর্ড, ছাওড়া।

"বর্ণ পরিচয় ও লেখা"র আলোচনা পুস্তক-পরিচয়ের মধ্যে স্থান পাইবে কিনা, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলাম। অন্য কোনও স্থানে না থাকাতেই এখানে উক্ত আলোচনা দেওয়া যাইতেছে। ইহা শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ-পুস্তিকা। শিশুর বর্ণপরিচয় ও লেখার পথ সহজ ও সরস করিবার জন্য কিণ্ডারগার্টেন হোম কিছু কিছু সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করিবার কিছু নির্দেশ চাই। 'বর্ণ পরিচয় ও লেখা' সেই নির্দেশ পুস্তিকা। ইংরেজি ভাষায় যাহাকে Guide Book বলে, ইহা তাহাই। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারের কার্ড ও চার্ট দিয়া ইহা গঠিত। ইহাকে 'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে' না বলিয়া 'খেলাচ্ছলেন বালানাং বর্ণপরিচয়ঃ ক্রিয়তে' বলা যাইতে পারে। অধ্যক্ষ নিতেন্দ্রমোহন সেন নির্দেশ-পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তিনি বলিয়া দিয়াছেন, "শিক্ষকেরা এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অনেক শব্দ ও কথা যোজনা করিয়া শিশুদের শিখাইতে পারিবেন।" বর্ণ-পরিচয় ও লেখার নির্দেশ পুস্তিকার মধ্যে কিছু ছাপার ভুল দেখিলাম, হয়তো আরও আছে। শিক্ষাপুস্তকে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া চাই।

"বর্ণ পরিচয় ও লেখা"র পরে "খেলা ও পড়া"র প্রথম ভাগ। ইহাও সুচিন্তিত। পরিকল্পনা ভাল হইয়াছে। কিন্তু এখানেও বর্ণাশুদ্ধি পীড়াদায়ক। সাত খানি কার্ডে আঠারোটি পাঠ আছে, তাহাড়া আরও বিস্তর কার্ড ও বহুল অক্ষর আছে। সুদৃশ্য বাক্সে "বর্ণ-পরিচয় ও লেখা"র দাম বাক্স সহ ১৷৷০ আর "খেলা ও পড়া"র দাম ১৸০। শিশুদের উপহার দিবার মত জিনিস।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা ২৷৷০ টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। সিনেমার কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, পোঃ বালীবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১ম বর্ষ	চৈত্র ১৩৫৭	৫ম সংখ্যা

আলোচনা

বয়স্ক-শিক্ষা শিক্ষণ

গত চৈত্র মাস হইতে ভারতীয় যুব সেবা সংঘ (Indian Youth Service) একটি বয়স্ক-শিক্ষা শিক্ষণ কেন্দ্র চালাইতেছেন। দুই মাস ধরিয়া কেন্দ্র চলিবার কথা। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের হাতে কেন্দ্র পরিচালনের ব্যবস্থার ভার দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি নহে—ত্রিশ জন নাম দিয়াছিল, উপস্থিতি সংখ্যা সাতে দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য এই সাত জনও যদি শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকে, তাহা হইলে ৪টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। অধ্যাপক পরংচন্দ্র বসু, অধ্যাপক গোপালচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন গুপ্ত প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন। এই উদ্যোগের কর্মে পরিণতির আশায় সাগ্রহে অপেক্ষা করিব।

পশ্চিম-বঙ্গ সরকার পতিতাবৃত্তি নিবারণ ও জন পঞ্চাশেক শিক্ষিকার বয়স্ক-শিক্ষা শিক্ষার জন্য গ্রীষ্মাবকাশে এক শিবির খুলিতেছেন বলিয়া শুনিলাম। শিক্ষাকাল ছয় সপ্তাহ, এবং শিক্ষাস্থল বাণীপুর। গ্রীষ্মকালে বাণীপুরে অবস্থান বা শিক্ষাদান কিরূপ হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। তথাপি সরকারের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুব্যবস্থা হইতে পারিবে বলিয়া তর্ক করা অসঙ্গত নহে।

'কি শিখিবে?' এখনও পুরাতন পাঠ্য-তালিকাই চলিয়া আসিতেছে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যতালিকারও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী নয় কি? তবে এখনকার অভিজ্ঞতা তেমন গভীর বা ব্যাপক হয় নাই।

শিক্ষকের প্রশংসাপত্র

হুগলী জেলার উত্তরপাড়া অঞ্চলের কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বাসভবনের তিনটি ঘর ব্যতীত সমস্ত সম্পত্তিই তিনি উক্ত বিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। সহস্র-প্রকার অভাব অনটনের মধ্যেও পল্লীতে শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া উদার দৃষ্টি অব্যাহত রাখিতে পারেন, বাংলায় এরূপ শিক্ষকের আজও অভাব

হয় নাই, ইহা শ্লাঘার সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে। সচীনবাবুর এই দানপত্র বাংলার শিক্ষক-সমাজের গৌরবের বস্তু ও দেশের ভরসা।

রবীন্দ্র স্মারক পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪০-৪১ সালের শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় উভয়কেই ৫০০০৲ টাকা মূল্যের 'রবীন্দ্র স্মারক পুরস্কার' দিয়াছেন। বিভূতিভূষণের পরলোক গমনের পরই তাঁহার স্মৃতিসভায় এইজন্য সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আচার্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের Ancient Indian Life-এ প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী নানাদিকে অতীত ভারতের জীবন ব্যাপার আলোচনা করিয়াছে। দুইজনেই কোন না কোন সময়ে শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকের পাণ্ডিত্য সাধারণ পুরস্কৃত হইতে দেখিয়া 'শিক্ষা' আনন্দিত।

বিশ্বসংসদে বাঙালী মহিলা শিক্ষাব্রতী

তৃতীয় পরিচয় দাস এম. এ., বি. টি., সি. এইচ. ডি., 'ইউনেস্কোর' শিক্ষা বিভাগে বিশেষজ্ঞ রূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। বাঙালী মহিলারা শিক্ষাব্রত করিয়া বিশ্বের শিক্ষা পরিচালনায় তাঁহাদের সাধ্যমত শক্তিদান করিবে—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'—ইহাই ছিল কবির স্বপ্ন। সে স্বপ্ন যাঁহারা সার্থক করিতেছেন তাঁহারা আমাদের গৌরবের পাত্র।

সেবাগ্রামে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন

মার্চের প্রথম সপ্তাহে সেবাগ্রামে এক নিখিল-ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হইবার পর এ পর্যন্ত বারো বৎসরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছয়টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৩৫ সনে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষা এখন মহাসাগরে পড়িবে, অর্থাৎ শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা নয়, পরি ছাড়াইয়া অগ্রসরও যাইবে। সেবাগ্রামের সম্মেলনে গান্ধীজীর নির্দেশমত শিশু এবং কিশোরদের জন্য যথাক্রমে প্রাক্-বুনিয়াদী ও উত্তর-বুনিয়াদি পাঠ্যক্রম প্রথম আলোচিত হয়। তাহার পর হইতে সম্মেলন গুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ সুপরিচালিত হইয়াছে এবং বিহার, তামিলনাড় ও উড়িষ্যায়ও এই কাজের অগ্রগতি লক্ষিত হয়। কতকগুলি কারণে সেবাগ্রামের ১৯৪১ সনের অর্থাৎ এবারকার সম্মেলন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের লইয়া এই প্রথম একটি তিন দিবসব্যাপী সম্মেলন হইবার পর একটি সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল অতিরিক্ত কর্মরত শিক্ষকগণ সাধারণ সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য থাকিয়া গেলেন, এবং সম্মেলনের মধ্যে বিভিন্ন সভা সমিতির পরস্পর পরিশ্রম ও আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঐ সকল বিতর্কে নদী তালিমের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করা হয়। ইহাতে সকলের খুবই উপকার হয়। বস্তুত এই সম্মেলনের আবহাওয়া ছিল প্রাণবন্ত, এবং গবেষণাপূর্ণ আলোচনার উপযোগী। এই ধরণের বৃহৎ অনুষ্ঠানে সচরাচর ঐরূপ আবহাওয়া বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না।

সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। সেবাগ্রামের বাহির হইতে প্রায় ৬৫০ জন এবং স্থানীয় নেপাল, আসাম ও বিহারের হইতেও প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। সম্মেলনে বহু বিদেশী উপস্থিত ছিলেন। যুক্ত-প্রদেশের হোসেলাবাদের উপকণ্ঠে রহুনিয়া নিবাসী সমাজ-সেবক জোন্যাল্ড ব্রুমও উপস্থিত ছিলেন।

খরচের দিক দিয়াও একটা কথা বলার আছে। এই জাতীয় কোন বিরাট সম্মেলন এত সস্তায় করা সম্ভবপর নহে। দৈনিক খাওয়া বাবদ কর্মকর্তার নিকট হইতে কেবলমাত্র ১৷০ টাকা ধার্য করা হইয়া-

ছিল। যদি তাঁহাদের নিকট হইতে রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ২৲ টাকা ধার্য করা হইত, তবে এই সম্মেলনের সকল ব্যয় কুলাইয়া যাইত। অর্থাভাবে 'নয়ী তালিম' নীতির সহজ, আত্মনির্ভরশীল ও দায়িত্বপূর্ণ প্রয়োগের জন্য ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই বিরাট সম্মেলনে সকলে এই নীতির মর্ম কার্যত গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে।

সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় যাহা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা নূতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা। যদিও বিভিন্ন বক্তৃতা হইতে কোন স্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করা যায় না, তথাপি এই আলোচনা ঐ বিষয়ে লোককে ভাবিতে উৎসাহিত করিবে। এই বিষয়ে নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্য হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘ একটি গবেষণা কমিটি নিয়োগ করিয়াছে।

ভারতীয় ঐতিহাসিক নাটক এই সম্মেলনের একটি উপভোগ্য বিষয়। গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য ঘটনা লইয়া ঐতিহাসিক নাটক রচনা ও অভিনয় করা কর্মীদের বহুকালের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু তাহা এতদিন সার্থক হয় নাই। এই সম্মেলনে নয়ী তালিমের শিক্ষার্থী শিশুগণ ও ছাত্রছাত্রিগণ 'ভারত কী কথা' অভিনয় করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতে যে সামাজিক জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি বহিয়া আসিয়াছে তাহাই ছিল অভিনয়ের বিষয়। বাস্তব-সত্য কোন চিত্র খুব কমই দেখানো হইয়াছে। কেবলমাত্র ঘটক হিসাবে কখনও কখনও দুই একটি চিত্র দেখানো হইয়াছে, যেমন বৌদ্ধধর্মের ফলে চীনের সহিত যোগস্থাপন অথবা সত্য টমাসের আবির্ভাবের ফলে খ্রীষ্টধর্ম। অভিনয় পূর্ব উদ্যমে চলিয়াছিল ও খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। দর্শকগণ আনন্দের মধ্য দিয়া ইহা হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক আদর্শ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন।

(ইংরাজি 'হরিজন' পত্রিকা হইতে সংগৃহীত)

গুজরাটে তৃতীয় নয়ী তালিম সম্মেলন

গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে বারদোলী তালুকা আশ্রমে শ্রীমতী আশাদেবী আর্যনায়কমের নেতৃত্বে গুজরাত নয়ী তালিম সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা নিম্নলিখিত সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন—

(১)	গুজরাত নয়ী তালিম সংঘের সভ্য	১৩
(২)	তা ছাড়া বিশেষ শিক্ষণ সংস্থা	১৩
(৩)	গঠনাত্মক কর্মপ্রতিষ্ঠান	১২
(৪)	জেলা স্কুল বোর্ড	৪
(৫)	স্কুল বোর্ডের বিদ্যালয়	১৫
(৬)	সরকারি অধ্যাপন মন্দির	৪
(৭)	শিক্ষাধিকারী	২
(৮)	শিক্ষার্থী	১১০

সম্মেলনে নানাপ্রকার আলোচনার শেষে নিম্নলিখিত চার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রথমত—**ভ্রাতৃচারিণী**; পূজ্য বাপু বলেছেন, সেবামূর্তি ঠক্কর বাপা, এবং যোগিনের অবসিদ্ধের লোকান্তর গমনে।

দ্বিতীয়ত—**স্বাবলম্বন**; নয়ী তালিমের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সর্বদা স্বাবলম্বনকে আদর্শ করিয়া রাখিতে হইবে।

তৃতীয়ত—**গ্রাম বিদ্যাপীঠ**; গ্রাম বিদ্যাপীঠে নয়ী তালিমের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ, পূর্ব-বুনিয়াদী, বুনিয়াদী, উত্তর-বুনিয়াদী, উচ্চ শিক্ষণ ও সংশোধন, বয়স্ক-শিক্ষণ এ সমস্ত অঙ্গই জুটাইয়া তুলিতে হইবে।

চতুর্থত—**অভ্যাসক্রম ও পরীক্ষা**; ইহার উপর প্রত্যক্ষভাবে নয়ী তালিমের অগ্রগতি নির্ভর করিতেছে। অভ্যাসক্রমকেই আমরা method বা প্রণালী বলিয়া পরিচয় দিই।

ধারাপাত

[শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য]

ধারাপাত কথাটার ঠিক অর্থ যে কি তা জানি না, তবে, ধারাপাত জিনিসটা দেখলে মনে হয়, ইংরেজীতে Book of Tables বললে যা বোঝায় ধারাপাত তাই। ধারাপাত পরিচয়িকার পরের বই। প্রথমে ছেলেকে ধারাপাত মুখস্থ করানো হয়। ধারাপাত শেষ হলে তারপর অঙ্ক আরম্ভ হয়।

প্রথমে পণকিয়া, তারপর কড়া গণ্ডা বুড়ি পণ কৌড় কাঠা সের ও দশকিয়া, তারপর যোগ ও গুণের নামতা দইয়া পেড়িয়া আড়াইয়া এবং সকলের শেষে গণনা মুদ্রা ওজন ও মাপের আর্যা, এই হল সংক্ষেপে ধারাপাতের বিষয়। অঙ্ক শেখাবার আগে এইগুলি ছেলেকে মুখস্থ করতে দেওয়া হয়। মুখস্থ করবার একটা বিশেষ প্রণালীও আছে। ছেলেদের মধ্যে একজন বলবে, আর সকলে তার সঙ্গে সঙ্গে বলে। পণকিয়া থেকে দশকিয়া অবধি লেখানোও হয়। প্রথম প্রথম পাঠশালার অনেকখানি সময় ছেলেদের ধারাপাত লেখাতেই যায়। প্রায় বছরখানেক ধরে প্রতিদিন খানিকক্ষণ ছেলেরা ধারাপাত লেখে এবং মুখস্থ করে। কিছুদিন পরে শিক্ষক 'তাক' জিজ্ঞাসা করে ছেলেদের ধারাপাতের পরীক্ষা করতে থাকেন। এইভাবে ধারাপাত শেখা হয়ে গেলে পরে সাধারণ অঙ্ক আরম্ভ হয়। এই ধারাপাত শেখার ব্যাপারে সময় তো যায়ই, পরিশ্রমও বড় কম হয় না।

এখন প্রশ্ন, এই যে এতদিন ধরে পরিশ্রম করে ধারাপাত শেখা, এর কোন প্রয়োজন আছে কি না? আর, যদি থাকেও তাহলে যখন যেভাবে শেখানো হয় তাই ঠিক কি না?

ধারাপাত শেখার খানিকটা প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, নামতা এবং মুদ্রা প্রভৃতির আর্যা তো লিখতেই হয়। যারা ইংরেজী প্রথায় অঙ্ক শেখে তাদেরও এ না শিখে উপায় নাই। তারপর, বাঙলায় মুদ্রা প্রভৃতির বিভিন্ন অংশ, যেমন আনা পয়সা সের ছটাক প্রভৃতি, আলাদা রকমে লেখার রীতি আছে। কাজেই এগুলোও না শিখলে নয়।

তবে, নামতা যতটা মুখস্থ করানো হয় অতটার দরকার নাই। অবশ্য, যোগের নামতা সাধারণত মুখস্থ করানো হয় না, গুণের নামতাই মুখস্থ করানো হয় কিন্তু এই গুণের নামতার মধ্যেও সাকে আমরা একের নামতা বলি সেই অংশটা (অর্থাৎ ১ থেকে ১০এর ঘর পর্যন্ত নামতা) এবং দুইয়ের নামতার ১২, ১৬ এবং ২০র ঘর মুখস্থ করালেই চলে। তার আবার কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে অনেকখানি সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। সইয়া পেড়িয়া আড়াইয়া মুখস্থ করাবার প্রয়োজন নাই।

কড়া গণ্ডা প্রভৃতিও এতদূর পর্যন্ত মুখস্থ করানো একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। ছেলেবেলায় সকলেই আমরা অনেকদিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে কড়া গণ্ডা মুখস্থ করেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই তা মুখস্থ আছে। বলতে হলে আমরা হিসাব করেই বলি। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে 'পঁয়তাল্লিশ কড়ায় কত হয়?' আমরা তখনই হিসাব করি 'চার এগায় চুয়াল্লিশ আর একে পঁয়তাল্লিশ' এবং বলি 'এগার গণ্ডা এক কড়া'। তবে, এই হিসাব আমরা এত তাড়াতাড়ি করি যে মনে হয় যেন আমরা মুখস্থ থেকেই বলছি।

এই যখন অবস্থা তখন অত পরিশ্রম করে

গুলো মুখস্থ করবার প্রয়োজন কি? তবে, খানিকটা করে মুখস্থ করতে হবে। প্রত্যেকটা একক তার পরবর্তী একক পর্যন্ত মুখস্থ করা দরকার। যেমন, কড়া গণ্ডা পর্যন্ত অর্থাৎ এক কড়া, দুই কড়া, তিন কড়া, চার কড়ায় এক গণ্ডা এইটুকু মুখস্থ করতে হবে। পরবর্তী একককের ব্যবহার যেখানে কম, সেখানে পরের যে এককের ব্যবহার বেশি, সেই একক পর্যন্ত মুখস্থ করা দরকার। যেমন, বুড়ির ব্যবহার বড় নাই। কাজেই গণ্ডা পণ পর্যন্ত অর্থাৎ এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা থেকে বুড়ি গণ্ডায় এক পণ অবধি মুখস্থ করতে হবে। বাকিটুকু ছেলে হিসাব করেই বলবে। প্রথম প্রথম হিসাব করতে একটু দেরি হবে। কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি নাই। কিছুদিন পরে ছেলে বেশ তাড়াতাড়িই হিসাব করতে পারবে। সে যে হিসাব করে বলছে তা মনেই হবে না। মনে হবে, সে মুখস্থ থেকেই বলছে।

আর, মুখস্থ থেকে বললেই যে মানুষ তাড়াতাড়ি বলতে পারে তাও সব সময়ে নয়। প্রত্যেকটি জিনিস আলাদা আলাদা করে মুখস্থ বলতে অনেকদিনের অভ্যাসের প্রয়োজন। প্রথম প্রথম অনেকেই তা পারে না। 'পাঁচ সাতে কত হয়?' জিজ্ঞাসা করলে তারা পাঁচের ঘর নামতা গোড়া থেকে আবৃত্তি করতে সুরু করে। তাদের পাঁচের ঘর নামতা মুখস্থ আছে বটে, কিন্তু সমস্তটা একেবারে মুখস্থ আছে। পাঁচের ঘর নামতার দশটা বিষয় আলাদা আলাদা মুখস্থ নাই।

তারপর প্রশ্ন, এই যেটুকু ধারাপাত সে মুখস্থ করবে সেটুকু করবে কখন? এখন ছেলেরা যা করে সে হচ্ছে অঙ্ক কষতে আরম্ভ করবার পূর্বেই সমস্ত কিছু মুখস্থ করে শেষ করা। এটার শুধু যে প্রয়োজন নাই তা নয়। এটা ঠিকও নয়। ছেলে যা শিখবে তার প্রয়োজন বুঝে সেই প্রয়োজনের তাগিদে শিখবে, এই হওয়া উচিত। ছেলেরা যখন কড়া গণ্ডা মুখস্থ করে তখন কড়া গণ্ডার প্রয়োজনও বোঝে না, কড়া গণ্ডা কি জিনিস তাও জানে না। এই অবস্থায় তাদের কড়া গণ্ডা শেখাতে যাওয়া উচিত নয়।

প্রথমে ছেলে সংখ্যা পড়তে ও লিখতে শিখবে এবং এই উপলক্ষে শতকিয়া মুখস্থ করবে। তাও সবটা একবারে না করানোই ভাল। প্রথমে ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা শেখানোই উচিত। ছেলে যে বয়সে প্রথম সংখ্যা শেখে সেই বয়সে কুড়ির চেয়ে বেশি সংখ্যার ধারণা করতে সে পারে না। এই সংখ্যা শেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি ছেলে এই সংখ্যার ব্যবহারও শেখে তাহলে ভাল হয়। সংখ্যা ব্যবহার করতে করতে ক্রমশ সংখ্যার সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়, ব্যবহারের ভিতর দিয়ে সংখ্যা সহজেই মুখস্থ হয়ে যায়। সেইজন্য ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে এর বেশি সংখ্যা যার মধ্যে না আসে এমন যোগ বিয়োগ শেখাতে হয়।

এই উপলক্ষে ছেলেকে ১ থেকে ১০এর ঘর যোগের নামতা শিখিয়ে দিলে ভাল হয়। সাধারণত যোগের নামতা শেখানো হয় না। ছেলেরা আঙুল গুনে গুনে যোগ করে। আঙুল গুনে যোগ করার অর্থ এক এক করে যোগ করা। ধরা যাক, ছেলেকে ৫ আর ৭ যোগ করতে বলা হয়েছে এবং সে আঙুল গুনে যোগ করছে। সে কিভাবে যোগ করবে? সে হিসাব করবে, ৫ আর ১এ ৬ আর ১এ ৭, আর ১এ ৮, আর ১এ ৯, এইভাবে। এতে দেরি হয়। তাই প্রথম কিছুদিন ছেলেকে আঙুল গুনতে দিলেও তাকে এই অভ্যাসের বশবর্তী হতে দেওয়া ঠিক নয়। দুটো সংখ্যা যোগ করলে কত হয় তা যাতে ছেলে একবারেই বলতে পারে সেইভাবে তাকে শিক্ষা দিতে হয়। যোগের নামতা শেখানো এইটা হয়।

অনেক ধারাপাতে বিয়োগের নামতাও থাকে।

কিন্তু বিয়োগের নামতা আলাদা করে শেখাবার কোন প্রয়োজন নাই। যোগের নামতা দিয়ে যোগ বিয়োগ দুইয়েরই কাজ চলে। ভাগের নামতা আলাদা করে শেখার প্রয়োজন হয় না, গুণের নামতা দিয়ে গুণ ভাগ দুইয়েরই কাজ চলে। এত তেমনই।

১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা এবং এই সংখ্যা-সম্বলিত ছোট ছোট যোগ বিয়োগ মোটামুটি শেখা হলে তারপর ছেলেকে ২১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা শেখাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যার যোগ বিয়োগও করাতে হবে। খানিকটা অভ্যাস হলে তখন গুণের নামতা এবং তার সঙ্গে গুণ ভাগের অঙ্ক শেখাতে হবে প্রথম বছরটা এর বেশি শেখাবার দরকার নাই।

একটা বছরে এইভাবে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা এবং তার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শেখা হলে দ্বিতীয় বছরে ছেলেকে ভগ্ন সংখ্যা শেখাতে আরম্ভ করা যেতে পারে। প্রথমে সিকি, আধ, পৌনে এক-এর চিহ্ন ¼, ½, ¾ এবং তার ব্যবহার শেখাতে হবে। এই উপলক্ষে সওয়া, দেড়, আড়াই কি জিনিস তা বলে দেওয়া এবং ১০ পর্যন্ত সইয়া দেড়িয়া আড়াইয়ের হিসাব শেখানো যেতে পারে। এগুলি মুখস্থ করাবার প্রয়োজন নাই। কেমন করে হিসাব করে বার করতে হয় তাই শেখালেই চলবে।

এর পরে ছেলেকে এক একটি করে আর্যা শেখাতে হবে। আর্যা শেখাবার সময় তার ভিতরকার এক একটি একক কেমন করে লিখতে হয় তাও শেখাতে হবে। প্রথমে গণনার আর্যা (১ কড়ায় ১ গণ্ডা, ৪ গণ্ডায় ১ বুড়ি, ৪ বুড়ি বা ২০ গণ্ডায় ১ পণ, ৪ পণে ১ চৌক, ৪ চৌক বা ১৬ পণে ১ কাহন)। এইভাবে গোনার রীতি আজকাল নাই। খড় ছাড়া আর বড় কিছু এখন এভাবে গোনা হয় না। তবু এই আর্যা শেখাবার প্রয়োজন আছে। তার কারণ, মুদ্রার হিসাব করার সময়েও এই একটাই ব্যবহৃত হয় এবং আমরা খানিকটা এই ভাষাই ব্যবহার করে থাকি। এই আর্যার সঙ্গে পরিচয় হলে তার পর কড়া গণ্ডা কেমন করে লিখতে হয় তাই শেখাতে হবে। কড়া গণ্ডার হিসাবও করাতে হবে। ছেলেরা এখন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সবই শিখেছে। সুতরাং একটু দেখিয়ে দিলে অনায়াসেই হিসাব করতে পারবে। যে ছেলে জানে চার কড়ায় এক গণ্ডা, এবং ভাগ করতে পারে, তার পক্ষে পঁয়তাল্লিশ কড়ায় কত হয় তা হিসাব করা কিছুই কঠিন নয়।

গণনার আর্যার সেই সংক্রান্ত একগুলি লেখা হলে তার পর মুদ্রার আর্যা (৪ পয়সায় ১ আনা, ৪ আনায় ১ সিকি, ৪ সিকি বা ১৬ আনায় ১ টাকা) শেখাতে হবে। তার পর পয়সা আনা প্রভৃতি কেমন করে লিখতে হয় দেখিয়ে দিয়ে পয়সা আনার হিসাব করতে শেখাতে হবে। বুড়ি পণ শেখা হলে পয়সা আনা শেখানো বিন্দুমাত্র শক্ত নয়। পয়সা বুড়ির মত করে এবং আনা পণের মত করে লিখতে হয়, বলে দিলেই চলবে। এইভাবে ওজনের ও জমি মাপের আর্যা এবং তার সঙ্গে তার একগুলি লিখতে ও তা দিয়ে হিসাব করতে শেখাতে হবে।

এইখানে বলে রাখা দরকার যে এক একটি আর্যা ও তার একগুলি শেখাবার পরই সেইগুলি দিয়ে ছোট ছোট যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অঙ্ক শেখাতে হবে। তাহলেই সেগুলি ছেলের অভ্যাস হয়ে যাবে। তা ছাড়া, এই আর্যা এবং একগুলির প্রয়োজন তো অঙ্কের জন্যই। তা না হলে শুধু শুধু অভ্যাস করার কোন মানেই হয় না। এইগুলি অভ্যাস করার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি দিয়ে অঙ্ক করালে ছেলের প্রয়োজনও বুঝতে পারবে। ছেলের শিক্ষার দিক থেকেও তাতে উপকার হবে।

———

শিক্ষায় স্বাধীনতা

[শ্রীঅদিতা দে]

প্রতি দল প্রভাতে পুষ্পকে যেমন বলার প্রয়োজন হয় না "সূর্যালোক তোমার দুয়ারে যার যায় আঘাত করে ফিরে যাচ্ছে, তুমি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠ"—আপনার বর্ণে, সৌরভে, আপনার মাধুর্যে আপনি মেলে সে পাপড়ি ; মানবচিত্তশতদলের আমার কুঁড়িও তেমনি বিকশিত হবে ধীরে, অতি ধীরে, শিক্ষার বিষয়সম্ভারে, আপনার সহজ কোটার আনন্দে। বন্ধুর জীবনের পথ, প্রতি পদক্ষেপে ফুটবে কাঁটা, সম্মুখীন হতে হবে নিত্য নব নব বিচিত্র সংগ্রামের। চলার পথের এই যে সংগ্রাম, ঘাতপ্রতিঘাত—ইহাই জাগ্রত করে মানবের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি এবং শিক্ষার বিস্তৃতলোকে সে শক্তি বিকশিত হয়ে ওঠে পরমকল্যাণরূপে, জীবন হয় পুলকিত—সমগ্র চেতনা হতে, নীচতা হতে, সঙ্কীর্ণতা হতে বহু উর্দ্ধে জ্যোতির্ময় আলোর পথে এগিয়ে চলার আনন্দে।

প্রকৃত শিক্ষা কি, কি তার রূপ, এই প্রশ্ন যখন মনে জাগে, যুগপৎ এ কথাও ভাবতে হয়, একে আয়ত্ত করার শ্রেষ্ঠ পন্থা কি ? প্রতিটি মানবশিশুর অন্তরে আছে অনন্ত সৃষ্টির বীজ, জীবনের ব্যাপ্তির ও প্রকাশবৈচিত্র্যের অসীমতা। ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠে শৈশবকালীন শিক্ষায়। যে অন্তর্নিহিত বিশিষ্টতায় আপনি সে স্বতন্ত্র, তার সেই স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে নিজস্ব মৌলিকপ্রবণতাকে পরিচালিত করতে হবে পরমকল্যাণময় পূর্ণবিকাশের পথে—এ বিকাশের পথে প্রয়োজন সংযমসীল পরিপূর্ণ স্বাধীনতার—স্বাধীনতা থাকবে আত্মপ্রকাশের, শিক্ষাপ্রণালীতে ও শিক্ষণীয় বিষয়ে। নিগড়বদ্ধ নিয়মের অনুশাসনে শিশুপ্রাণের সজীবতা শুকিয়ে যায়, চঞ্চল আনন্দকে রুদ্ধ করায় ঘটে শিশুমনের অকালমৃত্যু।

বহুকাল পূর্বে মনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছিলেন--"মানবসন্তান যতই দুর্বল হউক,তাহাকে যেন একটি প্রতিভাশীল যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করা না হয়। প্রকৃত পক্ষে সে একটি জীব।...গাছের অঙ্কুর যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাহির হয় তখন যদি তাহার চারিদিকে একটা লোহার জাল পাতিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে মাথা তুলিতে না দেওয়া হয়, তবে তাহার উদ্ভিদ্‌লীলা অচিরেই নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই ; প্রকৃতস্থানে, রসপরিসিক্ত মৃত্তিকার মধ্যে খোলা বাতাসে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাহাকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে দাও ও তাহাকে আপনার অনুসোধন করিতে দাও...দেখিতে পাইবে কিছুদিন পরেই সে পূর্ণ ও সমর্থ হইয়া দাঁড়াবে, পল্লবে হরিদ্বর্ণ হইয়া উঠিবে, ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।" মানবশিশুকেও তেমনি দিতে হবে স্বাধীন পরিস্থিতি, স্বাধীন চিত্তবিকাশের পথে বিঘ্নস্বরূপ তথাকথিত ডিসিপ্লিনের বাড়া প্রাচীর তুলে দিতে হবে, ছেড়ে দিতে হবে তাকে প্রকৃতির আপন হতে। চেতনার সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম স্তরগুলি মুখরিত করে যে আনন্দ, যে আনন্দ বহন করে আনে সৃষ্টির সংবেগ, সেই আনন্দে ডুবিয়ে রাখতে হবে শিশুজীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অকৃপণভাবে।

খেয়ালী প্রকৃতির সৃষ্টি প্রতিটি মানবশিশু। শিশুর আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে আপন উদ্দেশ্যহীন খেয়ালের চরিতার্থতায়। আপন স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী যে কাজে সর্বদা সে থাকে আনমনা, তাকেই আমরা বলবো শিশুর অন্তরের খেলা, এই খেলার

ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হয় তার দেহ মন, সোনার কাঠির স্পর্শে জাগ্রত হয় তার সুপ্ত কর্মশক্তি, গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ; ক্রীড়াকালীন প্রতিযোগিতাচ্ছলে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার বীজ অঙ্কুরিত হয়। জীবন খেলা নয়, কিন্তু শিক্ষা তখনই সার্থক হবে যখন জীবনের সমস্ত কঠোর কর্তব্য খেলাচ্ছলে প্রতি মানবের মনে জোগাবে আনন্দের রসদ এবং মুহূর্তরূপে তাকে পালন করতে সক্ষম করবে।

কিন্তু শিশুমনের এই উদ্দেশ্যহীন খেলাকে পরিচালিত করতে হবে সুশিক্ষা দ্বারা—তার অন্তরের প্রচ্ছন্নশক্তিকে জাগ্রত করে তাকে জ্ঞানের পথে, মনুষ্যত্বলাভের পথে, আত্মিক সাধনার পথে চালিত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার মহান উদ্দেশ্যে প্রয়োজন একজন শিশুমনস্তত্ত্ববিদ্ সহানুভূতিসম্পন্ন পরিচালকের। মন্তেসরী শিক্ষাপ্রণালীতে তাই শিক্ষকের নাম গেছে লুপ্ত হয়ে। অতিরিক্ত পুস্তকের বোঝা শিশুমনে চাপিয়ে দিয়ে তার সহজ আনন্দকে অকালে রুদ্ধ করাকে তিনি মনে করতেন শুধু অন্যায়ই নয়, পাপ। তার জ্ঞানোন্মেষের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই কেবল মাত্র মনে প্রাণে গ্রহণ করতে শিশু সক্ষম হবে, এমন কি অক্ষরজ্ঞান শিশুকেও পরিচালক তার ভুল প্রদর্শন করে নিরুৎসাহ করবে না, শুধু অপেক্ষা করবে কখন তার সহজবুদ্ধি আপনা আপনি বিকশিত হবে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

মন্তেসরী পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করলে মুহূর্তে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হতে হয়। ভিন্ন হতে সাত বছরের চল্লিশটি শিশু একসঙ্গে শিক্ষা পায়। নিজেদের স্বাধীন রুচি অনুযায়ী কেউ বসে আঁকে, কেউ অঙ্কন করে চিত্র, কেউ লেখে অক্ষর আপন মনে। কেহ উপবিষ্ট মেঝের ওপর, কেহ বা টেবলের ওপর। কিন্তু তাতে এতটুকু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় না, বিশৃঙ্খলার নেই এতটুকু পরিচয়। এই যে অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করে প্রত্যেকটি শিশু, এর ভিতরেই মন্তেসরী দেখতে পেয়েছেন অন্তরের বৃত্তিস্ফুরণের সহজ উপায়, স্বাধীন বিকাশের পথ। কিন্তু আমরা যদি মনে করি এমনি খেলাধূলায়, নিজেদের খাপছাড়া শিক্ষাগ্রহণ করার প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হবে, সে ধারণা আমাদের ভুল। তুমি তাদের প্রস্তুত হয় সহজ আনন্দে, খেলাধূলার ভিতরে। তাই তারা শিক্ষা করে, অন্তরে তাই শিক্ষড় গড়ে চিরকালের জন্য দৃঢ়রূপে। মন্তেসরি পদ্ধতিতে চার বছরের শিশু মাত্র দেড় মাসে, পাঁচ বছরের শিশু মাত্র একমাসের ভিতর লিখতে শেখে। যখন শিশু প্রথম অক্ষর সৃষ্টি করতে শিখল, তার বড় সুন্দর একখানি আলেখ্য তিনি চিত্রিত করেছেন আমাদের সম্মুখে। কি আনন্দে শিশুরা মেঝের উপর এক একটি অক্ষরের ছবি অঙ্কিত করছে আর আপন সৃষ্টির আনন্দে চীৎকার করে উঠছে—"I can write", "I can write"—সে আনন্দধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এল অন্য শিশুরাও, সবাই নিয়ে বসল খড়িয় টুকরো। যখন বাড়ী গেল তারা সেখান থেকে খবর এল—শিশুদের লিখিত অক্ষরে ঘর বাড়ী দেওয়াল উঠছে ভরে, এমন কি নিদ্রিতাবস্থায়ও দেখা গেল হাতে রয়েছে তাদের কাগজ আর পেন্সিল। এই যে আনন্দোপলব্ধি, আপন আপন সৃষ্টির আনন্দে আপনি হয়ে মাতোয়ারা, নব নব উদ্ভাবনীতে অন্তর হয়ে উঠল উন্মুখ—এর সমমূল্য মেলে কোথায়? দুর্বার স্রোতে সৃষ্টি করে চলবে তারা আরও কত বৈচিত্র্য, অঙ্কিত বিকশিত করবে কত জীবনের কত বাণী বিশদভাবে।

কিন্তু দুর্ভাগা আমাদের দেশ। শিশু মনোরাজ্যের এ আনন্দের উৎস সন্ধানে কখনের মনে জেগেছে ব্যাকুলতা? শিশুমনের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, ব্যথা আনন্দের মূল্য আজও তো দিতে জানলোনা এ দেশ। প্রতিটি মানুষ একই

মননশক্তি, বীক্ষণ শক্তি, কার্যকরীশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সুতরাং একই শিক্ষাপ্রণালীতে একই বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন শক্তির বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত সেই একই শিক্ষার আদর্শ হতে আমরা আজও তো মুক্ত হতে পারছি না—যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শুধু উচ্চপদে চাকুরী পাওয়া এবং শিক্ষাকে জীবিকানির্বাহের প্রধান সহায়রূপে গণ্য করা। বিদেশীর প্রয়োজনানুগ এই যে শিক্ষার আদর্শ এবং আমাদের অন্ধজড়তা, উভয়ে মিলে দেশে প্রবর্তিত হলো এক অকল্যাণকর নিষ্প্রাণ শিক্ষাপ্রণালী। ইট পাথরে গড়া চারিটি কঠিন দেওয়ালে আবদ্ধ শিশুদের হতে হবে যাদুঘরের পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল, পুষ্পের মত সুকুমার কোমল বৃত্তির ওপরে বসিত হবে কঠিন শিলারূপ শিক্ষা, তার অপরিণত দেহে পড়বে অযোগ্য শিক্ষকের বেত্রতাড়নার কালো দাগ। এই আনন্দহীন, বর্ণহীন, স্পর্শহীন শিক্ষাফ্যাক্টরী রুদ্ধ করে দেয় শিশুর উচ্ছল প্রাণের চঞ্চল প্রবাহকে, বন্ধ করে দেয় চিরকালের জন্য তার সহজ ফোটার পথকে, ব্যক্তিত্বের উন্মেষকে। শাসনের নিগড়বদ্ধ অভিমানী চিত্ত তার দিন-দিন হচ্ছে ক্ষুণ্ণ, ম্লান, সঙ্কীর্ণ; তাই সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, নৈতিক জীবনের শুভ্রাকাশ হচ্ছে কালোয় কালো। যে সংস্কৃতির প্রভাবে ঘটে চিত্তের ঔদার্য, অন্তঃকরণে আসে শান্তি, নিষ্কাম আত্মার্জনের প্রতি মনে অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহ হয়ে ওঠে স্বাভাবিক, আমরা ভারতের, সে সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলেছি। আধুনিক কতিপয় শিক্ষাভিমানীগণের ভিড় জমলো বিজলী পাখা ও আলো সুশোভিত ইটপাথরের তৈরী নগরীতে—তারা ফিরে চাইলনা প্রাণ-বেদনায় পূর্ণ বাকী দেশটার দিকে, যে পড়ে রইলো চির অন্ধকারে কোনঠাসা হয়ে—সেখানে মিয়ানন্দ ঘরে জ্বলে না প্রাণের আলো, সঙ্গীতময় হয়ে ওঠেনা তাদের আশা, আকাংক্ষা। সমস্ত দেশের বুকে একপ্রান্ত হতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত এত বড় বিচ্ছেদের ছুরি কে চালাল? নিরানন্দ জীবন আজ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দুর্বহ, রাষ্ট্রীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ মেষাবেষি, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার।

এমন দুর্দিনতো ছিল না বাংলার। শিক্ষা ছিল তার বৈজ্ঞিক, গোটা দেশেই ছিল তার বিস্তীর্ণ ভূমিকা। আনন্দের শিক্ষা হয়ে সে মিশেছিল সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। কিন্তু আজ আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই। যে জীবন আমাদের আদর্শস্থানীয়, শিক্ষা তার আনুপাতিক নয়, যে সমাজ আমাদের আকাংক্ষিত, শিক্ষাপুস্তকে নেই তার অঙ্কিত ছবি,—শিক্ষায় নেই তাই আনন্দ, সহজ হয়ে তাই পারছি না জীবনের আশ্রয়স্থলকে সত্য করে তুলতে। ময়ূরপুচ্ছের মত বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নামের সঙ্গে ডিগ্রি সংযুক্ত করেছে। কি হবে আমাদের এই ডিগ্রিতে ভূষিত হয়ে, যদি শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনের সামঞ্জস্য ফেলি হারিয়ে, হারাই আমাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি, স্বাধীন সৃজনীশক্তি?

এদিকে যিনি আমাদের প্রথম দৃষ্টি ফেরালেন তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, ভারতের শিক্ষাগুরু। শৈশবের ইস্কুলের দুঃসহভোগের স্মৃতি ছিল তাঁর অন্তরে, স্কুল-পালানো দুরন্ত শিশু রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন যে শিক্ষা গড়ে তুলবে প্রকৃত মানুষ, সে শিক্ষা আজও হয় না এই যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যায়। বীর্যশক্তি গঠিত হয় না শিক্ষকের অনুশাসনে।

তাই তিনি তাঁর সমগ্রমনের পরিকল্পনা দিয়ে গড়ে তুললেন শান্তিনিকেতনে এক বিদ্যালয়। শান্তিনিকেতনে তাই দেখেছি প্রকৃতির উন্মুক্ততায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা পাচ্ছে, রাত্রির আকাশে তারা জানছে গ্রহনক্ষত্রের রহস্য, পুষ্পোদ্যানের ভিতর তারা জানছে বৃক্ষজীবনের ইতিহাস, গোপালন হতে আরম্ভ করে যাবতীয় আশ্রমের কাজ তারা

সম্পাদন করছে নিজেদের হাতে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। পরস্পরের সাহচর্যে গড়ে উঠছে সেখানে সমাজ, নিজেদের অভাবের বিচার নিজেরা করার তারা পাচ্ছে স্বাধীনতা। আপনাদের বিকাশের সহজ আনন্দ ও স্বাধীনতায় তারা যে শিক্ষা গ্রহণ করছে সে শিক্ষা মিশে থাকবে তাদের প্রাণে প্রাণে, আজীবন চলার পথে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেই কেবল তারা উত্তীর্ণ হচ্ছে না, যে শিক্ষা ফুটে ওঠে প্রকৃত ব্যক্তিত্বের বিকাশে, তাকে সমস্ত দিকে স্ফূর্তিত করার প্রয়োজনে সেখানে আছে সঙ্গীত ভবন, চিত্রভবন, নাট্য ভবন। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে আছে হাতে কলমে বয়নশিল্প, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প ও কৃষিবিদ্যের শিক্ষা। শিক্ষকের সাহচর্যে, স্নেহপরিবেশের ভিতর আপনাদের বৈশিষ্ট্য উঠছে ফুটে বিভিন্নদিকে। স্বাধীন বিষয় নির্বাচনে, প্রকৃতির ভিতর আপনাদের বিলিয়ে দেবার সঙ্গে আনন্দে ধীরে ধীরে হচ্ছে বিকাশ আপনার অন্তর প্রকৃতির।

প্রকৃতিই প্রকৃত শিক্ষাগুরু। যুগে যুগে কালে কালে, পলে পলে, প্রকৃতির বুকে যে ছন্দ জাগে, তারই স্পন্দন অনুভব করতে দিতে হবে শিক্ষার্থীর অন্তরকে—সেখানে প্রয়োজন নেই ঘণ্টা দিয়ে, দুয়ারে দারোয়ান বসিয়ে, পুস্তকের অনাবশ্যক বোঝার চাপে শিশুচিত্তকে পিষে মেরে ফেলায়। মনে পড়ে আজ ভারতের সেই অতীত সামগান-মুখরিত স্নিগ্ধ ছায়া—যেখানে প্রকৃতির উন্মুক্ত লীলাক্ষেত্রে। তরুণ তপনালোকে, স্রোতস্বিনীর কলতানে, ভারতের সত্যদ্রষ্টার দৃষ্টি খুলে দিলেন, তাঁরা এক মহান্ আনন্দময় রহস্যকে সেখানে উপলব্ধি করলেন, "নিখিল চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।"

তাই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রকৃতির উন্মুক্ত লীলা প্রাঙ্গণে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়—যেখানে উদার আকাশতলে স্নিগ্ধ শালবীথি ছায়াতলে, পাখীর কলকাকলীতে শিক্ষার্থীর হৃদয় দুয়ার যায় খুলে। শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়ী বসুন্ধরার উচ্ছ্বসিত আনন্দের অনির্বচনীয় স্পন্দনে তাদের অন্তর নিয়ত হয় স্পন্দিত, বিশ্বপ্রাণকে আপন অন্তরে গ্রহণ করে, আপন অন্তরকে বিশ্বপ্রাণে মেলে দেবার যে আনন্দে তিনি পেয়ে উঠেছিলেন—

"কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাশি' বন্ধ"—

যে এক শুভ্র নিরঞ্জন দেবতার স্পর্শ তিনি অনুভব করেছিলেন অন্তরের অন্তর্লোকে, তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীর অন্তর লোকও স্পন্দিত হোক তারই এই পুলকময় অতীন্দ্রিয় ছন্দে, নিখিল মানবাত্মার ভিতরে সেই পরমাত্মার অনুভূতির মধ্যে। এই শিক্ষাই ভারতের চরম শিক্ষা।

আকুলচিত্তে তাই আমরা সে দিনের অপেক্ষা করছি, কবে ভারতের আয়ুষ্মান শিশুরা আর বিলিতি টিনের টবে মানুষ হবেনা, আপনাদের বৈশিষ্ট্য, স্বাধীনতা, শিক্ষা, সংস্কৃতিকে আত্মবোধের দ্বারা, হৃদয়ের চেতনা দ্বারা আবার ফিরিয়ে আনবে। তার ধর্মবোধ, তার বোধ, স্বাধীন আগ্রহ বোধ হবে উদ্বুদ্ধ।

শিক্ষাই জীবন.

[শ্রীকণিভূষণ বিশ্বাস]

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' অর্থাৎ শিক্ষার শেষ নেই, আজীবনই একটা না একটা শিক্ষা চলেছেই। মানুষ যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ সে দেখছে, জানছে, শিখছে। এই শেখার পালা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন মানুষের অস্তিত্বও যায় ঘুচে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ কর্মের মধ্যে, প্রতি পদক্ষেপে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের শিক্ষা ধারা বয়ে চলেছে অক্ষুণ্ণ গতিতে। সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ভাষায় বলেছিলেন,

জানার পালা সেদিন আমি শেষ হবে—
যেদিন আমার দিন ফুরাবে, রইব না আর এই ভবে।

অর্থাৎ জীবনের সঙ্গেই শিক্ষা। যতদিন জীবন আছে, ততদিন কোন না কোন শিক্ষা আছেই। জীবনকে বাদ দিয়ে শিক্ষার কোন মূল্য নাই। অবশ্য যে জীবনে অনুভূতি আছে, সংবেদনশীল মন আছে, শিক্ষা কেবল সেই প্রাণীকেই সমৃদ্ধ, আয়ত্ত করতে পারে। অনুভূতি থাকলেও জীবজন্তুর সে মন নেই, তাই সে অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু অনুসরণ করতে পারে না। 'পশুপক্ষী তাই অন্নের পর পশু পক্ষী, মানুষ সাধনার দ্বারা মানুষ।' অর্থাৎ যেখানে মানুষ আছে, তার সমাজ সভ্যতা আছে, সেখানেই আছে শিক্ষার অব্যাহত গতি।

সুতরাং যে শিক্ষায় কাজকারবার মানুষের মন নিয়ে, জীবনকে অবলম্বন করে, সেই জীবনই তো প্রাণবন্ত শিক্ষার উৎস। কারণ জ্ঞান যেখানে সঞ্চিত হচ্ছে, পরিকল্পনা যেখানে সৃষ্টি হচ্ছে, বিজ্ঞান যেখানে আবিষ্কার করছে, স্বপ্ন দেখছে, ভাবসম্পদে যেখানে রসের বিস্তার চলেছে, শিক্ষার আধার সেই জীবনেই তো রূপায়িত হয়ে উঠছে শিক্ষার স্বরূপ। এককথায় জীবনই শিক্ষার দর্পণ। এইজন্যে কোন দেশকালের শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাল করে জানতে হ'লে জানতে হবে সে দেশের আচার আচরণ আর সমাজ ব্যবস্থাকে।

তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজ, জীবন এবং জ্ঞানই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান উপজীব্য। এই তিনটির একটির অভাবে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শিক্ষার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জীবনের সমাক বিকাশ সাধন করা। তাই শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ণায়িত হয়েছে সমাজ ও জীবনকে নিয়ে। শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, 'educare' অর্থাৎ 'চালনা' করা' এবং লালন করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'চালনা' বা 'বৃদ্ধিসাধন', কিন্তু কিসের এবং কার? তার উত্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষা বলেছেন, Education implies the act of nourishing to the fullest growth of all the possibilites in any individual, thus preparing one single unit for the collective whole, viz, society. তিনি আরো বলেছেন যে, Education denotes an attempt on the part of the adult members of a human society to shape the development of the coming generation in accordance with its own ideals of life.

প্রাচীনেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে জ্ঞানের শীলমোহর রেখে গিয়েছেন, সেখানেও জীবনের ছাপ বিদ্যমান। তাঁদের অনেকের কাছেই শিক্ষা ছিল আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রকাশের উপায় স্বরূপ। আর তাঁদের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল (১) দৈহিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ (to protect health). (২) মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখা (to guard mental health)

(৩) সামাজিক অভিযোজনের সুনিয়ন্ত্রণ (to promote social adustment), (৪) জীবনের জন্য প্রস্তুতি (preparation for life)। এখনও অবশ্য জীবনের সেই প্রাধান্যই স্বীকৃতি পেয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। সে যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, জীবনকে সমাজের সঙ্গে অভিযোজিত করা এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি—এ সমস্ত প্রক্রিয়ারই লক্ষ্যবিন্দু ছিল মানুষের জীবন।

বর্তমান যুগে শিক্ষার আদর্শ ও পরিকল্পনার রূপান্তর ঘটলেও, জীবনদর্শন শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে বাদ পড়ে যায় নি কারণ জীবনকে অস্বীকার করা মানেই, শিক্ষাকে অবহেলা করা। শিক্ষা নদীর মত অব্যাহত ধারায় জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কখনও ভাঙে, ভাবায়, চিন্তায়, সাধনায় মানুষ তাকে নিত্য নূতনরূপে পাচ্ছে। এইজন্যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষার সত্যরূপ জানবার আগ্রহও মানুষের মনে উদয় হয় নি।

জীবন-কেন্দ্রিক এই শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে স্পেনসার বলেছিলেন যে, বাঁচার জন্য প্রস্তুতিই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এই প্রস্তুতিকরণের মধ্যে যে কি দায়িত্ব নিহিত আছে, সে কথা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন যে, For complete living we must know in what way to treat our body, in what way to treat our mind, in what way to manage our affairs, in what way to bring up a family, in what way to behave as a citizen, in what way to utilize those sources to the greatest advantage of ourselves and others." সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষা অবশ্য মানুষের চাহিদার বাইরে বহুলাংশে বিস্তৃতি হয়। কাজেই সংক্ষেপে 'শিক্ষাই জীবন' একথা বলাটা মোটেই অসঙ্গত হবে না।

— — —

বিদেশী ছাত্রসমাজ ও বিশ্বশান্তি

[শ্রীদিলীপকুমার সেন]

পৃথিবীর জীবন আজ সংশয়ে আচ্ছন্ন, হতাশায় ম্লান, রাজনৈতিক সংঘাতে বিভ্রান্ত। হয়তো একদিন জীবনে সৌষম্য ছিল, ছন্দ ছিল, কিন্তু আজ জীবন সুষমা হারিয়েছে, উৎকণ্ঠার অন্ধকারে আত্মগোপন করেছে ভবিষ্যতের আশার সূর্য। এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা থেকে সমাজকে আলোর পথে, মুক্তির পথে ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টা চলেছে প্রতি দেশে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের কাছে শান্তির ললিত বাণী কেবলমাত্র শ্রুতিসুখকর নয়, তার ভবিষ্যতের আশা ধ্বনিত হয় শান্তির প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণে। গত ইস্টারের ছুটিতে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এক শান্তিকামী অধিবেশনে আমন্ত্রিত হবার। এই সম্মেলনে দশদিন ব্যাপী আলোচনা হয়, গণতান্ত্রিক সমাজে সাধারণ নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে। জার্মানীর যুব আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট জার্মান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্য ঐ সময়ে সমাগম হয় হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম থেকে প্রতিনিধি দলের। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রদপ্তরের জার্মান বিভাগের পরিচালনায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেবার জন্য ও প্রাচ্য দৃষ্টিভংগী প্রশ্নটাকে কিভাবে গ্রহণ করে দেখার জন্য, ইস্টারের সময়ে এক আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনের আয়োজনও এই সংগে করা হয়। চীন থেকে, আরব দেশ থেকে, সাইপ্রাস থেকে প্রতিনিধি আসেন, আর পাশ্চাত্যের দিক থেকে আসেন অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বারো ইংরেজ ছাত্র ও একজন ফরাসী ছাত্র।

আলোচনার স্থান ছিল উইলটন পার্ক। এটি একটি আবাসিক শিক্ষাসত্র, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বহির্ভূত বিষয় নিয়ে মধ্যে মধ্যে আলোচনার বন্দোবস্ত করা হয়। এই সমস্ত আলোচনায় যোগদান করতে আসেন ইংল্যাণ্ডের নানা অংশ থেকে ছাত্র ও অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা, বিদেশী প্রতিনিধিরা ও ছাত্রেরা। সুর্যকরোজ্জ্বল সালেকদের এক গ্রামে অবস্থিতি এই শিক্ষাসত্রের। শহরের কোলাহল এখানে নাই, এখানে আছে অবারিত মাঠ, ছোট ছোট টিলা, পাখীর গান আর মেঠো পথ। সাধারণত ছুটির সময় এই ধরণের সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়, ফলে প্রতিনিধিদের ছুটিও উপভোগ করা হয়, আবার নাগরিকতা, রাজনীতি ও শান্তির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের আলোচনাও হয়। এই আলোচনা পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য কয়েকজন শিক্ষক ও একজন প্রধান অধ্যাপক এখানে আছেন। এঁরা সবাই পণ্ডিত লোক এবং সকলেই ইউরোপে একটা সচেতন, সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জনমত গঠনে সাহায্য করতে সর্বদা তৎপর। আমি এই শিক্ষাসত্রের ইস্টারের অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কাজের চাপ থাকাতে সমস্ত অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভবপর হয় নাই, কিন্তু আমার দুইদিনের অভিজ্ঞতা থেকে খুব স্পষ্ট ধারণা হয় এই আলোচনার সমাক রূপ সম্বন্ধে। প্রথমদিন আলোচ্য বিষয় ছিল, কিভাবে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ ও সামাজিক ব্যবস্থার কবল থেকে ইউরোপকে উদ্ধার করা যায়। আলোচনাপ্রসংগে জার্মান প্রতিনিধিরা একবাক্যে জানালেন যে কম্যুনিজমের কোথাও নিশ্চয়ই এক অসংগতি আছে, কেননা তাঁদের দেশের সোভিয়েট অংশে একতন্ত্রবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য,

জীবন সেখানে প্রাধিকৃত, অবিচ্ছিন্ন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধের সময় বন্দীজীবন যাপন করেছেন এবং তাঁদের নির্যাতন নিপীড়নের তীতিহর অভিজ্ঞতা বিবৃত করলেন। তাঁরা নানাভাবে নানাকথা বল্লেন, কোনো কোনো অভিমত কোনো সমর্থন পেলে না, আবার কতকগুলি অন্য প্রতিনিধিদের নিয়ে চিন্তার প্রসার করল। শেষে নির্ধারিত হোল কল্যানিয়নকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ইউরোপের যেখানে জীবনযাত্রার মান উন্নত আছে, সেখানে লক্ষ্য রাখা যেন মানের পতন না ঘটে, যেখানে মান নীচু, সেখানে সমবেত প্রচেষ্টায় মানের উন্নতিসাধন, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সুচিন্তিত কর্মপন্থা গ্রহণ, এবং গণতান্ত্রিক জীবনধারার মূল আদর্শগুলিকে লোকের মনে সঞ্চারিত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কিভাবে শক্তিশালী এক আন্তর্জাতিক পার্লামেন্ট গড়ে তোলা যায়, এই সমস্যা প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপিত করা হোল। সবাই স্বীকার করলেন জেনিভার আন্তর্জাতিক পরিষদ ও লীগ অফ নেশনসের উদ্দেশ্য, দুটোর কোনটাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিশ্বের সমস্যার সমাধানে সাফল্য অর্জন করতে পারে নাই। এই পরিষদগুলির দুর্বলতা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অনেক পরিমাণে জটিল করে তুলেছে। একজন অভিমত দিলেন, আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনীর সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই ধরণের পরিষদের সাফল্য সুদূরপরাহত। কেউ কেউ বললেন, সমস্ত পৃথিবীজোড়া এক রাষ্ট্রপরিষদ গঠন করার সময় হয়তো এখনো আসে নাই, তাঁদের মতে পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে এধরণের একটা পরিষদ গঠন করে দেখা যাক কতটা সাফল্য পাওয়া যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ প্রতিনিধি এই দৃষ্টিভংগী সমর্থন করতে পারলেন না।

কথা প্রসংগে সমাজতন্ত্রবাদ ও শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে আলোচনা উঠল। সমাজতন্ত্রবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ কারো মনেই নাই, তবে ঠিক কি রূপ পরিগ্রহ করবে সমাজতন্ত্রবাদ সেই বিষয়ে সবাই একমত নন। শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ প্রসংগে ইংরেজ প্রতিনিধিরা বিরুদ্ধ সমালোচনা করলেন, তাঁদের মতে এতে দেশের মংগল বিশেষ হয় না। জার্মান প্রতিনিধিরা আলোচনা প্রসংগে ন্যায়েমবার্গের বিচার সম্বন্ধে বললেন, নীতি হিসাবে এই ধরণের বিচারে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু বিচারকদের মধ্যে বিজয়ী জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাধান্য তাঁদের ক্ষোভের কারণ হয়েছে। যুদ্ধের দণ্ড হিসাবে সমস্ত কলকারখানা যে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করলেন।

প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা চলেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক মতে বিশ্বাসী প্রতিনিধিদের মধ্যে; নির্ভীক সমালোচনা ও বলিষ্ঠ চিন্তা আলোচনাকে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতবাদ অনুযায়ী সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন দৃষ্টিভংগীতে পার্থক্য ঘটেছে, কিন্তু আলোচনা কখনো অপ্রীতিকর হয় নাই। সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন যে অন্যের দৃষ্টিভংগীকে পরীক্ষা করে দেখবার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য আজকের জটিল জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়। সমবেত প্রচেষ্টায় এই জটিলতা অনেক পরিমাণে দূর করা যায়। মানুষ সাধারণত নিজেকে বড়ো করে দেখে, নিজের চিন্তাধারাকে তার প্রতিবাসীর চিন্তাধারার উপরে স্বভাবতই স্থান দেয়—এখানেই আধুনিক সভ্যতার সংকট সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু হাইল্টন পার্কের আলোচনার প্রতিভাস রয়েছে, নিজের মতকে আঁকড়ে ধরে থাকাতে প্রশংসার কিছুই নাই, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই এই ধরণের ব্যবহার মানসিক দৈন্য ও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়।

আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি, সেটা হচ্ছে

কাজের সংগে আমোদপ্রমোদের নিগূঢ় সম্পর্ক। কথাটা কিছু নূতন নয়, কিন্তু তার প্রয়োগক্ষেত্র সুষ্ঠু ও অভিরাম।

আলোচনা শেষ করার আগে একটি বিষয়ের উল্লেখ করবো। পৃথিবীতে আজ যে অবিশ্বাসের আবহাওয়া চলেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ পৃথিবীতে আজ সহযোগিতার অভাব। যদি আজ পৃথিবীর প্রতিদেশে লোকেরা পরস্পরকে জানবার চেষ্টা করে, বুঝবার চেষ্টা করে, তাহলে জীবনের অনেক কুশ্রীতা মিলিয়ে যায়। একটি জার্মান ছেলে কথাপ্রসংগে আমায় বলেছিল, "ভারতবর্ষ ছিল আমার কাছে অজ্ঞাত ও অপরিচিত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো অভিমত দিতে, কিছু চিন্তা করতে আমি সাহস পেতাম না, কেন না আমি ভারতবাসীদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম, কিন্তু আজ দেখছি পৃথিবী জুড়ে একই সমস্যা এবং সর্বত্র প্রায় তার একই রূপ"—অজানাকে জানবার যে সুযোগ এই ধরণের আলোচনায় পাওয়া যায়, দূরকে নিকট করবার যে শুভক্ষণ আসে, সেগুলি শান্তির সন্ধানে কতখানি সাহায্য যে করতে পারে তা বোধ করি আর বলবার অবকাশ রাখে না।

———

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

রাষ্ট্রভাষা-শিক্ষক। শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার। ১১৮পৃঃ। মূল্য পাঁচ সিকা। চক্রবর্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

হিন্দী এখন রাষ্ট্রভাষা, এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীর মত বাঙালীর পক্ষেও অবশ্য-শিক্ষণীয়। কেন এরূপ হইল, বাংলাই বা কেন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইল না, সে বিষয়ে আলোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্ফল। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, লেখক নিঃসঙ্কোচে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং হিন্দী ও উর্দু ভাষার তথাকথিত পার্থক্যকে শুধু অক্ষরগত বা লিপিগত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অনেকে ঘাড়ে পড়িয়া হিন্দীর রাষ্ট্রীয়তা স্বীকার করেন; লেখক তাঁহাদের একজন নহেন।

লেখক অবশ্য হিন্দীভাষা ও নাগরী লিপিরই আলোচনা মুখ্যত করিয়াছেন; কিন্তু উর্দু লিপিকে বর্জন না করিয়া তাহাকেও পুস্তকে স্থান দিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকের উপযোগিতা বাড়িবে বই কমিবে না।

বাঙালীর পক্ষে হিন্দী উচ্চারণের জন্য তিনি যে সব পরামর্শ দিয়াছেন তাহা বেশ সঙ্গত হইয়াছে।

ব্যাকরণের দিকে লেখকের ঝুনিয়াদ পাকা, ভাষাতত্ত্বের মূলসূত্র তাঁহার জানা, এবং শিখাইবার সময় তাঁহার সেদিকে দৃষ্টি পুস্তকের মান বৃদ্ধি করিয়াছে। বিস্তর বর্ণাশুদ্ধি সত্ত্বেও আমরা এই পুস্তকের আদর হইলে সুখী হইব, লেখক ইহার দ্বারা বাঙালীর রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন।

———

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা ২৷৹ টাকা আগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।৹ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণা করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। শিক্ষনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, পোঃ বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম-এ, প্রণীত

অনাথগোপাল সেন স্মৃতি সমিতি হইতে প্রকাশিত

মূল্য ৷৷৵০

প্রাপ্তিস্থান : ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১ম বর্ষ	বৈশাখ ১৩৫৮	৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

বৈশাখ মাসে বাঙালী নববর্ষের উৎসব করে। সেই সঙ্গে আরেকটি উৎসবও বাঙালীর চিত্তে সাড়া জাগায়, তাহা হইল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের উৎসব। এই বৎসরও ভারতের সর্বত্র, ভারতের বাহিরে, বিশেষ ভাবে বাংলার সর্বত্র এই উৎসব পালিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি হিসাবে নয়, সাহিত্যিক হিসাবে নয়, ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ হিসাবে, যুগপ্রবর্তক হিসাবে সকলের বরণীয় মহনীয় ছিলেন। আমরাও 'শিক্ষা'র বৈশাখ সংখ্যায় শিক্ষাগুরু হিসাবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

বৎসরে বৎসরে এই জন্মদিনের উৎসব সার্থক হয় যদি আমরা তাঁহার সাধনার ক্ষেত্রে আমাদেরও সাধনার অনুভূতিরা সিঞ্চন করিতে পারি। শিক্ষার ক্ষেত্রকে আজ যে সমস্যাসঙ্কুল অন্ধকার ঘিরিয়া ধরিয়াছে, যে আবিলতা পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে, শিক্ষাগুরু কোনো না কোনো উপলক্ষে সেই সকল দিকেই তাঁহার দৃষ্টির আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন। খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে সেই আলোকে আমাদের প্রকৃত পথ চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার উত্তরাধিকারী সমগ্র মানব সমাজ। তাই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী আজ শুধু বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের হাতে নয়, আজ সমগ্র ভারতবাসী এই সম্পদকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। প্রথম যৌবনে মৃত্যুর আঘাতে তিনি যে পরম সত্যকে জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই সত্য জ্ঞান তাঁহাকে দিয়াছিল অসীম মুক্তির আস্বাদ। এই শান্তিনিকেতনে তিনি তাঁহার মুক্তি-সাধনার অনুকূল একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রমটিকে লাভ করিলেন তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে, বলিলেন, মানস সরোবরে যেমন পদ্ম বিকশিত হয়, তেমনি চারিদিকের প্রান্তরের আকাশে এই আশ্রমটি জেগে উঠেছে। তিনি বলিলেন, এই আশ্রম কোন সম্প্রদায়ের নয়, দেশ দেশান্তর দূর

দূরান্তর থেকে যে কোন ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, কোন সংস্কারের বাধা যেন কাউকে গ্রহণ করতে বাধা না দেয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ক্রমে এই শান্তিনিকেতন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অপরূপ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৯১৮ সনের পর হইতে বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিতগণ তাঁহার আমন্ত্রণে এখানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে আসেন, বিশ্বভারতী দেওয়া ও নেওয়ার মিলনভূমিতে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথের অভাবের পর হইতেই এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা, ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা, ইহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা প্রভৃতি তাঁহার অনুগত, অনুরক্ত ও গুণমুগ্ধ নানা জনের চিন্তার বিষয় হয়। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ ও ভারতীয় জীবনে তাহাদের স্থানের কথা লইয়া কতই না ভাবিয়াছিলেন আজকার দিনে যাঁরা দেশের নেতা, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আজাদ, ইঁহারা সকলেই তো এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে যুক্ত আছেন, আবার কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাও তাঁহাদের কম নয়। বিশ্বভারতীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদের সকলেরই একান্ত আগ্রহ।

তাই সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্ট এক আইন করিয়া বিশ্বভারতীকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন। তাঁহারা বিশেষভাবে আশ্বাস দিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিবে। পণ্ডিত নেহেরু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যানসেলর হইলেন। আর ভাইস চ্যানসেলর হইলেন কবির সুযোগ্য পুত্র, বিশ্বভারতীর বর্তমান কর্মসচিব শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আশা করা যায়, নব কলেবরে বিশ্বভারতী তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইবে না।

লেডী অবলা বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী লেডী বসু বিগত এপ্রিল বেলা ১০।০ কলিকাতা ১৩।১ আপার সার্কুলার রোডে তাঁহার নিজ বাসভবনে পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৭ বৎসর। সুদীর্ঘকাল 'আদর্শ গৃহলক্ষ্মী' ও 'আদর্শ নগরলক্ষ্মী'র জীবন যাপন করিয়া অগণিত দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মান তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশের নারীজগতে যে আসনটি শূন্য হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নয়।

আমাদের জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে বিখ্যাত সমাজসংস্কারক উদারচেতা দুর্গামোহন দাসের গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারকগণ সংস্কারের যে কয়টি ধারা বহিয়া চলিয়াছিলেন, নারীশিক্ষা তাহাদের অন্যতম। কন্যাপুত্রবৎ পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিশয়তঃ, কথায় ও কাজে তাঁহারা এই নীতি পালন করিতেন। দুর্গামোহন দাসের কন্যারা গৃহে ও গৃহের বাহিরে নানা রকমে সুশিক্ষা লাভ করেন। এই শিক্ষায় তাঁহাদের মনকে উদার ও সংস্কারমুক্ত করিয়াছিল। নিজের জীবনে যে আলো ও আনন্দের সন্ধান লেডী বসু পান, পরবর্তী কালে তাহাই বাংলা দেশের মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য তিনি সমগ্র মন প্রাণ নিয়োজিত করেন।

বিবাহিত জীবনে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় প্রেরণা দিয়া, অকুণ্ঠ সেবায় সেই সাধনাকে অব্যাহত রাখিয়া, তিনি অনীম প্রীতিতে তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন মধুময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙালী মেয়েদের জন্য রহিল তাঁহার এই গৃহলক্ষ্মীর আদর্শ।

অপর দিকে, নারী জাতি অবলা নয়, জ্ঞানবলে চরিত্রবলে দৃঢ় হইলে তাহারা পরমুখাপেক্ষী হইবে না, সমাজের বোঝা না হইয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিবে, এই বিশ্বাসে তিনি মেয়েদের জন্য, বিশেষ ভাবে বিধবা মেয়েদের জন্য যে কয়টি

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। শুধু সংঘের মেয়েদের কথা তিনি ভাবেন নাই; গ্রামের মেয়েদের দুঃখেও তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। নারীশিক্ষা সমিতি, নারী সদনের শিল্প আশ্রম, বয়স্ক পল্লীশিক্ষা প্রভৃতি পল্লী রমণীর উন্নতির জন্য, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুশিক্ষার পথ করিবার জন্য যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়া ছিল, তাহারই অনুসরণ করিয়া আজ এই ধরণের বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। মহিলা শিল্পভবন, মাণীভবন খুলিবার ট্রেনিং স্কুল, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁহার স্মৃতি বহন করিয়া চলিবে।

আক্ষিয়াদহে তিনি একটি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু বিদ্যালয় বা সমাজের দুঃখ ব্যথা দূর করিয়াই তাঁহার হৃদয় পূর্ণতা পায় নাই; সহরের বাহিরে নির্জনে আসিয়া কর্মক্লান্ত নরনারী এখানে চিত্তের বিশ্রাম লাভ করিবে, আত্মার আরাম উপভোগ করিবে, সেজন্যই তিনি এখানে সাধনোপযোগী ছোট একটি আশ্রম স্থাপনা করেন। জীবনের নানাদিকে পূর্ণভাবে তপস্যা করিয়া তিনি আজ জীবন হইতে বিদায় লইলেন; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা যুগের অবসান হইল।

সরলাবালা মিত্র

গত ৩রা এপ্রিল মহিলা শিক্ষাব্রতী সরলাবালা মিত্রের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বেথুন স্কুল ও কলেজে লেখা পড়ায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বেথুন কলেজের অধ্যাপকের পদে থাকিতেই ইনি সরকারি বৃত্তি পাইয়া বিলাত যান, ফিরিয়া আসিবার পর হিন্দু মহিলাদের এক নব-প্রতিষ্ঠিত ট্রেনিং স্কুলে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন. এবং ঐ কাজেই দীর্ঘকাল তাঁহার মিষ্টার পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ হন। ১৯৩০ সনে ঐ বিদ্যালয় হইতেই তিনি অবসর লন। আমরা মিসেস মিত্র ও ট্রেনিং স্কুলটিকে অতিরঞ্জিত বলিয়াই জানিতাম।

নারীজাগরণ ও নারীশিক্ষার কাজে তাঁহার অক্লান্ত সেবার কথা ভুলিবার নয়। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, অথচ অমায়িকতায় সকলকে কাছেও টানিতে পারিতেন। সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার সহধর্মিণী প্রসিদ্ধ লেখিকা শরৎকুমারী দেবী তাঁহার নিকট আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার জীবনে ইহাদের প্রভাব অনেকখানি কাজ করিয়াছে। ইদানীং অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তাঁহার নাম বড় একটা শোনা যাইত না, তিনি নীরবে গৃহকোণে বিদ্যাচর্চায় দিন কাটাইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার নারীসমাজের অতীতের সহিত একটি যোগসূত্র ছিন্ন হইল।

সঙ্গীত রচনায় ভারতীয় ছাত্রের সাফল্য

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি দেশব্যাপী বেতার সঙ্গীত রচনার প্রতিযোগিতা হয়। উহাতে প্রথম পুরস্কার পান দিনন উদ্ভিওয়ালা নামে বোম্বাইয়ের জনৈক শিক্ষার্থী ছাত্র। সঙ্গীতটির নাম 'বাসন্তী'। উহার জন্য তিনি ২০০ ডলার পুরস্কার লাভ করেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত প্রকাশক কোম্পানী সঙ্গীতটি প্রকাশ করিবেন।

প্রতি সপ্তাহে জনসাধারণ ব্রডকাস্টিং সিষ্টেম চার জন অখ্যাত সঙ্গীত রচনাকারীকে আহ্বান করেন, এবং বহু শ্রোতা ও বিশিষ্ট বিচারমণ্ডলী ইঁহাদের সঙ্গীত শোনেন ও বিচার করেন। উদ্ভিওয়ালার বয়স ২২ বৎসর, মাত্র সাত মাস আগে ইনি সঙ্গীত শিক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছেন।

ভারতীয় ছেলেরা তাঁহাদের সর্বাঙ্গীন প্রতিভার বিকাশ সাধন করুন, আনন্দ ও খ্যাতি লাভ করুন, বিদেশে তাহাদের ও ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করুন।

(মার্কিন বার্তা)

শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চলিয়াছে দেখিয়া একদিকে যেমন দেশবাসীদের কেহ কেহ নবকলেবরে রবীন্দ্রনাথের চিহ্ন থাকিবে না বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার বিশ্বভারতীর এই নবকলেবর দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের নাম দেশে বিদেশে প্রচারিত হইবে বলিয়া অনেকে দাবি করিতেছেন। এই অবসরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের স্বরূপের ধারণা করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার মহাপ্রাণতা হয়তো আমরা খানিকটা বুঝিতে পারিতাম। আমরা জানি, শিক্ষার প্রকার যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে; যুগে যুগে নতুন মানুষের আশায় প্রবীণেরা বসিয়া থাকিবেন, ইহাই তো আমাদের পরম্পরা, মানবতার ধারা, যাহাকে বলে সভ্যতা। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার বলে জীবনের সাধারণ সূত্রকে তাঁহার নিজস্ব অপূর্ব ভঙ্গীতে জীবন্ত করিয়া লোকসমাজের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন। বিশ্বভারতীর প্রকাশিত তাঁহার 'শিক্ষা'র যে সব অমূল্য প্রবন্ধ আছে, তাহা আজ বারবার পাঠ করিয়া সমাজ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনিয়াছে। নূতন জাতীয় জীবনে যদি আমরা কবিগুরুর এই সকল উপাদেশ অগ্রাহ্য করি, তবে আমাদের মঙ্গল হইবে কোথা হইতে?

কিছুদিন পূর্বে সবুজপত্রের এডিটোরেট, অধুনা পরলোকগত, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বৃত্তি" নামক গ্রন্থটি দেখিবার সুযোগ পাই।

উহা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পত্রের সমষ্টি। উহাতে প্রকাশিত পত্রগুলি এই মাসের 'শিক্ষা'র আলোচনা অংশের গৌরবকে আরও পুষ্ট করিতেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠকবর্গকে উপহার দিই। তাহাতে প্রকাশ পায়, ছাত্রসমাজে যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি না পায় সেজন্য তাঁহার কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মনোরঞ্জনবাবুকে বার বার তিনি সতর্ক করিয়া দিতেছেন, মনোরঞ্জন বাবু তখন বোলপুরের শিক্ষক ছিলেন—"আশ্রমস্থ আপনারা সকলে ভাল করিয়া কাজ করিবেন। দেখিবেন ছোট ছেলেদের মধ্যে কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা না দেখা দেয়—যথাসময়ে সমস্ত কার্য যথানিয়মে সম্পন্ন হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।"

কিন্তু অধ্যাপকদের যথোচিত অধিকার লইয়া মানসিক বিরোধের সূত্রপাত না হয়, সেদিকেও তিনি সতর্ক ছিলেন। একজন ক্লাসের বাহিরে ছাত্রদের উপর কর্তৃত্ব ভার একজনের উপর দিবেন বলিতেছেন। "ক্লাসে পড়াইবার সময় অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে যথোচিত সংযত করিয়া রাখিবেন তাহাতে কোন বাধা নাই, ক্লাসের বাহিরে তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব একজনের উপরে থাকাই সঙ্গত—নতুবা কার্যপ্রণালীর ঐক্য রক্ষা হয় না।...কর্তব্যবিধির সহিত পরস্পর সৌহার্দের কোন সংঘাত হওয়া উচিত নহে।"

সর্বপ্রকার শৈথিল্য যাহাতে ছাত্রসমাজ বর্জন করিতে পারে সেজন্য তিনি প্রায় অস্থির হইয়া বারবার মনোরঞ্জনবাবুকে লিখিতেছেন—তখন সাময়িক ভাবে বোলপুরে শিক্ষকের সংখ্যা যত কম ছিল—

"শিক্ষকাভাবে আজকাল ছেলেদের অনেকটা সময় হাতে থাকিবে, বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন যাহাতে নষ্ট হইবার দিকে না যায়।...ছাত্রদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন শৈথিল্য ঘটিতে দিবেন না।"

এসব কথা অবশ্য প্রায় ৫০ বৎসরের পূর্বের।

কিন্তু কবিগুরুর যে বাস্তবজ্ঞান যথেষ্ট ছিল এর পড়িলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না—

"ছেলেদের মধ্যে যাতে কোন রকম ইন্দ্রিয় শৈথিল্য না ঘটে সেজন্যে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা হয়—কিন্তু ১৩০ জন ছেলের মধ্যে বাংলা দেশে এই উপসর্গ সম্পূর্ণ ঠেকানো গেছে একথা আমার নিজেরই প্রত্যয় হয় না। আমি দেখতে পাই আমাদের দেশ এ সম্বন্ধে একেবারে কলুষপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন। ঘরে ঘরে এই ব্যাধি।"

সেজন্য শুধু শিক্ষক নয়, বিদ্বান নয়, মানুষ হওয়া চাই—নীতিজ্ঞান না থাকিলে এবং আচরণে তাহার পরিচয় না দিলে শিক্ষক নিযুক্ত করা চলিবে না; ১৩১৪ সনের ১লা কার্তিকের পত্রে তিনি তাই লিখিতেছেন—

"বিদ্যালয়ে লোকের অভাবে আমাকে বড়ই পীড়া দিচ্ছে। শুধু শিক্ষক হলে হবে না। মানুষ হওয়া চাই।"

শিক্ষার মধ্যে যে সদাচার কতখানি চাই, চরিত্রগঠনই যে প্রকৃত শিক্ষার অনেকখানি, কবিগুরুর এই সমস্ত মন্তব্য হইতে আমরা তাহা পাই। এই দৃষ্টি হইতেই তিনি কখনও শান্তিনিকেতনের কোনও ছেলেমেয়ের বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিতে রাজি হন নাই। এক পত্রে বলিতেছেন—

"রথীও এখানকার মোটা রুটি খাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে। তখনকার আহারাদির চেয়ে এখনকার বন্দোবস্ত ভাল বই মন্দ নয়। ছেলে ইস্কুলে সীরাও সকলের সঙ্গে একত্রে খায়, থাকে। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাহিরের লোকের কোন পার্থক্য রাখি নাই। ইহা নিশ্চয় জানিবেন আমার সামর্থ্য থাকিলেও ছাত্রদিগকে বর্তমানের অপেক্ষা অধিক আরামে রাখিবার চেষ্টা করিতাম না। আদরে ছেলেদের আদর বাড়াইয়া দেওয়াই তাহাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় শিক্ষা। ইহাতে যে অভিভাবক বাধা দেবার করেন তাঁহারা নিজের ছেলের উপর বসাইয়াই ছেলের সর্বনাশ করিতে পারেন, তাহাতে কেহ বাধা দিবেন না।" (৬ষ্ঠা ভাদ্র ১৩১৬)

আর একটি কথা তুলিয়া এখনকার মত এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। একাধিক পুরস্কারবিতরণী সভায় পুরস্কার দেওয়ার প্রথা বর্জন করিবার কথা বলিয়াছি। আমরা মুখে বলি, নূতন সমাজের ভিত্তি হইবে সহযোগিতার উপর, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপরই জোর দিই। সহযোগিতা যা সমবায় আসিবে কোথা হইতে? রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ২৮শে ভাদ্র ১৩১৪সালের এক পত্রে মনোরঞ্জন বাবুকে লিখিয়াছিলেন—

"ভাল ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেয়? সদাচারে পুরস্কার হতে বঞ্চিত হওয়াতেই যথার্থ ভালর পরীক্ষা ও পরিচয়। আমি ভাল একথা কেউ যেন প্রাইজ দেখিয়ে প্রচার করবার অবকাশ না পায়। ছেলেরা, বিশেষত বুড়োরা ওটা যতই ভুলে থাকে ততই ভাল। অতএব এ কথাটা বিবেচনা করে দেখবেন। বাল্যকালে এরটা ভুল শিক্ষা হয়েছিল—

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই—

কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর ভুল শেখানো হবে যদি বলা যায়—

ভাল লোক হবে যেই
পুরস্কার পাবে সেই।"

রবীন্দ্রনাথ যে বাংলাকে শিক্ষার বাহন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন এবং হাতের কাজকে শিক্ষার পরিকল্পনায় এক বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন, আজকাল শিক্ষাবিদেরা:—এমন কি যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিবার সুযোগ সুবিধা পাইয়াছিলেন তাঁহারাও—সে বিষয়ে দৃষ্টি না দিয়া, ইংরেজি ভাষা পাছে স্থানচ্যুত হয়, এবং বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ছেলে পাছে হাতের কাজ শেখে এবং কাজের দিকে গিয়া তাহার বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে, সেই ভয়ে ভীত হইতেছেন। ইহার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে। শিক্ষানুরাগীর পক্ষে আজ তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারা ভাল করিয়া পড়া একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

পথ চলতে সাবধান

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ]

শিক্ষান্তে শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা হয়। শিক্ষা বলিতে যদি বিদ্যালয়ের পুঁথিগত শিক্ষা বুঝায়, তাহা হইলে যে বিষয়ে লিখিতেছি তাহা প্রকাশ করা যাইবে কিনা জানি না।

সুরুতেই একটি মর্মন্তুদ ঘটনার কথা মনে হইতেছে। ২০।২৫ বছর হইবে। আষাঢ় মাসের দিন। নিমতলা দিয়া বছর বারোকের একটি বালক স্কুলে যাইতেছিল। হঠাৎ এক স্কুলীর মাথা হইতে ভারী একটা কাঁইবও বালকটির উপর পড়িয়া যায়। বালকটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। আমের খোসাতে স্কুলীর পা পিছলাইয়া এই বিপদ ঘটে।

যখনই ফুটপাতে কলার খোসা বা আমের খোসা দেখি, তখনই নিমতলার চিত্রটি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। কলার খোসা বা আমের খোসা পায়ের তলায় পড়িয়া লোক প্রায়ই বিপন্ন হয়। আমরা অন্য পথচারীরা তাহা দেখিয়া সময় সময় হাসিয়া ফেলি। এ হাসিতে ক্রূরতা নাই। আমাদের এরূপ হইতে পারে না, এই ভাব হইতে আমরা হাসিয়া থাকি। কখন কখন মেয়েদেরও পা পিছলাইয়া বিপন্ন বিব্রত হইতে দেখিয়াছি। লোককে বিব্রত হইতে দেখিয়া কখনও 'আহা' বলিয়া সহানুভূতি করিতে ত্রুটি। অথচ আমাদের বহু গৃহ হইতে রাস্তায় কলার খোসা, আমের খোসা ফেলা হইয়া থাকে। ফেলা যে হইয়া থাকে তার হেতু, এই জিনিসটাকে আমরা গুরুত্ব দিই না। সকলেই মনে করি, এই অবস্থা আমার কখনও হইবে না।

পথ চলিতে চলিতে দেখিতেছি, কাপড়ের কোঁচা কোনও ভদ্রলোকের পায়ের পিছে বন্ধক হইয়াছে। ভদ্রলোক একবার মুখের দিকে চাহিলেন অথচ নির্বিকার চিত্তে চলিয়া গেলেন। ছোতলা, তেতালা বা ছাদের উপর হইতে থুথু বা গয়ের পথচারীর মাথায় আসিয়া পড়ে; এই অভিজ্ঞতা অনেকের আছে। কোনও ভদ্রপল্লী দিয়া যাইতে ভোর বেলা মাথায় জলের মত কি পড়িল। উপর দিকে চাহিয়া দেখিলাম একটি লোক বাথিমের ভিতর হইতে ছাদের দিকে চলিয়া যাইতেছে। আরও কয়েক পা চলার পরে দৃষ্টি ছাদের উপর গেল। দেখিলাম এক ভদ্রলোক কাপিংএ ভর করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। বুঝিলাম মাথায় পড়িয়াছে দন্তধাবনের নিষ্ঠীবন। ছোতলা তেতলা হইতে মা বোনেদের হাত হইতে কাপড়ে ঘোড়া কত কি জিনিস রাস্তার মাঝখানে উড়িয়া আসে। শব্দ হয়। চারিদিকে ছিটাইয়া যায়। সে সব যে কি পদার্থ তাহা নাই বলিলাম।

এসব জিনিস ছোটখাটো হইলেও—যদিও নিমতলার ব্যাপারটি ছোটখাটো নয়—আমরা ছোট-খাটো বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতে জাতীয় চরিত্রের দৈন্য সূচিত হয়। অপরের সুবিধা অসুবিধা শুচিতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। যার কোঁচা পিছে ঝুলাইয়া যায়, চলিতে চলিতে ছোতলা তেতালা থেকে যার সামনে ছেলে-মেয়েদের ময়লার পুঁটলি আসিয়া পড়ে, চলিতে চলিতে যাহার পা আমের খোসা বা কলার খোসায় পিছলাইয়া যায়, তখনকার মত সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে জিনিসটা কী। যাহার মাথায় ছাদের উপর থেকে নিষ্ঠীবন আসিয়া পড়ে, তাহার সমস্ত দেহ অশুচিতায় ভরিয়া যায়।

অন্যের সুখ সুবিধার দিকে এই দৃষ্টিহীনতা আমাদের জাতীয় জীবন হইতে কবে দূর হইবে, কে দূর করিবে? এই শিক্ষার বাহক কে হইবে,

স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, না বাড়ীতে মাতা পিতা ? চাওয়াই বাঞ্ছীয় মত একাজটা এক মুহূর্ত্তে হইবে না। জাতীয় জীবনের এই দৈন্য ঘুচাতে পারেন এক মায়েরা। তাঁহারা আজ হইতে লাগিয়া গেলে এক পুরুষে এই পাপ দূর হইবে। জাতীয় জীবনের পক্ষে সে সময়টা বেশী নয়, খুব অল্প। মায়েরা নিজেরা কিছু ফেলিবেন না, ছেলেদের রাস্তায় কিছু ফেলিতে দিবেন না, বাড়ীর কর্ত্তাদেরও ফেলিতে দিবেন না। তবে দেখা যাইবে যে এই নোংরামি দূর হইয়াছে। জাপানের লোকে রাস্তায় থুথু ফেলে না। বাড়ীতে কোনও অভ্যাগত যদি দেশলাইয়ের কাঠি এখানে সেখানে ফেলেন বা সিগারেটের শেষটা যেখানে সেখানে ফেলেন, দেখা যাবে একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া তাহা যথাস্থানে রাখিবে। মায়ের পেটের থেকে পড়িয়াই তাহারা এই শৃঙ্খলা বোধ শিখে নাই, তাহারও পিছনে জাপানী মাতৃজাতির অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনা ছিল। আমাদের মায়েদের সেই সাধনায় লিপ্ত হইতে হইবে। Respecting of others' right is freedom. সংজ্ঞাটি সুন্দর। কিন্তু আমরা অপরের সুখ সুবিধার দিকে চাই কি ? বরং সেদিকে না চাওয়াটাকে আমরা পৌরুষের কাজ মনে করি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। জাতির ছেলে-মেয়েকে সব দিক হইতে তুলিয়া ধরা মাতৃজাতির দায়। তাঁহারা যদি আমাদের এই নোংরামি দূর করিয়া দেন, ভবিষ্যৎ ভারতীয়গণ তাঁহাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

———

শিক্ষা ও ধর্ম

[শ্রীকপিভূষণ বিশ্বাস]

যখন মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল, তার আগেই যেমন রামায়ণের সৃষ্টি, মানুষের আধ্যাত্মিক জাগরণও তেমনি তার শিক্ষা আরম্ভের পূর্বেই হয়েছিল। তার পিছনে অবশ্য ছিল দুর্গতি মুক্তির একটা আকুল প্রার্থনা। আদিম মানুষ নৈসর্গিক দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পনা করেছে। পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের অনেক আগেই। প্রাচীন যুগে নীতি, কাব্য, ধর্ম, দর্শন সবই কিছুর উৎসই ছিল ধর্মগ্রন্থগুলি। বেদ-বাইবেল কোরান-ই ছিল যেন মানুষের ইহকাল পরকাল—জীবনাদর্শের যথা-সর্বস্ব। ধর্মের এই একাধিপত্যের কথা স্মরণ করে তাই একজন শিক্ষাবিদ বলেছিলেন যে, সৃষ্টির আদিতে যেমন পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল ছিল, সভ্যতার প্রথম কয়েক শতাব্দীতেও তেমনি মানুষের ধ্যান ধারণার তিন দিকে ছিল ধর্মের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এই অবাস্তব চেতনার আড়ালে মানুষের অন্য চাহিদার জগৎ যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষ আর একটা প্রাণের ক্ষুধা ছিল মানুষের মনে। সে অনুভব করেছিল যে অন্য একটা চাহিদার জগৎ আছে, যেখানে হাতে-নাতে-প্রাণে মানুষ নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে; রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ মানুষকে সেই অপ্রয়োজনের লীলাক্ষেত্রে আহ্বান করেছে, কিন্তু ধর্মের চোখ রাঙানিতে মানুষ তাকে এড়িয়ে গিয়েছে। এক কথায়, অনেক দিন পর্যন্ত ধর্মের আওতায় শিক্ষা দীক্ষা ছিল মোহাচ্ছন্ন।

শিক্ষাটা প্রথমে ছিল ধর্মযাজক বা পুরোহিতদের

হাতে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইতিহাসে তার মহিমা রয়েছে। একদিকে আর্ক বিশপেরাই ছিলেন ইউরোপের সর্বময় কর্তা, আর গির্জাগুলিই ছিল ধর্ম-শিক্ষা এবং জনমত প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে ধর্মশিক্ষার প্রতিপত্তি দেখা যায়। রেনেসাঁস যুগের পর প্রথম শিক্ষায় মোড় ফেরে। তাও ধর্ম প্রচারের মারফতে শিক্ষার প্রচার হয়েছে বহুদিন। ধর্মকেই কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হয়েছে অজস্র। তাই বাদ্য ছাড়া আর গীত নাই, এ ছিল তারতের সনাতন ধর্মের মূলমন্ত্র। বাইবেলের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে মিলটন 'প্যারাডাইস্ লস্ট' মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল রামায়ণকে অনুসরণ করে রচনা করেছিলেন মেঘনাদবধ কাব্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ধর্মের আওতা থেকে শিক্ষা দীক্ষাকে সরিয়ে আনলেও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মই কিন্তু পৌরোহিত্য করেছে। মুসলমান যুগেও দেখা যায় যে, শিক্ষা ব্যাপারটা ছিল মৌলভী মুন্সীদের হাতে মক্তব মাদ্রাসায় সীমাবদ্ধ। সেখানে ধর্ম শিক্ষার স্থান-ই ছিল সর্বাগ্রে।

এই ধর্ম বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সকল দেশে এক একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তাঁরা শুধু নিজ ধর্মের গুণ কীর্তনে ব্যস্ত হতেন তা নয়, সময় সময় অন্য ধর্মের প্রতি করতেন কটাক্ষপাত। শুধু কি তাই? প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতাও চলতো দেব-দেবীর বিগ্রহ মূর্তিকে কেন্দ্র করে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে কত না সাম্প্রদায়িক কলহ। এমন কি, এই ধর্মগত বিদ্বেষের ফলে বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহ। ইউরোপের দীর্ঘ-স্থায়ী ধর্ম যুদ্ধটা ধর্ম থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন ছাড়া আর কিছু নয়।

নানা আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল থাকা সত্ত্বেও ধর্ম কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম যেমন বিশ্বজ্ঞে তেমনি সর্বব্যাপী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে কোন না কোন ধর্মের প্রভাব। ধর্মহীন নিরিবিলি মানুষ যেন কল্পনাতীত। উদার অর্থে প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই তার ধর্ম বলা চলে। মনুষ্যত্ব তাই মানুষের, পশুত্ব পশুর, দেবত্ব দেবতার, ঋষির ঋষির, ধর্ম; তবে যে ধর্ম এত ব্যাপক, তার সংজ্ঞা কি হবে? আর ধর্মই বা কি? যা ধারণ করে, তাই ধর্ম। মনুষ্য ধর্মের আধার মনুষ্যত্ব, দেবতার দেবত্ব, পশুর পশুত্ব। এই প্রসঙ্গে ধর্মের বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখযোগ্য। ধর্ম নিরপেক্ষ নয়, উর্ধায়ন-ই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। আর এই উর্ধায়ন বা উন্নতীকরণ বিবেকের নির্দেশ সাপেক্ষ; তাই বিবেকহীন প্রাণীর কোন উর্ধায়ন নেই, উর্ধায়ন আছে মানুষের। এই পূর্ণ উর্ধায়নকে নির্বান বা মুক্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে; আর জিহাদের কথা হচ্ছে ধর্মই ধর্মের শেষ। অর্থাৎ আরম্ভ আর পরিণতি, অনুসন্ধান এবং প্রমাণ, দুই-ই আছে ধর্মের মধ্যে। তবে উর্ধায়ন ধর্ম সাধনার প্রধান লক্ষ্য; তাই ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, ভাল হবার প্রবৃত্তি এবং উদার মহৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই আধ্যাত্মিকতার জন্ম। অনুসন্ধান থেকেই অনুমান, প্রমাণ, তার পর আসে জ্ঞান। এই জ্ঞান-ই মানুষকে সৎ পথের নির্দেশ দেয়। কাজেই সেই সত্য জ্ঞানই 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমে'র পথ দেখায়। আর 'সত্যম্' যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে 'সুন্দরম্' আছে, 'শিবম্'ও আছে। তাই সত্যের মধ্য দিয়েই জীবন শুভ, পবিত্র, প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে। কাজেই এই সুন্দর জীবন লাভের অনুধ্যানই হচ্ছে মানুষের ধর্মপিপাসা। ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাই তিনি বলেছেন, 'Religion is the quest for good life.'

এই তো গেল ধর্মের কথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার যোগ কোথায়? আমরা জানি

যে জীবনের জন্যই শিক্ষা এবং ধর্মের প্রয়োজন। জীবনের উর্ধায়নই ও দুটোর লক্ষ্য। কাজেই সেই উর্ধায়নের ক্ষেত্রেই ধর্মের সঙ্গে রয়েছে শিক্ষার যোগ। তা ছাড়া, শিক্ষা ও ধর্ম মানুষের চিত্তবৃত্তির দুটি ভিন্নদিক মাত্র। মানুষের সহজাত কৌতূহল থেকে অনুভূতির মাধ্যমে এসেছে জ্ঞান বা শিক্ষা, আর বিশ্বাসলব্ধ ভক্তি থেকেই এসেছে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা। কাজেই জীবনের সঙ্গে ধর্ম ও শিক্ষার অন্তরের যোগ রয়েছে। একজন শিক্ষাবিদ তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শিক্ষাই জীবন—এ কথা যখন স্বীকৃত হয়েছে, তখন ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককেও মেনে নেওয়া হয়েছে; আর এই আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যে ঔচিত্য বোধ প্রচ্ছন্ন আছে, তাই জীবন ও শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে, অন্যায়, অসত্যের গ্লানি থেকে মানুষের সমাজকে রক্ষা করে। কাজেই আজকের সর্বাত্মক বিপর্যয়ের দিনে শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান করে দিতেই হবে। অবশ্য ধর্ম বলতে যে কোন বিশেষ মতবাদ স্থান পাবে তা নয়। তাই এক জন নীতিজ্ঞ শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, সভ্যতার সঙ্কটের দিনে অকারণ রক্তপাতের হাত থেকে দেশকে, জাতিকে বাঁচাতে হলে জাতীয় শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নিছক দার্শনিক ভিত্তির উপর। কারণ নীতিকে বাদ দিয়ে আর যা হোক, প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। দৈহিক ও মানসিক বিকাশই যে শিক্ষার লক্ষ্য, সে শিক্ষা কখনই আধ্যাত্মিকতাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। তাই জাতীয় সঙ্কটের দিনে শিক্ষার ভিত্তি কি হবে, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, "In a time of total war when everything we value is in danger of being engulfed in a tide of barbarism, there is no need to argue that the education of reconstruction must be based on a sound philosophy."

অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ রবীন্দ্র মন্তব্যের মধ্যেও ঠিক ঐ কথারই সমর্থন আছে। তিনি বলেছেন যে, সভ্যতার প্রবাহ যেদিকে চলেছে, তাতে মনে হয় কোন 'ইজিম' আর 'ইজ্‌ম্' জগতের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বিষয় সঠিকভাবে কোন কথাই বলতে পারে না। তবে বিশ্বের ত্রাণনিয়ন্ত্রণের জন্য একটা মহান উদার কল্যাণময় আদর্শবাদ যে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই: আর সেই আদর্শ হবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের শিক্ষা। বিশ্ব নিরাপত্তার কথাপ্রসঙ্গে তাই তিনি বলেছিলেন যে, Neither naturalism nor pragmatism is capable of providing the insurance policy that will secure the future of the whole world. কিসের দ্বারা সেই ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হবে? তার উত্তরে তিনি মনুষ্যত্ব অর্জনের পন্থা নির্দেশ করে বলেছেন যে, Humanism must be securely founded on something which supports and sustains it; it cannot of itself endure. অর্থাৎ কেবল মনুষ্যত্বের জোরেই বিশ্বে নিরাপত্তা রক্ষা হবে না, বরং তাকে এমন ভিত্তিতে তুলতে হবে যা মানবতার রক্ষক এবং সহায়ক হয়ে উঠবে। উপযুক্ত শিক্ষাই সেই মানবধর্মের বুনিয়াদ গড়ে তুলবে।

মানুষ কোন দিন ধর্মকে ত্যাগ করতে পারবে না। কারণ মানুষ মাত্রই অতিমাত্রায় ধর্মগত-প্রাণ। ধর্মতার হতাশার সান্ত্বনা, দুঃখের শান্তি, বিপদের সাক্ষী, দুর্বলতার শক্তি, ভয়ের পরম নির্ভর স্থল; এক কথায় ধর্ম মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। কাজেই ধর্মের যে যুগে পৃথিবীর বিপন্ন দুর্গত আত্মা একদিন আশ্রয় পেয়েছিল, ভবিষ্যতের মানুষ আবার সেই ধর্মের উপরই নির্ভর করবে। আধপাগলা, হানাহানি, রক্তপ্লাবন নূতন করে আবার সেই অধ্যাত্মচেতনার মধ্য দিয়ে আসবে বিশ্বমৈত্রীর

আনন্দ জোগায়। টাইমস্ পত্রিকায় একজন প্রবন্ধকার ধর্মশিক্ষার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, প্রাণহীনও বটে। শিক্ষা ধর্ম থেকে তো পৃথক নয়ই, ধর্মশিক্ষারই একটি অপরিহার্য অংশ। কারণ ধর্ম ও শিক্ষাই মানুষকে গড়ে তোলে, সমগ্র জাতিকে কোন একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। তাকেই Religion must form the very basis of any education worthy of name and that education with religion omitted is not really education at all." অর্থাৎ ধর্ম-ই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে যে শিক্ষা—তা সে যতই ব্যাপক হোক না কেন—সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। আদর্শ নাগরিকত্বের গুণপনার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন যে, চরিত্র ও আত্ম-বিশ্বাসই হবে সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং নৈতিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মূলধন। আর সে শিক্ষা আসবে কেবল জ্ঞানের মধ্য দিয়ে নয়, বরং সে জ্ঞান আসবে নৈতিক, চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষায় ধর্মের স্থান কতটুকু? তার উত্তরে অনেকে বলেছেন যে, সরাসরি ভাবে নীতি বা ধর্ম শিক্ষা দেওয়াটা ঠিক নয়। উপদেশের ছলে প্রকারান্তরে ধর্ম শিক্ষা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ধর্মকে শিক্ষার মুখ্য বিষয় না করে প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেই কিছু কিছু ধর্মোপদেশ শিক্ষা দেওয়া মন্দ নয়। তবে কোন বিশেষ ধর্ম শিক্ষা না দেওয়াই উচিত। সর্বধর্ম সহিষ্ণুতাই হবে প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্দেশ্য। কেউ কেউ আবার বিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচী থেকে ধর্মকে ছেঁটে বাদ দিতে চেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, শিক্ষার মধ্যে ধর্মকে টেনে এনে কোন রকম সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি না করাই ভাল। কারণ শিক্ষার জন্যই শিক্ষা, সেখানে ধর্মকে নিয়ে অনর্থক মাতামাতি করে লাভ কি? তার উত্তরে নীতিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা বলেছেন যে, জীবনের উন্নয়নের জন্যে শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, তেমনি আধ্যাত্মিকতা উন্মেষের জন্য প্রয়োজন ধর্মশিক্ষার। কারণ ধর্মের ঐতিহ্য থেকেই মানুষ লাভ করে নৈতিক আদর্শ, চারিত্রিক দৃঢ়তা আর পবিত্র আধ্যাত্মিকতা। তাই শিক্ষা থেকে ধর্মকে কিছুতেই নির্বাসন দেওয়া চলে না। কারণ ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষা কখনো জীবনের আদর্শে উন্নীত হতে পারে না। এই গ্রন্থে দেখা যায় যে, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা, সাধনা আর সিদ্ধি যেখানে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে, সেখানেই শিক্ষা হয়েছে কার্যকরী, সাধনা হয়েছে সার্থক। কিন্তু যেখানে তার অভাব ঘটেছে, সেখানে শিক্ষা বা সাধনা জীবনকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কাজেই শিক্ষার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সংযোগ স্থাপন করতে হবে, নইলে শিক্ষার আদর্শ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই শিক্ষার স্বরূপ কি হওয়া উচিত তার উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেই শিক্ষাই দিতে হবে, যে শিক্ষায় চরিত্র গড়ে উঠবে, জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হবে এবং মানুষ তৈরী হবে। কিন্তু সেই শিক্ষা ধর্ম নীতিকে অস্বীকার করে কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তা ছাড়া ধর্ম মানুষের বহিরঙ্গের জিনিস নয়, ধর্ম মানুষের সমগ্র জীবনের আন্তরিক নিগূঢ় শক্তি। তাই একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেছেন যে, ধর্ম জাতীয় পরিচিতির শীলমোহর নয়, ধর্ম প্রত্যেক মানুষের জীবন সেবতার আত্মদর্শন। কাজেই নানা মতবাদের প্রাচীর তুলে মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করবার জন্য ধর্ম সৃষ্টি নয়, অথবা ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি নয়। তাই তিনি বলেছিলেন যে, Religion does not mean a special domain by the side of others—its intention is rather to be the inner-

most soul and the supreme power to the whole life.

এই জন্যে তিনি ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্মপরিপুষ্ট শিক্ষা প্রচারই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তিনি বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন ধর্মকে। তিনি আরো বলেছিলেন যে, কতকগুলো ক্লাসের থেকে ধর্মোপদেশ পড়ে শোনালেই হবে না, অথবা ধর্মশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর মধ্যে নির্দিষ্ট সময় রাখলেই চলবে না, বরং ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতাকে এমন ভাবে জাগ্রত করে তুলতে হবে যার দ্বারা তার সমগ্র জীবন এবং কাজকর্ম প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই তিনি জোর গলায় বলেছিলেন যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ "Applied to School, this means that religion must be much more than a subject or the time-table, although time must be allocated for its special study ; it must be an activity and a sprit pervading the whole of the life and work."

ভাবনিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিকতাই শিশুর চরিত্রকে সুদৃঢ় করে। তা ছাড়া ধর্মের আদর্শকে অনুসরণ করে শিশুরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তুলতে পারে। তাই শিক্ষার যোগ্যতার মান নির্ণয় করতে গিয়ে Committee on Secondary Education '89-এর রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে যে, বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা যতই শিক্ষা লাভ করুক না কেন, তাদের আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত না হলে আমরা তাদের প্রকৃত শিক্ষিত বলতে নারাজ। তাই সেই বিবরণীতে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হয়েছে যে, No boy or girl can be counted as properly educated, unless he or she has been made aware of the fact of the existence of a religious inter-relation of life, অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে শিশু এবং তার শিক্ষাপর্বেরও যে একটা আত্মিক যোগ রয়েছে সে বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষককেই অবহিত হতে হবে।

ধর্মের সঙ্গে কি, এবং শিক্ষার সঙ্গে তার যোগ কোথায়, সে বিষয়ে কিছুটা আলোচনা দেওয়া গেল। এখন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শ ও ঐতিহ্যের বিষয় কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা সকলেই জানি যে, ভারতীয় ধর্মসাধনা আত্মকেন্দ্রিক, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ভারতীয় আত্মদর্শনের প্রথম কথা 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জানো—মনের মধ্যে ডুব দিয়ে নিজের স্বরূপকে জানাই হচ্ছে মানুষের প্রথম ও প্রধান ধর্ম।

ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল সুর হচ্ছে বৈরাগ্যের। ভোগলিপ্সা ভারতের প্রাণের সাধনাকে কোনদিনই স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ ভারতবর্ষ কেবল ঐহিকের সুখকে জীবনসর্বস্ব বলে মনে করেনি। তাই 'একের মধ্যে বহুর আহুতি দিয়া' জাতিগত, শ্রেণীগত সমস্ত ভেদাভেদ বূর্ণীকৃত করে ভারতবর্ষই 'একটি বিরাট হিয়া'কে জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে। অর্থাৎ ভারতমাতা তাঁর নিজস্ব সভ্যতার ছাঁচে হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, পার্শিক, শক, হুন, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি সকল জাতিকেই এক আদর্শে ঢালাই করেছিলেন। সমস্ত জাতিগত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের এমন একত্রীকরণ আর কোথাও দেখা যায় না।

ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এইজন্য ভারতীয় শিক্ষার একটি দিক হচ্ছে পরা বিদ্যা আর অপরটি হচ্ছে অপরা বিদ্যা—একটি চেয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি, আর অন্যটি ইঙ্গিত দিয়েছে আর্থিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের, ও দুটোর যে কোন একটির অভাবে জীবন অসম্পূর্ণ। কারণ

মানুষ আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধু দেহ নিয়ে থাকতে পারে না। তাই দৈহিক প্রয়োজনের পর মেটাতে হয় তার আধ্যাত্মিক, আত্মিক প্রয়োজনকে। এই কারণে জীবনের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য ধর্মের যেমন আবশ্যকতা আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে শিক্ষার।

ভারতবর্ষের গুরুকুল শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রতিদিন অধ্যয়নের পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রকে স্তোত্র পাঠ করতে হোত। অধ্যয়ন ছিল তাঁদের কাছে তপস্যা স্বরূপ। ভগবৎ চিন্তা করে, দেবদ্বিজে প্রণাম জানিয়ে, মনকে শুদ্ধ বুদ্ধ করে তাঁরা লেখাপড়ার কাজ আরম্ভ করতেন। জ্ঞানের পূজায়, শিক্ষার সাধনায় এমনি করে তাঁরা মনপ্রাণ নিয়োজিত করতেন।

বর্তমান যুগের শিক্ষাবিদরা বিদ্যালয়ে সামূহিক প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। প্রার্থনা বা বিনম্র ধর্মভাবের প্রভাব শিশু জীবনে বড় কম নয়। তাই প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় সমবেত প্রার্থনার স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ এই সম্মিলিত প্রার্থনার দ্বারা দিয়েই ছেলে মেয়েদের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করে তোলা সম্ভব। তা ছাড়া বিভিন্ন ধর্মের আলোচনার মাধ্যমে মনের উদারতা বৃদ্ধি পায়, পরধর্ম সহিষ্ণুতা জাগ্রত হয়ে ওঠে; এবং বিভিন্ন ধর্মের মূলসূত্রের মধ্যে শিশুরা পায় একটা পরম ঐক্যের সন্ধান। ফলে শিশুরা কোন ধর্মকেই আর হেয় জ্ঞান করতে পারে না, তারা আপনা থেকেই উদার মতাবলম্বী হয়ে ওঠে। আর সেই সর্বধর্মপ্রীতির মধ্য দিয়ে শিশুরা উপলব্ধি করতে শেখে বিশ্বপ্রেম আর বিশ্বভ্রাতৃত্বকে। আত্মকেন্দ্রিক শিশুর পক্ষে এর চেয়ে কল্যাণকর মহান উত্তরণ আর কি হতে পারে? তাই এই সার্বজনীন অনুভূতি শিশুর ভবিষ্যৎ ধর্মজীবনের সাধনার, কল্যাণের, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। কাজেই সেই আত্মোপলব্ধি থেকে কোনক্রমেই শিশুদের বঞ্চিত করা উচিত নয়।

প্রকৃত শিক্ষাদান

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

যখন আপনাকে কেহ বলে যে "আমি না পাকিলেও যে ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারে, সেই ফোয়েবের, পেস্টোলাৎসীর অথবা মণ্টেসরীর ব্যক্তিই তো শিক্ষাদানের অনির্বচনীয় সত্যস্বরূপ। পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিতেছি" তখন আপনাকে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে এ শুধু কথার ভাঁড়, শুধু শিক্ষা দানের আড়ম্বর, কোনও এক বিশেষ পদ্ধতির অর্থহীন অনুকরণ, একেবারে শূন্য, ইহাতে প্রাণ নাই। শিক্ষাদান এমন কিছু বীরপথিকের সূত্র নহে যে, সূত্র বা কায়দা লাগাইলেই তৈরী উত্তর পাওয়া যাইবে! গ্রহণ করিবার শিক্ষা এ শিক্ষা নহে, এ পদ্ধতি শিক্ষাদান করিবার পদ্ধতি নহে। 'অন্তর হইতে বাহির হইয়া স্বভাব প্রকট হয়'—এই ভাবে যাহা বাহিরে প্রকাশিত হয় তাহাই শিক্ষা। এই সহজ শিক্ষা 'সদোষবর্ণি'—দোষযুক্ত হইলেও—চলিবে। কিন্তু বিশেষ কোনও পদ্ধতির ধাঁচের নিকট সাজানো গোজানো অজ্ঞান ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কারণ, শাস্ত্র কি? শাস্ত্র হইল ঐ ব্যবস্থিত অজ্ঞান; এ ছাড়া শাস্ত্রের অন্য কি অর্থ আছে, বলুন? শিক্ষণশাস্ত্রবেত্তা স্পেনসার বলিয়াছেন যে শিক্ষাদানের ফলে অলৌকিক ব্যক্তির সৃষ্টি হয় না এরূপ শাস্ত্রের দিক হইতে কতখানি মূল্য উঠিতে পারে? 'এবম্ মূঢ়ো বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত' এরূপ শাস্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেখুন; যে শাস্ত্র এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে না পারে, সেই শাস্ত্র লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়ার বিবিধ চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নয়।...যে ব্যক্তি পদ্ধতি বিনাই পদ্ধতিপ্রবীণ, কোনও শুষ্ক যুক্তিতে সেইজন্যই বিবাদবৃদ্ধি মহাত্মারা বলিয়াছেন যে শিক্ষাদানে কি করিয়া করা যাইতে পারে তাহা আমরা জানি না—ন বিদ্মঃ কথমেতদ্ধি (কেনোপনিষৎ)। শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষণযান বা পাঠ্যসূচি, বা টাইমটেবল, সময়পত্তর—এসব শব্দের কোনও অর্থ নাই; ইহাদের মধ্যে নিছক মানুষের আত্মবঞ্চনা বিনা আর কিছুই নাই। শিক্ষণ তো বাঁচিবার ক্রিয়ার মধ্যেই পাওয়া যায়। বাঁচিবার ক্রিয়া যখন শিক্ষক নামে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির ক্রিয়া হইয়া দাঁড়ায়, তখন বিজাতীয় দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করে, এবং পরিণামে স্বভাবতই এরূপ শিক্ষাদান হইতে মনের উপর বিষময় ও অস্বাস্থ্যকর প্রভাবের সৃষ্টি হয়। কর্মের অভ্যাস করা ছাড়া জ্ঞানের মূল্য লাগে না, এবং এই অবস্থায় যে জ্ঞান বিজাতীয় হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে, তাহা হজম করিবে এরূপ শক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়ের থাকে না। শুধু বই মগজে ঠাসিলে যদি লোক জ্ঞানী হইতে পারিত, তাহা হইলে পুস্তকালয়ের কপাট কি জ্ঞানীদের মধ্যে গণ্য হইত না? স্বাভাবিক থাকিয়া যে লোক দুষ্পাচ্য জ্ঞানে প্রবেশ করে, তাহার অবশ্যই বুদ্ধির অতিসার আরম্ভ হয় এবং মতে সে মানুষের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

---

* দ্বিতীয় ভাগের পুস্তাক্ত লেখা হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

[সম্পাদিকা]

[বাপু-স্মৃতি। কাকা কালেলকারের 'বাপুকী ঝাঁকিয়া'র অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ গুহ। নবজীবন প্রকাশন মন্দিরের (আহমদাবাদ) অনুমতিক্রমে 'সুপ্রকাশন' হইতে শ্রীসুধেন্দু দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। দাম দুই টাকা। প্রথম সংস্করণ ১৯৫০।]

কাকা কালেলকারের লেখা 'বাপুকী ঝাঁকিয়া' ভারতের সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। সিউনী জেলে লেখাপড়ায় আলাপ আলোচনায় কাকা সাহেবের বন্দীজীবন কাটিতেছিল। বন্দীদের মধ্যে অনেকেই গান্ধীজির এই একান্ত কাছের মানুষটিকে গান্ধীজি সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। সেই মহাজীবনের নানা ঘটনার কথা বলিতে বলিতে বন্দীদেরই একজনের কথায় তিনি স্মৃতির কৌটা খুলিয়া টুকরা টুকরা মাণিকগুলির মালা গাঁথিয়া ক্রমে এই 'বাপুকী ঝাঁকিয়া' লিখিয়া ফেলেন।

লেখক বলিতেছেন, বাপুজীর জীবিতকালে এই স্মৃতিকথা লিখিতে হইয়াছিল, সেজন্য সংকোচ সহকারে লিখিয়াছিলেন, পূজ্য বাপুজীর হাতে যদি ইহা পড়ে, আর কোথাও তিনি ভক্তির আতিশয্য দেখিতে পান তো তাঁহার বিশ্রী লাগিবে। গান্ধীজি অবশ্য এগুলি ছাপানো দেখিয়া যান নাই, কিন্তু কাহিনীগুলির সর্বত্র একটি অকপট সত্যনিষ্ঠা, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও মধুর সরস প্রীতির পরিচয়ে পাঠকের চিত্ত মুগ্ধ হয়। গান্ধীজির জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ, সুদীর্ঘ কালে, বিশাল পরিধিতে বহু বিচিত্র নরনারী ও ঘটনাবলী সেই জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, অপূর্ব বিচ্ছুরিত দান করিয়াছিল। এই স্মৃতিকাহিনীতে তাঁহার সমগ্র পরিচয় না মিলিলেও যথার্থ পরিচয় মেলে। দর্শন জীবনকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিয়া সেই পথে পরিচালিত করিতে চায়। ব্যক্তিবিশেষের জীবনদর্শন বুঝিতে হইলে তাই তাঁহার চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রয়োজন। গান্ধীজির জীবনের এই ছোট ঘটনাগুলি অপরূপ আলোকে তাঁহার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। সমগ্রভাবে না হউক, তাঁহার অনেকখানি যেন আমাদের কাছে ধরা পড়িয়া গেল।

প্রথম কাহিনীগুলিতে শান্তিনিকেতনের জীবন, রবীন্দ্রনাথ, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস; কাকাসাহেব, কিশোরলাল মশরুওয়ালা, মহাদেব দেশাই, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি কি ভাবে কাছে আসিয়া তাঁহার আপনার জন হইয়া গেলেন, তাহার সুমধুর ইতিহাস। কিন্তু এই সব আপনার লোকদের তিনি বাঁধাইয়া লইতেন, কাহাকে এতটুকু রেহাই না, এতটুকু ফাঁক চলিত না। নটরাজনের ছেলের দেওয়া দুই ইঞ্চি পেন্সিলটি হারাইলেও তাঁহার সোয়াস্তি নাই। সে যে প্রেমের উপহার। আর তাঁহার এই সজাগ দৃষ্টিই পড়িয়া তুলিয়াছিল মহাদেব দেশাইয়ের মত মিষ্টভাষী কর্মীকে, তিনি খুড়ির ছেঁড়া কাগজ মাটিতে ফেলিয়া এক এক করিয়া সাজাইয়া ছেঁড়া চিঠি জোড়া দিয়া বাপুর কাজের সুবিধা করিয়া দিলেন। মহাদেব দেশাইয়ের প্রতি তাঁহার অপত্য স্নেহের কথা তো ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইবে। ৩২ নং কাহিনীতে বাপুজীর স্বয়ং স্টেশনে মহাদেবের জন্য চা, দুধ, চিনি, পাউরুটি আনিয়া ট্রেতে সাজাইয়া রাখার দৃশ্যটি মর্মস্পর্শী। এমন ভাবে ধরা না দিলে কি লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয় পাওয়া যায়?

এরোড়া জেলে (৩৬ নং) রাবণী করেঙ্গির

বিছায় কাহড়ানো আয়গাটি চুলিয়া বিষ টানিয়া লওয়ার মৃত, একই কায়দায় যন্ত্রণা ভাইয়ের আওয়াজ শুনিতে পান অথচ দেখিতে পান না বলিয়া আঙিনায় টহল দেওয়ার সময় ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার দেওয়ালের ওপারে দৃষ্টি দেওয়ার ছবিটি আমাদের বারবারই মনে পড়িয়া যায়। লেখক তাই বলিয়াছেন, দূর হইতে যাহারা বাপুকে দেখে তাহারা তাঁহার বীর উদাত্ত ভাবটাই কেবল দেখিতে পায়। তাঁহার ভালবাসা যে কিরূপ তীব্র ও তাহাতে আঘাত লাগিলে তিনি যে কতদূর ব্যথিত হন, তাহা বাহিরের লোকের বুঝিবার সুবিধা নাই।

সময়ানুবর্তিতা, কথা দিয়া কথা রাখা, এগুলি গান্ধীজির সত্যনিষ্ঠারই আরেক পিঠ। তাই দেখি, নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছিতে পারিবেন না আশঙ্কায় কখনও তিনি পায়ে হাঁটিয়াই রওয়ানা হন, কখনও বা বন্দুকধারী আরোহীর কাছে চাহিয়া লইয়া, তাহার সাইকেলে চাপিয়া, কখনও বা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়া তিনি সময়মত গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতেন। যাহার একটি পয়সাও অকারণ ব্যয় করিতে বাধিত এক্ষেত্রে কিন্তু তাঁহার টাকা খরচ করিতে বাধিত না। লোকের সঙ্গে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই মত কাজ যে করিতেই হইবে।

নানারকম গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় কাজে ব্যস্ত থাকিলেও আশেপাশের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রিয় পরিজনদের খুঁটিনাটি কথা ও কাজে তাঁহার দৃষ্টি নিয়ত সজাগ থাকিত। তাই দেখি, চম্পারনে তিনি অনুসন্ধান ও তথ্য বিশ্লেষণ করিতেছেন, আশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, হাওয়ার গতি বদলাইয়া যাইবে, আশ্রমের জলকূপের গর্ত বুজাইয়া নূতন গর্ত খুঁড়িবার কথাও তাঁহার ভুল হইবার নয়।

জীবনের এমন কোন দিক নাই যে সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করেন নাই, তাই আহারের সার পদার্থ যেন রক্ষা পায়, পরিমিত নিদ্রা ও বিশ্রামে কাজের শক্তি সংরক্ষণ যেন হয়, সব দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। জেলের হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সময় বিদেশী ডাক্তার তাঁহার অঙ্গে উঠিয়াছিল; তিনি নিজের বিরোধিতা করেন নাই। কিন্তু যেদিন মুক্তির সংবাদ আসিল, সেদিন তাঁহার আরএক মুহূর্তও সহ্য হইল না।

অপরিগ্রহ তাঁহার জীবনের অন্যতম সাধন ছিল, সকলেই জানেন। নিজের জন্য, পরিবারের জন্য কিছুই তিনি গ্রহণ করেন নাই, কিছুই রাখেন নাই। কিন্তু এই সংসারে কাহিনীতে তাঁহার অপরিগ্রহ মন্ত্রের যে রূপটি দেখি তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। মন সম্পূর্ণ পার্থিব বস্তু বর্জন করিতে হইবে, ইহাই আমরা বুঝি। কিন্তু এখানে দেখি, অধিক শ্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেছেন, দিনভর কাজ করার জন্য সকালবেলা আমরা যে শক্তি পাই, শয়নের পূর্বে তাহা শেষ করিয়া ফেলা উচিত। অপরিগ্রহের ইহা লক্ষণ। আত্মিকার শক্তি বাদের জন্য বাঁচাইতে যাই কেন?

বিংশ শতাব্দীর এই অদ্ভুতকর্মা মহামানবটির পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। লেখক বলিতেছেন, বাপুর ভালবাসা সেবাময়। যে কোন লোকের সুখদুঃখ পুরাপুরি উপলব্ধি করার বৃত্তি তাঁহার স্বাভাবিক। গান্ধীজির উদার দৃষ্টি জগদ্ব্যাপারকে বৃহৎ করিয়া দেখিয়াছিল। ক্রোধ, লোভ বা কোন ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ভারতের তথা মানবের স্বার্থকে তিনি খর্ব করেন নাই। তাই তাঁহার মহত্ত্ব আজ এমন উজ্জ্বল, তাই "পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্যে প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে" পূর্ণ হইয়া তিনি আমাদের দেশকে বন্ধনমুক্তির আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করিতে পারিয়াছেন। আমরা তাঁহার জীবনের এইসব ঘটনার কথা যত বেশি স্মরণ করিব ততই আমাদের মঙ্গল। 'লোকসেবকে' যখন প্রকাশিত হয় তখনই

আমাদের ইহা খুব ভাল লাগিয়াছিল। এখন বইয়ের আকারে সবগুলি একত্র পাইয়া খুবই আনন্দ হইল। এই ধরনের বই বাংলা ভাষায় নাই। শ্রীযুক্ত যীন্দ্রনাথ শুহ দীর্ঘকাল শান্তীনিকেতনে আদর্শ শিক্ষক করিয়া দেশের সেবা করিয়াছেন। অনুবাদের মধ্যে তাঁহার অনুচ্ছ প্রতিভার একটি সুর ধ্বনিত হইয়া পাঠকের চিত্তকে অনুরূপ ভাবে ভাবিত করিয়া তোলে। অনুবাদকের শ্রম তাই সার্থক। যীরেন বাবু সর্বত্র মূলের বিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহার রচনাগুণে বিদেশী কথাগুলি যেন আমাদের নিজের ভাষারই অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। ৬৩ সংখ্যার কাহিনীটি নির্বাচনে অনুরূপ, তাহার মধ্যে 'হাসি ঠাট্টা'র পরিবর্তে 'বিনোদ' কথাটি বড়ই ভাল লাগিয়াছে।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুপাতে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা ২৷৷০ টাকা আগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।৷০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ভোজার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। সিকিমের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ভোজার লেন, পোঃ বালবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিক্ষা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ

৯ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ | ৭ম সংখ্যা

আলোচনা

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও প্রবেশিকা পরীক্ষা

বিগত ১৩ই জুন পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কার্য নির্বাহক পরিষদের প্রথম সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথমটিতে তাঁহারা স্থির করেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর আগামী ১৯৫২ সনের ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন না। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডই এই পরীক্ষা পরিচালনা করিবেন। এই পরীক্ষার নাম আর ম্যাট্রিকুলেশন থাকিবে না। এখন হইতে এই পরীক্ষাকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা বলা হইবে। তবে আগামী বৎসর এই পরীক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ীই লওয়া হইবে। বোর্ড এই সিদ্ধান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়া দিয়াছেন।

ইহারা স্থির করিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক এই বোর্ডের সিলেবাস ও টেক্সটবুক কমিটির অনুমোদন অনুসারে চলিবে। এই কমিটির কোন সদস্যই নিজেদের লিখিত কোন পুস্তক পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করিবেন না।

পরিষদ স্থির করিয়াছেন যে, টোল ও মাদ্রাসাগুলির শিক্ষা আপাতত সরকারি শিক্ষাদপ্তর কর্তৃকই চালিত হইবে।

১৯৫১ সনের বৃত্তিপরীক্ষাটি এই বোর্ডই পরিচালনা করিবেন, তবে শিক্ষাদপ্তরের ডিরেক্টরের সহযোগিতায়। ঐ পরীক্ষায় বর্তমান কর্মসূচিই বজায় থাকিবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের শীঘ্রই আরও অধিবেশন হইবে। সদস্যগণ যেরূপ উৎসাহ লইয়া নূতন কার্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে শিক্ষার কল ভাল হইবারই কথা। আমরা সাগ্রহে ফলাফলের দিকে চাহিয়া থাকিব।

শিক্ষকের জন্য স্মৃতিসভা

১০ই জুন কলিকাতার ঈশান স্কি স্কুলে শিক্ষাব্রতী পরলোকগত তুলসীদাস কবের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। ইনি দীর্ঘকাল নীরবে অধ্যয়ন অধ্যাপনার সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সভাপতি তাঁহার অনেক

ধরণ গুণের উল্লেখ করিয়া বলেন যে অধ্যাপক বয় ভারতের সাধনায় যোগ্য সাথিক ছিলেন। মৃত্যুকে ইনি জীবনের নিছেদারূপে পরিগণিত করিয়া-ছিলেন।

বিগত ৩রা জুন ধানবাদ সহরে পুত্র মেজর বসুর গৃহে হিন্দিই শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী শোভা বসু পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি কানপুরে বহু বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছেন।

বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে ইনি কানপুর যান, পরে ইহার বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের ফলে বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত হয়। বেশ কিছুদিন কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিয়া ইনি কার্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন। নিরহঙ্কার অমায়িক স্বভাবের জন্য ইনি কানপুর বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী উভয় সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষায় অল্প খরচ

উপনিবেশগুলিতে ক্রমশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার প্রসার হইতেছে। যুদ্ধের পর কলেজের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে এবং ছাত্রসংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্প্রতি গৃহের জন্য অধিক ক্ষেত্র ও গৃহ নির্মাণের চেষ্টায় ব্যাপৃত। ঔপনিবেশিক বিদ্যালয় পরামর্শ বোর্ড প্রায় ৬,০০০,০০০ পাউণ্ড এই প্রচেষ্টার জন্য ব্যয় করিতেছেন। যেমন বিপুল প্রচেষ্টা, তাহার পিছনে তেমনই অর্থবল রহিয়াছে। আমাদের দেশে শিক্ষার খাতে ব্যয়ের সময় সর্বদাই অর্থাভাবের কথা শোনা যায়। শিক্ষকরা উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে নিজীব অনুৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন, আধপেটা খাইয়া সরস শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের প্রাণে নবীন আশার, উৎসাহ ও উদ্যমের বাণী কি করিয়া শুনাইবেন?

বাণীদীপ

জলপাইগুড়ি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের হাতে-লেখা 'বাণীদীপের' বর্তমান বর্ষের সংখ্যাটি খুবই সুন্দর হইয়াছে। প্রতি বৎসর পূজার ছুটির আগে বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েরা নিজেদের হাতে আঁকা ছবি ও রচিত গল্প ও প্রবন্ধ দ্বারা ইহাকে শোভার সৌন্দর্যে পরিমণ্ডিত করে। এবারকার পরিকল্পনাটি যেমন রুচির তেমনই পতাকুগতিকতাবর্জিত একটি শিল্পীমনের পরিচয় দিতেছে। পত্রের ছত্রে ছত্রে ওরুণ বয়সের মেয়েদের আশা আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা কামনার কথা মুক্তার অক্ষরে লেখা আছে। কিছু হাতে আঁকা ছবি ও কিছু কাগজে কাটা ছবিতে পাতাগুলি সুদৃশ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

আমাদের সময়কার নীরস পড়া মুখস্থ করানোর দিন আর নাই। পাঠ্যবস্তু সরস ও মনোহরণ করিয়া তুলিবার জন্য যে নূতন মনের প্রয়োজন, ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠ্যতালিকার বাহিরে এই সব কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভবিষ্যতের কত কবি ও শিল্পী, কত কথাসাহিত্যিক ও মনস্বী লেখক লেখিকা তো আমাদেরই ইস্কুলে কলেজে সাধনার রত, তাহাদের সম্ভাবনার মুকুলগুলি বিকশিত হইবার জন্যই উন্মুখ। তাহাদের ফুটাইয়া তুলিবার দায়িত্ব যে শিক্ষকের। এই পত্রিকার পরিচালনার মধ্যে তাহারই ইঙ্গিত।

ইহার মধ্যে আরও আছে সহযোগিতার শিক্ষা। যাহার যতটুকু শক্তি আছে তাহারই স্বাধীন প্রকাশের দ্বারা সাত রকম ফুলের একটি সুন্দর মালা গাঁথিয়া তোলার প্রয়াস। সংযম ও সংহতির উন্মেষ। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে যেমন, এই ধরণের প্রচেষ্টার মধ্যেও তেমনি ডিসিপ্লিন শিক্ষা দেওয়া যায়। নিজেদের বাহিরে এই সব কাজ বড় দেওয়া যাইবে, ছেলেমেয়েদের স্বাধীন চিন্তা, পরিকল্পনা, ভাবের বিকাশ ও তাহাকে রূপায়িত

করার শক্তি ততই বেশি হইবে। 'বাণীদীপের' শিখা ক্রমে আরও উজ্জ্বল হইয়া সর্বত্র বাণীর মন্দিরগুলিকে আলোকিত করুক।

ছাত্রদের অনশন

ধর্মঘট কথাটি আজ দেশের আকাশে বাতাসে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ছাত্রদের ধর্মঘট, মজুরদের ধর্মঘট, কলার খনির শ্রমিকদের ধর্মঘট, গ্যাসকোম্পানিতে, রেলওয়েতে স্টক এক্সচেঞ্জে, সর্বত্র ধর্মঘট। উপরে নীচে, ছোটয় বড়য়, শ্রমিক মালিকে কোথাও যেন সম্প্রতি নেই। ভাবটা সর্বদাই যেন একপক্ষ অপর পক্ষকে শোষণ করিতে, পীড়ন করিতে, দাবাইয়া রাখিতে ব্যস্ত। অথচ কোন ক্ষেত্রেই কেহ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, একের কল্যাণে অপরের কল্যাণ, একের উত্থানে অপরের উন্নতি, একের সমৃদ্ধিতে অপরের সমৃদ্ধি। সুতরাং সহযোগিতা, সম-ভাবনা, সহবুদ্ধি ছাড়া কোন পক্ষেরই বাঁচিবার পথ নাই। পতনে অভ্যুদয়ে দুই পক্ষকেই হাতে হাত মিলাইতে হইবে। অবশ্য প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে, বুদ্ধিমান পিতা পুত্রে, গুরুশিষ্যে মতের অনৈক্য, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, পথচলার ছন্দ-বৈষম্য থাকিবে, বলা বাহুল্য। সেই ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া চলাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, ইহা ভিন্ন পথ নাই।

কর্মক্ষেত্রে, কারখানায় আপিসে ধর্মঘট দেখিলে আদর্শের অপেক্ষা সুখ সুবিধার দিকের কথাই আমাদের মনে জাগে। কিন্তু ছাত্রদের ধর্মঘটে মনে আঘাত লাগে, আদর্শের সংঘাতে মন ক্ষুব্ধ হয়। ছাত্রদের মধ্যে সংযম শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতার অভাব দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা জাগে। কিন্তু অপরদিকে একথাও মনে হয় এই অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা, নিয়ম অমান্য করার প্রবৃত্তি বাড়িয়া চলিয়াছে কেন? নির্দেশ মানিয়া চলিবার স্পৃহা কেন তাহাদের মধ্যে আজ বিরল?

সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করিয়াছিল। শুধু ধর্মঘটে ফল হইল না দেখিয়া অনেকগুলি ছাত্র অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছিল। দুই একজনের অবস্থা বেশ কাহিল হইয়াছে শোনা যাইতেছিল। ইহাদের অভিযোগ, কোর্স শেষ হয় নাই, সুতরাং পরীক্ষার তারিখ পিছাইতে হইবে। অভিযোগের মূলে কিছু সত্য আছে কিনা, অন্যান্য বৎসর কি হয়, এবার কেন বিশেষ আপত্তি হইল, সে সব বিষয়ে সঠিক খবর আমাদের জানা নাই। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনাধীন, এখন বিশেষ কিছু বলাও অসঙ্গত। তবে একটি কথা আমাদের বলিবার আছে। পরিস্থিতি নবীন হইয়া উঠিলে কর্তৃপক্ষকে আপোষ করিতেই হয়, তখন যুক্তিকেও হার মানিতে হয়। কাজেই অবস্থা ততদূর গড়াইবার আগে সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিয়া বিষয়টির মীমাংসা পূর্বেই করা কি সমীচীন নয়?

আমাদের প্রেসে যাওয়ার পর এই অনশন ধর্মঘট শেষ হইয়াছে। বড়ই সুখের বিষয় যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের একটি সন্তোষজনক রফা হইয়াছে। চিকিৎসা-বিদ্যার অধ্যাপনা সম্বন্ধে যে সব অনিয়মের কথা উঠিয়াছে তাহার তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে নিখিল ভারত শিক্ষা সংঘ সমবায়

নিখিল ভারত শিক্ষা সংঘ সমবায় পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ১৯২৬খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ইহার আরম্ভ। গত ১৯৩৭ সালে প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্বে, জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা কিরূপ হইবে তাহা লইয়া সমবায় আলোচনা করেন। ১৯৩৯ সালে ইহার এক কমিটি শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে নিজস্ব এক কমিটি নিযুক্ত করিয়া নিখিল ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনার ভার তাহার উপর দেন, তাহার ফলে সার্জেন্ট পরিকল্পনা। কিন্তু সার্জেন্ট পরিকল্পনায় সমবায়ের মন তুষ্ট হইতে পারিল না। তাহার

কমিটি কাজ করিতে থাকিল, তবে দেশব্যাপী অশান্তির ফলে তাহা অগ্রসর হইতে পারিল না। ১৯৩৭ সালে সমবায় পুনরায় বেওয়ার অধিবেশনে এক জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা কমিটি নিয়োগ করেন। তাহার ফল এইবার প্রকাশিত হইয়াছে।

কমিটি সর্বতোভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সমর্থন করেন। শিক্ষানীতি, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি সকল দিক হইতেই ইহা যে একমাত্র কার্যকরী নীতি তাহাতে আর সমবায়ের সন্দেহ নাই। কায়িকশ্রমী বৃত্তিই বড় কথা নয়। শিক্ষার বিশেষ সহায়করূপেই হাতের কাজকে ইহারা অনুমোদন করেন। আজ হউক, কাল হউক, জাতীয় শিক্ষাকে বুনিয়াদীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; সমবায় মনে করেন, দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইবে। হাতের কাজকে দৈনিক পাঠসূচির মধ্যে স্থান দিতেই হইবে।

শিক্ষা সংস্কার

দেশবিভাগের পর কংগ্রেস সরকার যখন বাংলার শাসনভার হাতে পাইলেন, তখন শিক্ষাসংস্কার তাঁহাদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচির মধ্যে ছিল। দেশবাসীর আশা ছিল, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যাহাই হউক, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, বাংলার চৌত্রিশ হাজার গ্রামের অধিবাসীর জন্য কংগ্রেস সরকার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করিবেন এবং গান্ধীজির পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার যথাযোগ্য পরীক্ষা ও প্রসার হইবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, দেশের সম্মুখে অন্য যেসব গুরু কাজ ছিল তাহা সম্পাদন করিতেই সরকারের সমগ্র শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয়িত হইতেছে, শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় নাই, অর্থ নাই।

১৯৪৭-৪৮ সনে বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশ্বাসী, গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অনেকগুলি শিক্ষাব্রতীর আহ্বানে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে একটি শিক্ষা-সম্মেলন আহ্বান করা হয়। তাহাতে আর কিছু না হউক, সংস্কারের আলোচনার সূত্রপাত করা হইয়াছিল।

সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা মেডিক্যাল পার্কের ধারে গীতাভবনে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে সংস্কারকামীদের এক অধিবেশন হয়। সেখানে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার, প্রিয়রঞ্জন সেন, নির্মলকুমার বসু, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা সুষমা সেনগুপ্ত প্রভৃতিকে লইয়া এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। সংস্কারের পরিকল্পনা ও তাহা কার্যে পরিণত করিবার প্রয়াস সার্থক হইলে আমরা সুখী হইব। কমিটির কার্যালয়, ৫৯ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

স্ত্রী-শিক্ষা কোন্ পথে ?

[শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী]

আমাদের এক পুরুষ আগে মেয়েদের ইস্কুলে যাওয়ার রেওয়াজ তেমন ছিল না, তবু আমরাও ছেলেবেলায় ইস্কুলে গেছি। তাই ইস্কুল এবং ইস্কুলের মেয়েদের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান আছে। আমার মনে হয়, এই সময়ই মেয়েদের জীবনের সব চেয়ে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ সময়, তা সে বস্তুনিষ্ঠই থাক আর পুরস্কার না-ই পাক। দুঃখের বিষয় বড় বয়সে সুখের সংসার সকলের ভাগ্যে জোটে না; আর হাজার সুখের হলেও, সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম ভাবনা চিন্তা লেগেই থাকে। তাই বালিকা বয়সে এই আরামের সময়টুকু, এই ফাঁক ছাড়বার অবসর থেকে কাউকে বঞ্চিত করা উচিত

নয়। ইস্কুলে লেখাপড়ার রেষারেষি, খেলাধূলার মেশামেশি, গুরুশিক্ষ ও সহপাঠী সম্বন্ধের যে মাধুর্য-রস আছে, বাড়ীতে তা পাওয়া যায় না। আবার বাড়ীতে মা-বাপ, ভাই বোন, আত্মীয়স্বজন পাড়া-পড়শীর কাছ থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, ইস্কুলে তা পাওয়া যায় না। তাই আমার মনে হয়, বাড়ী ও ইস্কুল দুটোরে মিলে তবে সম্পূর্ণ মানুষ গড়ে ওঠে।

আমাদের আগেকার যে সামাজিক নিয়ম ছিল, তাতে মেয়েদের ইস্কুলে যাওয়ার বড় একটা স্থান ছিল না। প্রথমত এত অল্প বয়সে বিয়ে হত যে, লেখাপড়া শেখবার সময়ই পাওয়া যেত না। আমার মাতৃদেবীকে ৮ বৎসর বয়সে গৌরীদান করা হয়েছিল, তার আগে দেশের পাঠশালায় তাঁর সামান্য হাতে খড়ি মাত্র হয়েছিল। তবে যে পরে এত সুশিক্ষিতা হয়েছিলেন, সে কেবল তাঁর নিজের চাষে এবং শ্বশুরবাড়ীর সাহায্যে। সকলের সে সৌভাগ্য হয় না, তাই বিয়ের আগেই সামান্যত লেখাপড়া প্রভৃতি সেরে ফেলা ভাল।

এখন তো আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়সের নিম্নসীমা ১৪ বৎসর করা হয়েছে। তাই শিক্ষার কিছু সময়ও পাওয়া গেছে। বড় মেয়েকে অলস ভাবে ঘরে বসিয়ে রাখার চেয়ে যে লেখাপড়া ও গৃহকর্ম শিল্পকর্মে ব্যাপৃত রাখা ঢের ভাল, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। দেশের অবস্থা অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ব্যবস্থা বদলাতে না পারলে জাতির উন্নতি হওয়া অসম্ভব। তখনকার কালে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত হয়ে পুরুষানুক্রমে এক গ্রামে বাসকালীন যে শিক্ষা প্রদত্ত ছিল, এখন বড় বড় সহরে থাকবার বা স্বামীর সঙ্গে কার্যোপলক্ষে দেশবিদেশে যাতায়াত করার দিনে যে সে শিক্ষার পরিবর্তন হওয়া দরকার, এতো বেশি করে বলাই বাহুল্য। আর শিক্ষিত ছেলেরাও তাই আজকাল শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করতে চায়। তাই অন্য কারণে না হলেও বিয়ের বাজারে বর বা কনের দাম বাড়াবার জন্যেও মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো দরকার হয়ে পড়েছে।

বাংলা দেশে বোধ হয় ৬০।৭০ বৎসর হলো আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে। তার মধ্যে সে বিষয়ে এত বলা হয়েছে ও করা হয়েছে যে এখনো তার পক্ষ নিয়ে ওকালতি করতে হয়, এইটেই আশ্চর্য। যাঁরা এতদিন পরেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অমনোযোগী বা বিরোধী, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি যে, খুব স্থূল ভাবে দেখলেও কি তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার কোনো সুবিধা দেখতে পান না? আর কিছু না হোক, বাড়ীতে পুরুষ মানুষের অনুপস্থিতিকালে একটা চিঠি বা টেলিগ্রাম এলে পড়তে পারা, আবশ্যক হলে দুই ছেত্রে চিঠি লিখতে পারা, ঘর করনার হিসাব ও ধোপার হিসাব রাখতে পারা, অবসরমত দুটো ভাল বই নিজে পড়া বা অপরকে প'ড়ে শোনাতে পারা, ছেলেদের পড়ার সাধ্যমত সাহায্য করতে পারা, এগুলির কি কোনই মূল্য নেই? স্বদেশে বিদেশে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তার খোঁজ খবর রেখে মন উদার করা, স্বামীপুত্রের আলোচনায় যোগ দিতে পারা, গতানুগতিকতা ছেড়ে গৃহ ও সমাজের সর্ববিধ উন্নতির চেষ্টায় যোগদান করা, এসব সুফলও তো স্বতঃসিদ্ধ। বিশেষত সামাজিক ক্ষেত্রে যত উচ্চস্তরে ওঠা যায়, ততই লেখাপড়ার কদর বাড়তে থাকে। বেয়ানীর স্ত্রীর যে শিক্ষা হলে চলে যায়, আজকালকার দিনে হাইকোর্টের জজের স্ত্রীর তার চেয়ে কিছু বেশি না হলে সমাজে চলা বড় মুস্কিল হয়। তাঁদের স্বামীদেরও বেগ পেতে হয়, বা ঘরে ঘরে মেম রেখে ক্ষতিপূরণ করতে হয়। বিয়েরূপ অনিশ্চিত দৈব ঘটনার উপর মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি-বিধি যখন এতদূর নির্ভর করে, তখন মা-বাপের উচিত, সাধ্যমত মেয়ের শিক্ষার একটা গোড়াপত্তন করে রাখা—যাতে ভবিষ্যতে আবশ্যকমত সেই মনের উপর শাখানি তুলতে পারা যায়।

আমাদের মেয়েদের বিবাহ-পূর্ব শিক্ষার কাল এত সঙ্কীর্ণ বলে, আমার মনে হয় ১৬ বৎসর বয়সকে ভদ্রসমাজের স্ত্রীশিক্ষার সাধারণ সীমারেখা বলে ধরে নিয়ে, ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের ও ছেলেদের একই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত; যথা—বাংলা, অঙ্ক, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি, যাতে এসব বিষয়ে বিভাগ আবশ্যকীয় প্রাথমিক জ্ঞানটুকু লাভ হয়। তারপর ১১ থেকে ১৬ অথবা বিবাহ-পূর্ব পর্যন্ত মেয়েদের সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যথা স্বাস্থ্যনীতি, শারীরবিজ্ঞান, রন্ধন, সেলাই, শিশুপালন, মিতব্যয়ী গৃহস্থালী, হিসাব ইত্যাদি। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনুরূপ তর্কের মধ্যে একদল লোককে বলতে শুনি যে, শিক্ষার দ্বারাই তাদের লেখানো উচিত, সুমাতা সুগৃহিণী হবার জন্য নয়; কারণ ছেলেরা সু-পিতা হবার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত হয় না। যাঁরা এ যুক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁরা ভুলে যান যে, পুরুষেরা কিছুদূর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা লাভ করে, পরে পেশা বা জীবনের কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন; তেমনি সাধারণত মেয়েদের জীবিকা বা জীবনের কাজ হচ্ছে ঘর সংসার ও ছেলে মানুষ করা; এবং সে কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্য তাদেরও সাধারণ শিক্ষাতে কতকগুলি বিশেষ শিক্ষা লাভ করা দরকার।

একটি বিদ্যামন্দির তাঁদের বিজ্ঞাপনে বলেছেন যে "আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের মূল উদ্দেশ্য শুধু কতকটা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করা নহে, বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে নিষ্ঠা, চরিত্র সংগঠন ও ভবিষ্যৎ গৃহিণীর সর্বপ্রকার সাংসারিক কার্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিয়া...আদর্শ গৃহিণী গড়িয়া তোলাই যথার্থ স্ত্রীশিক্ষার সার্থকতা। উপরন্তু আমাদের দেশের পরমুখাপেক্ষী অসহায়া নারীগণের সুশিক্ষার সহিত শিল্প ও কারুকার্যের দ্বারা আর্থিক উন্নতি লাভ শিক্ষা দেওয়া এই মন্দিরের অন্যতম উদ্দেশ্য।"

এই বিদ্যামন্দির যদি এই আদর্শে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করতে পারেন, তবে বাস্তবিকই তাঁরা বাঙালী সমাজের একটা মস্ত উপকার সাধন করবেন। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় এদেশে মেয়েদের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখতে পাই অতি শোচনীয়, এবং স্বাস্থ্য ভিন্ন আদর্শগৃহিণীর কর্তব্য সুসম্পন্ন করা অসম্ভব; চিরকগ্ন শরীর যে নিজের ও পরের কত কষ্টের কারণ তা বেশি করে বলা বাহুল্য। আজকাল খুব ছোট ছোট মেয়েদের চোখেও চশমা দেখে দেখে এমন খারাপ লাগে যে কি বলবো। আমাদের কালে যেন এমন ছিল না। আর কোন উপলক্ষে কোন স্কুলবাড়ী গেলে স্বাস্থ্য শ্রীর অভাব দেখে মন দমে যায়। ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকেও দৃষ্টি রেখেন আশা করি। তাক্তার না হয়েও বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে যথোচিত খাদ্য, খেলা ও খোলা বাতাসের উপর স্বাস্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে; এবং সব সময় যে টাকার উপরেই সুখাদ্য নির্ভর করে তা নয়, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা চাই। খুবের ভালমন্দ ব্যবস্থার উপর অবশ্য ইস্কুলের কোন হাত নেই, তবে এই ইস্কুলটি যে "প্রচুর বায়ু ও আলোক সমন্বিত" উন্মুক্ত স্থানে স্থাপিত, সেটি সুখের বিষয়।

আশা করি বিদ্যামন্দিরের কর্ত্রীদের অধ্যবসায় ও উৎসাহ সার্থক হবে, এবং এখান থেকে শিখে গিয়ে মেয়েরা এমন ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে যাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হবে, বিমুখ হবে না। যদি মেয়েরা কার্যত দেখাতে পারে যে অশিক্ষার চেয়ে সুশিক্ষার ফল ভালো, তবেই স্ত্রীশিক্ষার জিত হবে; শুধু উপদেশে কাজ হয় না, দৃষ্টান্ত চাই। আমি ত বরাবরই বলি যে, আমাদের শিক্ষিত মেয়েদের উপর এক মস্ত দায়িত্বের ভার রয়েছে, স্ত্রীশিক্ষার সম্মান তাদের বজায় রাখতে

হবে, একথা যেন সর্বদাই তাদের মনে থাকে। তবে এতদিন ছেলেদের সঙ্গে ঠিক সমান তাবের শিক্ষা শেষ পর্যন্ত তাদের দিয়ে আমরা বোধ হয় ভুল পথে গিয়েছি। সে ভুল সংশোধন করবার লক্ষণ চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। যার যে রকম ভবিষ্যৎ জীবন হওয়া সম্ভব, তাকে সেইরকম শিক্ষা দেওয়াই তো বুদ্ধির কাজ। আর অধিকাংশ মেয়েকে যে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও মা হতে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইস্কুলে ও কলেজে যদি সুগৃহিণী ও সুমাতা গড়ে তোলবার সহায়তা করে, তবেই সেই প্রতিষ্ঠানের জন্ম সার্থক হবে।*

* অপ্রকাশিত পুরাতন লেখা হইতে।

ছাত্র-পরিচয়

[শ্রীপ্রমথভূষণ ভট্টাচার্য]

বালকদের চিনিতে ও ভালবাসিতে আমার মত আর কোন শিক্ষক পারেন নাই—এই অহমিকা লইয়া ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জুন ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাদুড়িয়া লওন মিশনরি সোসাইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে বি. টি. শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে আসিল দশম শ্রেণীর মোসারেফ। মোসারেফ যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে, তখন বাদুড়িয়া স্কুলের শিক্ষকতা করিতে আসি। ক্রমশ সে আমার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠে। বাদুড়িয়া হইতে দেড়মাইল দূরে 'আঁধার মাণিক' গ্রামে তাহাদের বাস। আমার প্রয়োজনে কখনও সে এই দূরত্বকে গুরুত্ব দেয় নাই। প্রবাসে অরে শয্যাশায়ী, পাশে দেখিয়াছি মোসারেফ একাকী বসিয়া আছে। এইরূপে কতদিন সে অনাহারে আমার পাশে বসিয়া দিনাতিপাত করিয়াছে। সুখে দুঃখে সর্বদাই সে অযাচিতভাবে বন্ধুর ন্যায় আমাকে উপদেশ দিয়াছে, ছাত্র হিসাবে আজ্ঞাপালন করিয়াছে, আবার অসংখ্য বিপদে নিজে বিপন্ন বরণ করিয়াও আমাকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে।

কলিকাতায় আসিয়া ৯৪ নং বসা রোডস্থিত শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে পৌঁছাইতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হইল। মেসের মালী ছিল হরিদাস। সে আমাদের ঐ তারিখে মেসে থাকিতে দিতে রাজী হইল না। মোসারেফ এই বিপদে কিছুতেই আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। কথা ছিল আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া আসিবে। কিন্তু সে কিছু আনে নাই। সে হরিদাসের সহিত গল্প করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই জানিয়া লইল যে বৃদ্ধ হরিদাসের ইহজগতে কেহই নাই। তখন মোসারেফ আমার পরিচয় দিয়া হরিদাসকে বলিল যে, আমারও এই জগতে কেহই নাই। মোসারেফের বাক্যে হরিদাস আমাদিগকে মেসে থাকিতে দিতে রাজী হইল। সেই শেষ রজনীতে মোসারেফ এবং আমি এক বিছানায় শয়ন করিয়া কত কি কথা বলিলাম। আমাদের মনের রুদ্ধদ্বার যেন আপনা হইতেই খুলিয়া গেল। কোন এক অজানিত মুহূর্তে সে বলিল, "Sir, আপনি Class VII-এ আমাকে ভীষণভাবে প্রহার করেছিলেন। কিন্তু আমার কোন দোষ ছিল না—আমি ছিলাম নির্দোষ।" এই কথা বলিয়াই সে লজ্জিত হইল। আর শকিলেসের মত সেই কথা আমার বক্ষে পতিত হইয়া আমার অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল। এই সময় হইতেই আমি

বুঝিয়াছিলাম যে, শিক্ষকের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য বালকদের চিনিতে ও ভালবাসিতে শিক্ষা করা। এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম এবং এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করিবার মানসে Mental Hygiene and Child Guidance এই অতিরিক্ত বিষয়টি লইয়া বি. টি. পড়িতে আরম্ভ করিলাম। মাঝে মাঝে মোসায়েবের পত্র আমাকে এই বিষয়ে আরও সজাগ করিয়া দিতে লাগিল। নিম্নে মোসায়েবের দুই খানি পত্র আবশ্যকবোধে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

Baduria H. E. School.

6. 7. 48.

Sir,

আজকার আমার এই সামান্য পত্রে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সে দিন আমি নিরাপদে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আশা করি আপনি কুশলে আছেন। আপনাকে হারাইয়া আমি ও আপনার স্নেহের হরেন ঠিক সাথীহারা পাখীর ন্যায় আনন্দময় কুঞ্জে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি আমাদের মনে আনন্দ সঞ্চার করিবার জন্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আনন্দ পাওয়া দূরের কথা, এখন মনে হেন সব সময়ে দুঃখের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। ভগবান আমাদের মনে আবার যে কখনও আনন্দ দান করিবেন, তাহা জানি না। আমি জানি, এই রোয়াখে মানুষ যখন বিচরণ করিতে আসে তখন মনে কত আনন্দ নিয়ে আসে। কিন্তু সে আনন্দের সময়ে অনেক ভালবাসাও ফুটিয়া যায়। একটি যখন অপরগুলিকে ছাড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে এরূপ হইয়া থাকে। আর বেশি কিছু লিখিলাম না। সত্বর পত্রের উত্তর দিবেন ফুলের ঠিকানায়। আমি ও হরেন ভাল আছি। আমাদের বাড়ীতে সকলেই ভাল আছেন। আমাদের পরীক্ষা ১২-১ ৪৮ তারিখে আরম্ভ হইবে। আশীর্বাদ করিবেন যেন আমরা পাশ করিতে পারি। আপনার মাসীর কোন পত্র এখানে আসে নাই। ইতি—

আপনার হতভাগা

Md. Mosaroff Uddin Ahammad,

X.

(২)

জয়হিন্দ

আঁধারমাণিক

১২-২-৪৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার ভক্তিপূর্ণ নমস্কার আপনি গ্রহণ করিবেন। আজ বহুদিনের আশা আমার প্রায় সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইল। কারণ যে কি, তাহাও আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাক, আপনি আমাকে ও হরেনকে ভুলিয়া অন্য পথে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি আমাদের ভুলিলেও আমরা কিন্তু একটি দিনের জন্যও আপনার ছবি প্রাণ হইতে মুছিতে পারিব না। কারণ আমরা যে আপনার মায়ার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি। এর প্রমাণ বহু পাইয়াছেন। যখন রাত্রি ৩৪, তখন আমরা চিন্তা করি কখন আবার সূর্যোদয় হইবে। এই আশায় আমরা আপনার পানে চাহিয়া আছি। যাক, আর বেশি কিছু এই বিষয়ে লিখিলাম না। হরেন আমাকে অনেক কিছু বলিয়া থাকে। কিন্তু আমি তাহাকে আমার অন্য পথে টানিয়া লইয়া যাই। আমার Test-এর বিষয় বোধহয় আপনি হরেনের পত্রে পাইয়াছেন। ভগবানের অসীম কৃপায় ও আপনাদের আশীর্বাদে Test-এ allow হইয়াছি। আশীর্বাদ করিবেন যেন Matric পরীক্ষায় পাশ করি। অধিক আর কি লিখিব? আমাদের বাড়ীতে ও হরেনদের বাড়ীতে এক প্রকার ভাল আছে ও আছেন। আপনি কেমন আছেন? সত্বর পত্রের উত্তর দিয়া আমাদের চিন্তা দূর করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

মোসায়েব।

ঘোষাবেকের মত অনেক ছাত্রই শিক্ষক জীবনে আমি পাত করিয়াছি। আমার প্রত্যেক সহকর্মী শিক্ষকই এইরূপ অনেক ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারা মনস্তাত্ত্বিক না হওয়ায় হয়তো এই সকল ছাত্রের মনে অকারণ দুঃখ দিয়াছেন। ফলে ছাত্রেরা শিক্ষকের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস হারাইয়া শিক্ষককে নানা প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ, এমনকি, পথে আক্রমণ পর্যন্ত করিয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি। বি. টি. পড়িবার প্রাক্কালে শিক্ষকের বালক-চেনার ভুল সম্বন্ধে, আমি রীতিমত সজাগ হইয়া তাহা সংশোধন করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলাম। J. S. Ross এর বই-এর প্রথম পৃষ্ঠা পড়িয়াই আমার আনন্দ হইল। দেখিলাম, শিক্ষা দেওয়া ক্রিয়ার দুইটি কর্ম—একটি যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে সে, এবং অপরটি যাহা শিক্ষা দেওয়া যাইবে সেই বিষয়। যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে সে কিরূপ, কতটা বিষয়বস্তু গ্রহণ করিতে পারিবে, কি বিষয় শিক্ষা দিলে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং কখন মনের কোন অবস্থায় কিরূপ শিক্ষা দেওয়া চলিবে—এই সকল শিক্ষকের সর্বাগ্রে জানিতে হইবে। এই সকল বিষয় জানিবার জন্যই মনস্তত্ত্ব শিক্ষার প্রয়োজন। মনে করিলাম, বি. টি. পড়ার পর আর এইরূপ ভুল হইবে না। বি. টি. পড়া শেষ হইল, কিন্তু কি করিয়া ছাত্র চিনিতে হয় সেই শিক্ষাই যেন অসমাপ্ত থাকিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই বানীপুর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করিলাম। এই সময় কি করিয়া ছাত্র চিনিতে হয় তাহা হাতে কলমে শিক্ষা করিলাম। কি কি বিষয় লক্ষ্য করিলে ছাত্রকে মোটামুটি চেনা যায় নিম্নে তাহার খানিকটা লিপিবদ্ধ করিলাম—

বালক নিরীক্ষণ।

দেহ— বাহ্য / মা } দেখ কোথায়? কি করেন?

দেহের—বৈর্ঘ্য, ওজন, আকৃতি।

ব্যাধি—শারীরিক এবং মানসিক।

অনুরাগ—প্রশ্নের দ্বারা এবং স্বাভাবিক কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়া জানিতে হইবে।

সামাজিক আচরণ।

(১) সহপাঠীদের সহিত। } শ্রেণীর ভিতরে ও
(২) শিক্ষকদের সহিত। } বাহিরে।

(৩) বন্ধুদের সহিত।

(৪) আগন্তুকের সহিত।

সহজাতবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ

ক্রোধ, ভয়, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, কৌতূহল, আত্ম-প্রকাশ, হীনমন্যতা, আত্মানুবর্তিতা।

নিম্নমানুবর্তিতা।

অনুরাগ এবং বিরাগ।

নৈতিক উৎকর্ষ।

শিল্পকলায় দক্ষতা এবং সৌন্দর্য জ্ঞান।

স্মৃতি।

বুদ্ধি।

অঙ্কন, হাতের কাজ, কুটির শিল্প, ক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান, অনুরাগ ও দক্ষতা।

অস্বাভাবিক আচরণ।

শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, জ্ঞানলাভের ক্ষমতা ও অনুরাগ।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা | এর সম্মুখীন হওয়া,
ব্যবস্থা অবলম্বন করা,
কারণ নিরীক্ষণ করা।

উপরি উক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন আরও অনেক বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে যে সকল বিষয় সচরাচর লক্ষ্য করা সম্ভব তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। এই সকল বিষয় লক্ষ্য করা সম্ভব হইলেও লক্ষ্য করা তত সহজ নহে। শিশু-নিরীক্ষণ সময়, ধৈর্য ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ। শিশুর সহিত মিলিত হইয়া অথবা দূর হইতে শিশুর কার্যাবলী লক্ষ্য করিতে হয়। শিশুর মত নিজের মনটি তৈয়ারি করিতে না পারিলে, শিশুদের

ভালবাসিতে না পারিলে, শিক্ষকের পক্ষে শিশু-নিরীক্ষণ কঠিন হইবে। শিক্ষককে শিশুরাই ভাল চিনিতে পারে। কোন্ শিক্ষক তাহাদের ভালবাসেন, তাহা তাহারা যত ভাল বোঝে, এমন আর কেহই বুঝিতে পারে না। শিশুকে যে শিক্ষক অন্তর দিয়া ভালবাসেন শিশুরাও তাঁহাকে ভালবাসে এবং তাঁহার সহিত অকপটে মিশিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে শিশুদের সহিত মিশিলে শিশুরা মান্য করে না এবং কথা শোনে না। এই ধারণা ভুল। শিশু যাহাকে ভালবাসে তাহাকেই বিশ্বাস করে, এবং প্রাণপণে তাহার কথা অনুসারে কাজ করিবার চেষ্টা করে। যে শিক্ষক শিশুর ভালবাসা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আদর্শ শিক্ষক, তাঁহার নিকট পার্থিব ধন অতি তুচ্ছ, কোন ঐশ্বর্যের মোহেই তিনি শিক্ষাকার্য ত্যাগ করিতে পারেন না।

যে সকল শিক্ষক বলেন যে ছাত্রদের সহিত অধিক মেলামেশা করা ভাল নয়, তাঁহাদের কথাও বুঝিতে হইবে।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমার নিকট ভূতের গল্প শুনিতাম। রঘুনাথপুরে এক ভূতের ওঝা ছিলেন, তিনি গভীর রাত্রে এক দেশ হইতে অন্যদেশে যাতায়াত করিতেন। ভূতেরা তাঁহার পাল্কী বহন করিয়া লইয়া যাইত। তাঁহার সঙ্গে থাকিত একটি রক্ষাকবচ। একদিন তিনি কবচটি আনিতে ভুলিয়া যান। পথে আসিয়া কবচের কথা মনে পড়ায় তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠেন। তখনই ভূতেরা তাহা বুঝিতে পারিয়া পাল্কী নামাইয়া বলিল, 'গুরুমহাশয়, এইবার তো ছাড়িব না।' এই বলিয়া ওঝার ঘাড় ভাঙিয়া ভূতেরা চলিয়া গেল।* ভূতের গুরুমহাশয়ের একটি রক্ষাকবচ হইলেই চলে, কিন্তু ছাত্রদের গুরুমহাশয়ের পুস্তচরিত্র, বিষয় জ্ঞান এবং তেজস্বিতা —এই তিনটি কবচের প্রয়োজন। এই তিনটি কবচ থাকিলে, গুরুমহাশয় নির্ভয়ে ছাত্রদের সহিত মিশিতে পারেন। ছাত্রদিগকে কশাঘাত করিলেও তাহারা তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। কিন্তু কোন অসতর্ক মুহূর্তে এই তিনটির একটিরও যদি অভাব হয়, তবে গুরুমহাশয়ের অবস্থা অচল হইয়া উঠিবে।

শিক্ষকের পক্ষে ছাত্র নিরীক্ষণের সহজ উপায়, অভিভাবকদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা। এই কাজ পত্রাদির দ্বারা ভাল হয় না। শিক্ষকের ছাত্রদের বাড়ীতে গিয়া ছাত্রের মা-বাপের সহিত আলাপ করিতে হয়। ইহাতে যে কেবলমাত্র ছাত্র নিরীক্ষণের কাজই ভাল হয় তাহাই নহে, অধিকন্তু ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের সকল দিক দিয়াই উপকার হয়। আমি এই সকল কথা নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি। আমি বর্তমানে ২৪ পরগণা জিলার কোনও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্যে রত আছি, এইভাবে ছাত্র নিরীক্ষণ করিয়া পাঁচ মাসের ভিতরই আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। কয়েকটি দুষ্টপ্রকৃতির ছাত্রকে সৎপথে আনিতে এবং কয়েকজন ফেল করা হতাশ ছেলের মানসিক বল পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমার খুবই ভরসা হইতেছে যে সময়ে দেখিতে পারিব, একমাত্র ছাত্র নিরীক্ষণের দ্বারাই ছাত্রদের সর্বতোভাবে উন্নত করা সম্ভব।

শিশুর ব্যক্তিত্ব

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দে]

শিশুমন চিরন্তন রহস্য। অনাদি সৃষ্টির কোন গহন অন্ধকার হতে সুরু করে অনন্ত সৃষ্টির চির-আলোকময় ভুবনে এই শিশুর জয়যাত্রা। সৃজনের গোপনতম রহস্য, কঠিনতম তত্ত্ব এই শিশু। আমার সংসার মরুর চির-নন্দন-কানন, চির-বিরহ-সঙ্গীত এই শিশু। শিশু যখন তার মার কাছে তার সেই চিরদিনের প্রশ্ন জানায়:

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"

তখন মা কেমন করে সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন? কারণ এই শিশু-স্বপ্নলোকের রাজ্যে তিনিও শিশু। সত্যিই তখন মায়ের মন খুঁজে পায় না। এ অনন্ত রহস্য কে উদ্ঘাটন করবে? আসলে শিশু-তত্ত্ব তো সৃষ্টি-তত্ত্ব।

শিক্ষক যখন এই শিশুর সামনে এসে দাঁড়ান তখন তিনিও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান। তাঁর বিস্ময় মার বিস্ময় থেকে শতগুণ। কারণ বিদ্যালয়ে কত বিচিত্র ধরণের শিশু! প্রতিটি শিশু যেন একটি মুক্তন রাজ্য। শিক্ষক যদি ক্লাসে এসে মুখ গম্ভীর করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে যে শিশুরা একটু আগেই মুখর কলোল্লাসে সমস্ত বিদ্যালয়-ভবনটি চঞ্চল করে তুলেছিল, নিমেষে তাদের কি অস্বাভাবিক পরিবর্তন! যেন সমস্ত ক্লাসের ওপর একটা ঘন কালো মেঘ জমাট বেঁধে আছে। আবার যে মুহূর্তে শিক্ষকের মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখা দেয় তখনই মেঘ অপসারিত হয়ে ক্লাসটা আনন্দের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রত্যেকটি শিশুই এক একটি নতুন সৃষ্টি। প্রত্যেকেরই একটি স্বতন্ত্র ভাব আছে। কেহ চঞ্চল, কেহ শান্ত, কেহ মিশুক, কেহ একাকী নিজের মনগড়া রাজ্যে বাস করতে ভালবাসে, অথচ ক্লাসে যখন শিক্ষক প্রবেশ করলেন অমনি সমস্ত ক্লাসটি একটি নূতন রূপ গ্রহণ করল। চঞ্চলের চঞ্চলতা দূর হয়ে গেল। সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বাইরের প্রভাবকে স্বীকার করে নিল।

এখন প্রশ্ন ওঠে, বাহিরের প্রভাবকে সে স্বীকার করে কেন নেয়? এ প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষাতত্ত্বের মূলসূত্র এবং সেই সঙ্গে সভ্যতার আদি কারণ অনুসন্ধান করতে হয়। এই অনুসন্ধানের ভিত্তি মনোবিজ্ঞান।

পশু-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির একটি মস্ত বড় তফাৎ এই যে, পশু তার জন্মের সাথে যা নিয়ে আসে তাই তার শেষ সম্বল; তার বেশী কিছু আর সে গ্রহণ করতে পারে না। সেই জন্য পশু শাবক ও পশুর মধ্যে খুব বেশী একটা তফাৎ দেখা যায় না। দেহ গঠনের সাথে সাথে কিছু দিনের মধ্যে একটি পশুশাবক পূর্ণ পশুত্ব লাভ করে। কিন্তু মানুষের বেলায় তা হয় না। একটি মানব শিশু ও একটি পূর্ণ মানবের অনেক ব্যবধান। এই ব্যবধান, এই শূন্যতা পূর্ণ করাই শিক্ষার কাজ। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। আসলে কিন্তু এই শূন্য স্থান শিশু নিজেই পূর্ণ করে নেয়। সে শক্তি নিয়েই সে আসে। এ তার নিজস্ব মননশক্তি। এখানেই মানবশিশুর বিশেষত্ব। অবশ্য মজার ব্যাপার এই, সব শিশুই সমান শক্তি নিয়ে আসে না; কিছু তারতম্য থাকবেই। কয়েকটি একই বয়সের শিশুকে একই রকম পরিবেশে যদি রাখা যায় তবে দেখা যাবে এই পরিবেশ-সাম্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বতন্ত্র, অন্য-

নিরপেক্ষ রূপ নিচ্ছে। এইখানেই শিশুর ব্যক্তিত্বের ভ্রূণ।

প্রকৃতি ও পরিবেশের (Nature and nurture) পরস্পর ক্রিয়া ও ঘাত-প্রতিঘাতে শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

শিক্ষকের সব চেয়ে বড় দায়িত্ব এইখানে। আবার এইখানেই তার শক্তি ও সামর্থ্য দেখাবার সব চেয়ে বড় ক্ষেত্র। প্রত্যেকটি শিশুকে তার নিজস্ব ক্ষমতা, প্রবণতা অনুযায়ী যেমন গড়ে তুলতে হবে, আবার প্রত্যেকটি শিশুকে নূতন নূতন ক্ষমতা, নূতন নূতন প্রবণতার সন্ধানও দিতে হবে। এই বয়সের সবচেয়ে প্রভাবশীল ও সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশ শিক্ষকের হাতে। তিনি এই পরিবেশকে নিজের ইচ্ছামত পরিবর্তন করতে পারেন। একটি শিশু সব সময় চুপ করে বসে থাকতে ভালবাসে। এই চুপ করে বসে থাকার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি যদি দেখেন এর কারণ তার শরীরের অসুস্থতা, তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু যদি দেখেন, খেলার অথবা পড়ার নিজস্ব অপটুতাই এর আসল কারণ, তখন যাতে সে সবার সাথে চলতে পারে সে ব্যবস্থা তাঁর পক্ষে করা দরকার। দশজনের সাথে সমান তালে চলতে না পারলে শিশুর ব্যক্তিত্বে ভীষণ ঘা লাগে। এই ঘা তাকে চিরদিনের জন্য Back-bencher করে দিতে পারে যদি ঠিক সময়ে শিশুর শিক্ষক তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথের সন্ধান না দিতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের উচিত, শিশুটি যাতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে এমন একটি পরিবেশ রচনা করা।

পরিবেশ প্রতি মুহূর্তেই শিশুর উপরে দাবি জানাচ্ছে। এই পরিবেশের মধ্যে আছে জড় প্রকৃতি, পিতামাতা, বন্ধু, শিক্ষক, ভাই-বোন, দাস-দাসী এবং আরও অন্যান্য যারা শিশুর জগতের সাথে অল্প বিস্তর যুক্ত, এমনকি বাড়ীতে পোষা কুকুর বিড়াল পর্যন্ত। একটি বিড়াল-ছানা মাটিতে বারান্দার বৃষ্টিতে ভিজছে। শিশু যদি বলে, মা, দরজাটা খুলে দাও, ওকে ঘরে নিয়ে আসি, তখন মার উচিত, দরজাটা খুলে বিড়াল ছানাকে ঘরে আনতে দেওয়া। কারণ শিশুর মনে যে স্নেহ জেগে উঠেছে সেই স্নেহকে কাজে লাগাবার এবং রূপ দেবার সুযোগ দেওয়া দরকার। মা শিশুকে যদি বকুনি দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেন, তবে তার এই কোমল বৃত্তি হয়ত চিরদিনের মত ঠাণ্ডাই হয়ে গেল। বড় হয়ে এই ছেলেই যদি মার কথা না শোনে, যদি সে স্বেচ্ছাচারী হয়, তবে দোষ কার? শিশুর ব্যক্তিত্বের একটি অতি সুন্দর দিক গড়ে তুলবার অপূর্ব সুযোগ মা নিজেই হারিয়েছেন। এদিক দিয়ে মা শিক্ষক থেকেও বেশী সুযোগ পান। কিন্তু কথা এই, কয়জন মা ব্যক্তিত্ববিকাশের এই মাহেন্দ্রক্ষণগুলি কাজে লাগান? ছেলে তার সমবয়সী বন্ধুর সাথে মারামারি করে কাঁদতে কাঁদতে এসে মায়ের কাছে নালিশ জানাল। ক্রন্দনরত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়েই মার সমস্ত বিচারবুদ্ধি উবে গেল। ঝগড়ার কারণ অনুসন্ধান না করে তিনি পরের ছেলেটিকে আচ্ছা করে বকে দিলেন। এর ফল কি হল? শিশু মনে করে নিল, আমি যাই করি না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ মা তো আমাকে বকেন না। এই ভাবে অন্যায় প্রশ্রয় পেয়ে শিশুর চরিত্র বিকাশের সমস্ত ভিত্তিভূমিই নষ্ট হয়ে গেল। পরে শিক্ষক কি করবেন? তাঁর জন্য কোন্ মালমসলা অবশিষ্ট থাকল? শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটি এই ভাবে মায়ের অন্ধস্নেহ-প্রসূত অদূরদর্শিতায় নষ্ট হয়ে গেছে। ইংরাজিতে একটি কথা আছে, make hay while the Sun shines. কথাটি শিশুর মনোবিকাশ এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে যতটা খাটে, ততো বোধ হয় আর কোন ক্ষেত্রেই খাটে না। এই একটি স্বর্ণপ্রসূ মুহূর্তে যে কাজ হয়, একটি বছরে, এমন কি সমস্ত-জীবনেও সে কাজ আর হয় না।

তাই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সবচেয়ে

বেশী প্রয়োজন, একাধারে পিতামাতা ও অন্যদিকে শিক্ষকের প্রতি মুহূর্তের সজাগ দৃষ্টি। প্রতি মুহূর্তেই শিশুর উপর পরিবেশের ছাপ ও চাপ দুইই পড়ছে। কোনটি খুব বেশী রকম তার মনে দাগা কাটছে, কোনটি কিছু কম। আশে পাশের প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি কথা সে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। বড়রা যখন শিশুর সামনে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেন, তখন সব সময়েই কি তাঁরা মনে রাখেন, একটি শিশু তাঁদের প্রত্যেকটি কথা শুনছে, শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি কথা তার মনোজগতে ঢেউ তুলছে? সব সময়েই বড়রা একথা মনে রাখেন না। রাখলে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের যথেষ্ট সহায়তা হোত।

শিশুর মন গতিশীল। জন্ম মুহূর্ত হতেই এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগৎ তার কাছে অপূর্ব ও চিরমহত্তময়। এই রহস্যকে ভেদ করে এগিয়ে চলাই মনের ধর্ম। মনের খোরাক সে প্রতি মুহূর্তেই চায়। সুপথ্য পেলে মন সুস্থ হয়ে সবীর হয়ে সুন্দর রূপ নেবে। সুপথ্য না পেলে সে কুপথ্য নেবে এবং তার ফলে তার মনও অসুস্থ ও বিশ্রীরূপ নেবে এবং তার ফলাফল বাপ মা আত্মীয় স্বজন সমাজ রাষ্ট্র একে একে সবার উপরে ক্রিয়া করবে। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী উড্‌ওয়ার্থ শিশু ও তার পরিবেশের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতের একটি চমৎকার সূত্র আবিষ্কার করেছেন। সূত্রটি নিম্নরূপ :

W→O→W (জগৎ→শিশু→জগৎ)

W (পৃথিবী, world) O'র (organism, শিশু) উপরে ক্রিয়া করছে। আবার O উল্টে W'র উপরে ক্রিয়া করছে। অর্থাৎ জগৎ সব সময়েই তার বিচিত্র সৃষ্টি-উপকরণ নিয়ে শিশুর মনের উপর ঘা দিয়ে শিশুকে প্রতিনিয়ত সচেতন করে তুলছে ও শিশুর মনন শক্তি বিকাশের সহায়তা করছে। আবার অপরদিকে শিশু তার এই বাড়ন্ত মন নিয়ে জগৎকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে। এখানে জগৎ বলতে বস্তু-বিশ্ব ও ভাব-বিশ্ব দুইই বোঝায়। শিশু ও জগৎ দুজনের একজনও এক মুহূর্তের জন্য বসে নেই। জগতের অসংখ্য তরঙ্গ শিশুর মন-বেলাভূমিতে নিরন্তর আঘাত দিয়ে বলছে—

"উত্তিষ্ঠত"

শিশুও বসে নেই। তার অফুরন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে সেও এগিয়ে চলেছে মহা-অজানার সন্ধানে। সে জানতে চায়, বুঝতে চায়, ভাবতে চায়, পড়তে চায়, দেখতে চায় ভিতরে কি আছে। তাই সে দুরন্ত। এই গতিশীল মনের পটভূমিকায় শিশুকে বিচার করলে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম সোপান আমরা আবিষ্কার করতে পারি। "The individual needs and gets stimulation from the environment to wake him up and keep him active; without any stimulation he would lapse into a dormant state, surviving perhaps but not much more."

শিশু চায় পরিবেশ তাকে নূতন নূতন পথের সন্ধান, নূতন নূতন তথ্য, নূতন বস্তু, নূতন সত্য এনে দিক। আমরা দেখি, কোন একটি শিশু বই পড়তে চায় না, কিন্তু বই পড়তে চায়না বলে কি গল্প শুনতে নারাজ? সে কি বেড়াতে যেতে অনিচ্ছুক? সিনেমায় যেতে নারাজী? বই তার মনোমত রূপ নিয়ে আসুক, তখন সে বই পেয়ে খুবই খুশী হবে।

সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্ব সব সময়েই বিকাশোন্মুখ। He needs something to act upon as a squirrel needs trees to climb. প্রতিমুহূর্তে সে একটা না একটা কিছু নিয়েই আছে। ভিতরের কি যেন একটা শক্তি তাকে মুহূর্তের জন্য স্থির হতে দিচ্ছে না। মা বলেন, আমার ছেলে বড় অস্থির। অস্থির পৃথিবীর কোন্ ছেলে নয়? এই অস্থিরতা যে তার ভিতরকার শক্তি। ভিতরকার বাষ্পের চাপে কেটলির মুখটিও এমনি

যুগযুগান্তর ধরে অধিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। সে অধিবাসীর কারণ দেখেছিলেন জেমস ওয়াট। আমাদের এই দৃষ্টি নিয়েই শিশুকে দেখতে হবে। শিশু তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সবচেয়ে বড় সহায়ক এই আভ্যন্তরীন শক্তি নিয়ে সব সময়েই প্রস্তুত রয়েছে। শিক্ষক তাকে দেবেন পথের সন্ধান (out-let) অথবা সুযোগ (opportunity)। এক্ষেত্রে যিনিই হাকে এই সন্ধান ও সুযোগ দেবেন তিনিই তার শিক্ষক—পিতামাতা, ভাইবোন, বন্ধু, ধাত্রীমাতা, শিক্ষক, সকলেই এখানে হয় প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষ ভাবে শিক্ষকের কাজ করছেন। বিচিত্র ক্ষেত্র থেকে পাওয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শিশু একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলছে। এই ভাবেই চলেছে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

শিশুশিক্ষা

[৺পূর্ণিমা বসাক]

আমরা নানাভাবে শিশুদিগকে নৈতিক শিক্ষা দিতে চাই; তাহার মধ্যে সত্যবাদিতার স্থান প্রধানতম হওয়া উচিত।

কেবল বাক্য সত্য নয়, কিন্তু চিন্তাও সত্য হওয়া দরকার। সত্য চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। জানিয়া মিথ্যা কথা বলা অপেক্ষা আত্মপ্রতারণা করিয়া নিজেকে সাধিক ও সত্যবাদী বলিয়া কল্পনা করা আরও দোষের।

সাধারণতঃ ভয় হইতে অসত্যের উদ্ভব। যে শিশু শৈশব হইতে এমনভাবে লালিতপালিত হইয়াছে, যাহাতে তাহার ভয় পাইবার কখনও প্রয়োজন হয় না, সে সাধারণতঃ সত্যবাদী হয়। মিথ্যা বলিবার বা মিথ্যা আচরণ করিবার কথা তাহার মনে আসে না। যে শিশু শৈশব হইতে ভাল ও সুন্দর ব্যবহার পাইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার চোখের দৃষ্টি সরল হয় এবং তাহার আচরণ নির্ভীক হয়। কিন্তু যে শিশু সর্বদা তিরস্কৃত হয়, পদে পদে যাহার দোষ ধরা হয়, সে সর্বদা কড়া শাসনের মধ্যে ভয়ে ভয়ে থাকে, "এই বুঝি কি অপরাধ হইল, কি দোষ করিয়া ফেলিলাম" এই ভয়ে সে শিশু কখনও স্বাভাবিকভাবে চলিতে পারে না। প্রথমে কোন শিশুরই স্বাভাবিকভাবে মনে আসে না যে, মিথ্যা কথা বলা যাইতে পারে। মিথ্যা কথা যে বলা যায়, তাহা শিশু ক্রমে আবিষ্কার করে। পিতা মাতা এবং বাড়ীর অন্যান্য বড়দের নিকট হইতে, তাঁহাদের নানারূপ আচরণ হইতে এবং শাসনের ভয় হইতে শিশু ক্রমশ মিথ্যা কথা বলিতে ও মিথ্যা আচরণ করিতে শিখে। শিশু অনেক সময় দেখে যে, সত্য কথা বলা তাহার পক্ষে বিপজ্জনক; তখন সে মিথ্যা বলে।

আমরা যদি শিশুর পারিপার্শ্বিক হইতে ঐ সকল দোষ দূর করিতে পারি, তবে শিশু কখনই মিথ্যা বলিবে না।

শিশুদের স্মৃতি খুবই ভ্রমপূর্ণ—এতদূর ভ্রমপূর্ণ যে আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। আমরা যখন মনে করি, শিশু বেশ বুঝিতে শিখিয়াছে ও ঠিক উত্তর দিতে পারে, তখন হয়তো সে জানেই না যে, কোন প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হয়। তাহাদের সময়জ্ঞান বড়ই অস্পষ্ট। চার বৎসর পর্যন্ত শিশুর সময়জ্ঞান থাকে না। এক দিন আগে কি এক সপ্তাহ আগে, এক দিন পূর্বে কি কয়েক ঘণ্টা পূর্বে, এ-পার্থক্য সে করিতে পারে না। তাহার কাছে সকল রকম অতীতই "গত কাল"-এ পরিণত হয়। অনেক সময় তাহারা কিউত্তর দিতে হইবে তাহা জানে না; বড়দের জিজ্ঞাসা করিবার ধরন দেখিয়া সেই ভাবে "হাঁ" বা "না" বলে। একটি পাঁচ

বৎসরের শিশু একটি কাচের বাটি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে—তাহাকে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন "খুকী, তুমি বাটি ভাঙ নাই?" সে বলিল, "না"। তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এটি ভাঙিয়াছ?" সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "হাঁ, ভাঙিয়াছি।" এখানে সে মিথ্যা বলিল, এ-কথা মনে করা ভুল। এই বয়স পর্যন্ত শিশুর সত্যমিথ্যা কোনও জ্ঞানই হয় না। পাঁচ সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু যে-সব গল্প শোনে, তাহা কল্পনা করে এবং নিজেকে তাহার মধ্যে প্রধান নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়া আনন্দ পায়। চার-পাঁচ বৎসরের অনেক শিশুকেই এইরূপ নানা কাল্পনিক কথা বলিতে শোনা যায়—যথা, "আমাদের একটা হাতী আছে।" "রাত্রিতে রোজ বাঘ আসে, আমি তার সঙ্গে খেলা করি" "আমি একটা বাঘ মেরেছি, আমার দাদাও একটা বড় বাঘ মেরেছে"; "এক মস্ত দৈত্য এসেছিল, আমি তাকে মেরে ফেললাম" ইত্যাদি। এইরূপ কোনও উক্তিই সে মিথ্যা বলিয়া মনে করে না। তাহাদের এই সকল কথাকে মিথ্যা মনে করাও ভুল। একটি পাঁচ বৎসরের শিশু একবার তাহার পিতার সঙ্গে কোনও স্বাস্থ্যনিবাসে কিছুদিনের জন্য থাকিতে গিয়াছিল। একদিন তাহার পিতা যখন বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সে তখন ভৃত্যদের কাছে বিষণ্ণ-মুখে বর্ণনা করিল, "বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, আমার মা মারা গেছেন।" সুন্দর শিশুটির এই কথায় উপস্থিত সকলেই তাহাকে আদর করিল, তার দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল। পরে তাহার পিতা ফিরিলে তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি তো অবাক। তখন সকলেই ভাবিল, "এইটুকু ছেলে কি মিথ্যাবাদী! এই বয়সেই এমন মিথ্যা বলিতে শিখিয়াছে।" কিন্তু এ যে আদৌ মিথ্যা নয়, কল্পনাপ্রিয় শিশু কল্পনা করিয়া আনন্দ পাইল, কেহই তাহা বুঝিল না।

শিশু অনেক সময় এইরূপ করিয়া অনেক কিছু বলে, যাহা একেবারেই সত্য নয়, কিন্তু প্রতারণা করিয়া মিথ্যা বলিবার অভিসন্ধিও সেখানে আদৌ নাই।

কোন্ সময় শিশু প্রতারণা করিয়া মিথ্যা বলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সন্তানকে মিথ্যা কথা বলিতে বা মিথ্যা আচরণ করিতে দেখিলে পিতামাতার তাহাকে শাসন করিবার পূর্বে নিজেদের দিকে ভাল করিয়া দেখা উচিত। শিশুর পারিপার্শ্বিকে যে সব দোষ আছে, তাহা দূর করা প্রয়োজন, এবং শান্ত মৃদুভাবে সুবিবেচনার সহিত শিশুকে মিথ্যা বলার কুফল বুঝাইয়া দিতে হইবে। অথবা কড়া শাসনে তাহা বাড়িয়া যায় এবং পরে আবার মিথ্যা বলিতে পারে।

আমাদের সন্তানদের যদি আমরা সত্যবাদী করিয়া তুলিতে চাই, তবে আমাদের নিজেদের ব্যবহার ঠিক সেই রকম হওয়া দরকার। যে পিতামাতা সন্তানকে শিক্ষা দেন যে, 'মিথ্যা বলা অন্যায়,' অথচ নিজেরা মিথ্যা বলিয়া থাকেন, বা মিথ্যা আচরণ করিয়া থাকেন, নিজেদের সন্তানের উপর তাঁহাদের কোন রকম নৈতিক প্রভাব থাকিতে পারে না। অনেক পিতামাতাই চিন্তামাত্রও করেন না যে তাঁহাদের কার্যকলাপের প্রতি সন্তানেরা কিরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। যে-সব দোষত্রুটি পিতামাতার নিজের মধ্যে আছে বলিয়া তাঁহারাও হয়তো জানেন না, সন্তানের দৃষ্টিতে সে-সব ধরা পড়ে। এই কারণে পিতামাতা অনেক সময় যখন সন্তানদের সৎ উপদেশ, নীতিপূর্ণ উপদেশ দেন, সন্তান সে সকলের কোনও মূল্য দেয় না। যে-সব পিতামাতার মধ্যে ক্রোধ বেশি আছে, অবাধ্যতা, অন্যায় স্নেহ আছে, যাঁহারা পরস্পরের প্রতি অশ্রিয় ব্যবহার করেন, যাঁহাদের মধ্যে ঈর্ষা আছে, যাঁহারা নিজেরা অনেক সময় মিথ্যা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ সন্তানদের মধ্যে ঐ সকল দোষশূন্যতা কি করিয়া

আশা করিতে পারেন? নিজের সন্তানের কাছে নির্দোষ সাধু বলিয়া নিজেকে দেখানো কখনও উচিত নয়; তাহাতে সন্তান কখনও বিশ্বাস করে না। সে প্রতারণা সন্তানের নিকট ধরা পড়ে; সন্তানের শ্রদ্ধাও চলিয়া যায়।

দৈনন্দিন জীবনে কত প্রকারে আমরা মিথ্যা বলিয়া থাকি তাহার দুই-একটি উদাহরণ দিই :— এক জন লোক আসিয়া কিছু টাকা ধার চাহিল, পিতা বা মাতা বলিলেন, "হাতে নাই, দিতে পারব না।" শিশু তৎক্ষণাৎ বলিল, "কেন বাবা, তুমি যে এই মাত্র বাক্স খুলেছিলে, আমি দেখলাম তোমার বাক্সে টাকা আছে।" দুষ্ট পিতা বা মাতা হয়তো কোথাও যাইতে চাহিতেছেন না, নিজ সন্তানকেই বলিলেন, "অমুককে বল গিয়ে যে আমার শরীর ভাল নেই আজ, তাই আজ আর যেতে পারলাম না।" এই ধরনের দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যে বিরল নহে। "ফের যদি এ রকম কর তো মেরে হাড় ভেঙে দেব," "এমন ভীষণ মারব যে বেঁধবে মজা", "এ রকম দোষ করলে মেরে খুন করে ফেলব"—এই ধরনের অনেক কথা অনেক সময় অনেক পিতামাতা সন্তানকে বলিয়া থাকেন, অথচ কাজে সে-রকম কিছুই করেন না। সহজেই ঐ সকলের অসারত্ব সন্তানের নিকটে ধরা পড়িয়া যায়, পিতামাতার কথার মূল্য শিশুর কাছে আর থাকে না, এবং ক্রমশ তাঁহাদের উপর হইতে সন্তানের শ্রদ্ধা চলিয়া যায়। অনেক পিতামাতা মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া বা মিথ্যা ভয় দেখাইয়া শিশুদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লন; যেমন, "লক্ষ্মী, সোনা, এই দুধটুকু খেয়ে নাও, তার পরে গাড়ী আসবে, আমরা সব বেড়াতে যাব", অথবা "এই, দুষ্টুমি করছ, পুলিশ ডাকি, ধরে নিয়ে যাবে।" শীঘ্রই সন্তান এই সব ছলনা বুঝিতে পারে এবং পিতামাতার কথায় ক্রমশ আর আস্থা রাখিতে পারে না; এমন কি, এই কারণে ক্রমশ তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া উঠে।

বেশ ভাল রকম কারণ না থাকিলে কোনও কাজে শিশুকে কখনও জোর করিতে নাই। যদি কোনও বিষয়ে জোর করা হয়, তবে শেষ পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে সে-কাজ আদায় করিয়া লওয়া উচিত। তবেই শিশু বাধ্যতা শেখে। কোনও শাস্তি দিব বলিয়া যদি বলা হয়, তা যাহাই হউক না কেন, শেষ অবধি সে-শাস্তি দিতে হইবে। এইজন্য বেশ ভাল রকম বাস্তবিক কারণ না থাকিলে শিশুকে কিছু করিবার জন্য জোর করা উচিত নয়।

শিশু নানা রকম প্রশ্ন করিয়া থাকে। পিতামাতা বা অপরে অনেক সময় এত প্রশ্ন সামলাইয়া উঠিতে পারেন না, বিরক্ত হন। অনেক সময় শিশুদের প্রশ্নে অসুবিধায়ও পড়িতে হয়। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, যতদূর পারা যায় তাহাদের প্রশ্নের সত্য উত্তর দিতে হইবে। "এ তুমি বুঝবে না", এই বলিয়া এড়াইয়া যাওয়া ঠিক নয়। শিশু আনন্দ পায়, এমন করিয়া ভাল করিয়া তাহার সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার। কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয়েই কেবল বলা যাইতে পারে যে, "বড় হইলে বুঝিবে।" তাও যতটা পারা যায়, সরল করিয়া বলা উচিত। অন্য সব বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর যে বয়সটা বোঝে তাহা তো বলা উচিত, বরং যতটা বোঝে তার চেয়ে একটু বেশি বলাই ভাল, কিন্তু কম বলা উচিত নয়। যেটুকু বুঝিল না, তাহাতে তাহার কৌতূহলের উদ্রেক হইবে এবং ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা বাড়িবে। শিশুদের সঙ্গে সত্য ব্যবহার করিলে, তাহাদের সম্মুখে সত্য আচরণ করিলে ও সত্য কথা বলিলে তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করা যায়। সাধারণত শিশুরা মনে করে "বড়রা অনেক জানে" এবং বড়দের কথার উপর তাহাদের খুব বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে নাই।

শিশুকে নির্ভীক করিয়া মানুষ করিতে হইবে, নির্ভীকতা ব্যতীত সত্য থাকিতে পারে না।

আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদের সন্তান সহজ, সরল হউক, তাহারা আত্মসম্মানজ্ঞান থাকুক। যেখানে মিথ্যা, সেখানে ঐ সকল গুণ থাকিতে পারে না।

আমাদের সন্তানকে আমরা যেন চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে সত্যের পথ অবলম্বন করিতে শিখাইতে পারি, নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়াও সত্যকে আশ্রয় করিতে আমরা যেন তাহাদের শিখাইতে পারি, তাহারা যেন আমাদের নিকট হইতে এই শিক্ষা পাইতে পারে যে পৃথিবীর সকল সম্পদ হইতেই সত্য শ্রেষ্ঠ ধন।

[তত্ত্ব-কৌমুদী, ১লা আষাঢ় ১৮৬২ শক হইতে পুনর্মুদ্রিত]

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণস্তৎ কল্পিত্ প্রপদ্যিং তাত গচ্ছতি

৯ম বর্ষ | আষাঢ় ১৩৫৮ | ৮ম সংখ্যা

আলোচনা

জনশিক্ষা শিক্ষণ কেন্দ্র

বিগত ১৫ই হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত দেড়মাসের জন্য বাণীপুরে একটি জনশিক্ষা শিবির খোলা হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষণ শিক্ষা বিভালয় ও মহাবিভালয় বাণীপুরে অবস্থিত। এই শিবিরে পশ্চিম বাংলার প্রায় দুই শত ছাত্র ও ছাত্রী যোগ দিয়াছিলেন। শিক্ষার্থীরা মাসিক ৩০৲ টাকা ভাতা ও ২০৲ টাকা ভ্রমণ খরচ হিসাবে পাইয়াছেন। বিভালয় ও মহাবিভালয়ের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ইহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। সমবেত জীবন যাপন করা, জনশিক্ষা প্রসারের জন্য প্রস্তুতি, সমবায়ী মনোবৃত্তির সৃষ্টি করা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বৃত্তির অনুশীলন ইত্যাদি ছিল কর্মসূচীর মধ্যে।

সকালে ৪॥ হইতে দিনের কাজ আরম্ভ হইত। ছাত্রাবাস, রাস্তা, নর্দমা, পায়খানা, খেলার মাঠ ইত্যাদি পরিষ্কার করা, বাগানের কাজ করা, জঙ্গল কাটা, যাতায়াত তৈরি করা প্রভৃতি সাফাইয়ের কাজ প্রতিদিনের অবশ্য করণীয় ছিল। তালপাতার বাগ ও চাটাই বোনা, চামড়ার কাজ, ছবি আঁকা, প্রাচীর পত্র লেখা প্রভৃতি শিল্পকাজের কিছু কিছুও শেখান হইয়াছে। সকালে ও বিকালে নিয়মিত ক্লাস হইত। মহাবিভালয়ের অধ্যাপকগণ ছাড়া বাহিরেরও কেহ কেহ ঐ শিবিরে নানা বিষয়ের পাঠ দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন ও শরীর শিক্ষাবিদ্ শ্রীমতী লীলা রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

শিবিরবাসীদের সমস্ত কাজ বিশ্লেষণই করিতে হইয়াছে। সমবায়ী জীবনের উপযোগী বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য প্রধান মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী ইত্যাদি নির্বাচন করা হইয়াছিল। বিভিন্ন মন্ত্রীরা কর্তৃপক্ষের সাহায্য লইয়া বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে পরিচয় ও তাহার সমাধানের পথ কি, সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। সপ্তাহান্তে কবি মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আবৃত্তি, গান, নাটক রচনা ও অভিনয়, হাস্যকৌতুক ও পল্লীগীত ইত্যাদির দ্বারা গ্রামের জীবন সরস ও সুন্দর করিয়া তোলার শিক্ষা দেওয়া হইত। গ্রামের অন্যতম প্রধান অভাব স্বাস্থ্য-চর্চার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এই জনশিক্ষা কর্মীদের সচেতন

করিয়া তোলার জন্য প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় ও শিক্ষামূলক ছায়াছবি দেখান হইত। গ্রাম সংগঠনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য পাশের গ্রাম হীরাপুরে ইহারা মাঝে মাঝে গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ঐ গ্রামটির সংগঠন প্রচেষ্টার সাফল্যের কথা উল্লেখ-যোগ্য। প্রাণবান কর্মী থাকিলে কর্ম এমনই সাবলীল-গতিতে আপনার পথ আপনি করিয়া লয়।

গেল মাসের এই শিক্ষায় সেবে শিক্ষাব্রতিব শ্রীগীরেন্দ্রমোহন সেনের পৌরোহিত্যে একটি সম্বর্ধনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জনশিক্ষকগণের উদ্যোগে ছোটখাটো একটি আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। সম্বর্ধনা উৎসবে শ্রীযুক্ত সেন অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের জনশিক্ষার অবস্থার তুলনা করিয়া বলেন যে, এই বিভিন্ন শিক্ষাব্রতিদের প্রশংসনীয় মনোভাব ও কর্মপ্রণালী দেখিয়া তাঁহার আশা হয় যে অন্যান্য স্বাধীন দেশের মতই এদেশের জনশিক্ষার কাজ দ্রুতগতিতে অবাধে চলিবে।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

বিগত ২২শে জুলাই ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকদিগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, যদিও প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বিশেষ বাড়ান সম্ভব হয় নাই, তবু গত কয়েক বৎসরে রাষ্ট্রীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার খাতে মোটা টাকা খরচ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, দেশের অধিদার, ব্যবসায়ী ও ধনিক সম্প্রদায় গ্রাম ছাড়িয়া সহরে চলিয়া আসেন। তাঁহারা যদি গ্রাম ও গ্রামবাসীকে ভালবাসিয়া গ্রামের বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য কিছু কিছু অর্থব্যয় করিতেন তবে অনেক খানি সুরাহা হইত। সকল বিষয়েই সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়া অনুচিত।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, গান্ধীজি প্রকৃত কাজের লোক ছিলেন, তিনি দেশের প্রয়োজন বুঝিয়াই বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন স্বাধীনতা পরিশ্রমশীল আত্মবলে বলীয়ান একটি জাতি গড়িয়া তুলিতে। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে তাঁহার আদর্শে চালিয়া সাজাইতে হইবে। শিশুদের আমরা সেই শিক্ষাই দিব যে শিক্ষায় তাহারা সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হইবে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা মানিয়া চলার প্রবৃত্তি, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য চাই আবশ্যিক ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার।

প্রাথমিক শিক্ষকের সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, শিক্ষকের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব কম নয়, কারণ তাঁহাদের হাতেই যে সন্তানের চরিত্র ও চিত্ত গঠনের ভার। বাংলা দেশের শিক্ষকদের ত্যাগের তুলনা হয় না, এখন রাষ্ট্র ও জনসাধারণ দুইয়েরই শিক্ষকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মানের দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য।

এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অনুরূপ একটি প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড গঠিত হউক, সেই বোর্ডের এক তৃতীয়াংশ সভ্য প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্য হইতে নির্বাচন করা হইবে। এই সম্মেলনের মতে শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষককে ৭০৲-৪-১০০৲ হারে এবং অন্য শিক্ষকগণকে ৬০৲-৪-১০০৲ হারে বেতন দেওয়া হউক। মাগগি-ভাতা অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় হইবে। এই সম্মেলন আগামী জানুয়ারির মধ্যে বেতন ও মাসিক ভাতার এই পরিবর্তনের দাবী করেন।

শিক্ষাব্রতীর সম্মান

অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌষ

গ্র্যাজুয়েট কলা বিভাগে সংসদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। আমরা এই নির্বাচনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

তিনি শীঘ্রই পূর্বএশিয়া সম্পর্কে বিদ্যাদান করিবার জন্য আমেরিকা যাত্রা করিবেন। বিদেশে ভারতীয়দের, বিশেষ ভাবে বাঙালী অধ্যাপকের এই সম্মানে লাভ আমাদের সকলেরই পক্ষে গৌরবের কথা। তাঁহার যাত্রাপথ সুগম হউক, কর্মক্ষেত্রে তিনি প্রভূত যশ অর্জন করুন। তাঁহার সাধনার ফলে তাঁহার নিজ বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধ হউক, ইহাই তাঁহার প্রতি আমাদের অভিনন্দনবাণী।

ছাত্রদের অনশন ধর্মঘট

বৈশাখের শিক্ষায় ছাত্রদের অনশন সম্পর্কে 'শিক্ষা'র সম্পাদকীয় আলোচনা পাঠ করিয়া পাঠকদের মধ্যে কেহ কেহ অসন্তোষ বোধ করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে একখানি পত্রও পাইয়াছি। সেজন্য আলোচনাটি সকলকে আর একবার শান্তিতে অনুরোধ করি।

যুক্তিকে বিসর্জন দিয়া চলার পরামর্শ কেহই দিতে পারে না। গুরুশিষ্য, শিক্ষকছাত্র, পিতাপুত্র প্রভৃতি সম্বন্ধের মধ্যে যে হৃদয়ের সম্পর্ক আছে তাহারই বলে ছোট যখন পরিস্থিতি সহীন করিয়া তোলে, বড়কে তখন অনেক সময় যুক্তির পথ ছাড়িয়া চলিতে হয়। সুতরাং ঐরূপ অবস্থা ঘটিবার আগেই যেন কর্তৃপক্ষ সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিষয়টির মীমাংসা করিয়া ফেলেন ইহাই ছিল আমাদের বক্তব্য।

'কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির অভাব, এই ধারণা লইয়া আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি', ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ছেলেদের আবদারেরও একটা সীমা আছে, ইহাও খাঁটি কথা। কিন্তু আজ দেশের সর্বত্র এই যে ছাত্র সম্প্রদায়ের শিক্ষা, আইন এবং শৃঙ্খলা মানিয়া চলার অপ্রবৃত্তি, কর্তৃপক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব এইগুলি তো আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়। আজ যখন সমগ্র দেশকে ভাঙিয়া গড়িতে হইবে তখন এই ছাত্র সম্প্রদায়ের সংহত শক্তি কি আমাদের উপেক্ষার বিষয়? কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধ হস্তে অবিনয় ও ঔদ্ধত্য, শৈথিল্য ও ফাঁকি দিয়া কাজ আদায় করার প্রবৃত্তি দমন করিয়া ছাত্রদের সুসংবদ্ধ করিতে হইবে। আবার অপর দিকে, যে প্রভাব ভাব থাকিলে ছাত্রদের মনে শুভবুদ্ধি আপনি জাগ্রত হইবে তাহার জন্য কর্তৃপক্ষকেও কি আত্ম-বিশ্লেষণ করিতে হইবে না?

উড়িষ্যায় দেখিতেছি ছাত্রদের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ; কর্তৃপক্ষকে কলের বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে। এই সব দেখিলে যে বিষয়টি প্রথমে সকলের চোখে ধরা পড়ে তাহা হইতেছে, ছাত্র সমাজ কর্তৃপক্ষের বিধি বিধান, বিচার বিবেচনার প্রতি আস্থা হারাইতে বসিয়াছে। অথচ ইহা তো তরুণের ধর্ম নয়।

সমাজের ভিতর কোথাও কি গলদ ঢুকিয়াছে, যাহার জন্য এই বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা বর্তমানে প্রতিনিয়তই আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা সকলেরই তলাইয়া ভাবিয়া দেখা উচিত। শৃঙ্খলা যেন শৃঙ্খল হইয়া না বসে, সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট ইহাই আমাদের অনুরোধ। কিন্তু তো কোনও পক্ষেরই থাকা উচিত নয়।

বধিরদের শিক্ষা বিষয়ে উচ্চ সম্মান লাভ

ওয়াশিংটনের গলদেৎ কলেজ কলিকাতার মূক বধির বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভারতীয় বধির শিক্ষক সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত এম. এন ব্যানার্জিকে, ভারতের বধিরদের জন্য তাঁহার আজীবন সেবার কথা বিবেচনা করিয়া শিক্ষা বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্পণ করিয়াছেন। গলদেৎ কলেজ পৃথিবীতে বধিরদের উচ্চ শিক্ষালাভের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

এশিয়ার অধ্যাপক ব্যানার্জিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন।

শিক্ষামন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণ

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে আট সপ্তাহ কাটাইয়া দিল্লী ফিরিয়াছেন।

প্যারিসের রাষ্ট্রপুঞ্জ শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তরের যুগ্ম উপদেষ্টা জনাব হুমায়ুন কবীর এই ভ্রমণকালে মৌলানা আজাদের সঙ্গে ছিলেন। ইহারা বিভিন্ন দেশের নিকট ভারতের শুভ ইচ্ছার বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

হীনতা বোধ

[শ্রীঅহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য]

(১)

রামবাবুর ছেলেটি কেমন সপ্রতিভ ভাবে চলে, সেদিন আপনার সামনেই ওদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল এবং আর একজন ভদ্রলোক তাকে কত কি প্রশ্ন করলেন, সে একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে কেমন সুন্দর জবাব দিল! ক্লাসের মনিটার সেইজন্য তাকে করা হয়েছে। সকল কাজেই দেখি, সে সর্দারি করে বেড়াচ্ছে, আর ক্লাসের ছেলেরা তার সর্দারি মেনে নিচ্ছে। আর ওই দেখুন না, শ্যামবাবুর ছেলেকে! যেমনই পড়াশুনায় ভাল, আচরণে নম্র, কিন্তু কথা কইতে গেলেই কি রকম ঘেমে কেসে অস্থির হয়, অত্যন্ত মুখচোরা ও লাজুক—আর তার জন্য কি পরীক্ষা, কি খেলার মাঠ কোথাও কিছু করতে পারে না। আর তার জন্য ছেলেটা মার যতুনি খেয়ে অস্থির হয়। ক্রমাগত মার যতুনি খেয়ে খেয়ে তার একটা হীনতাবোধ জন্মে গেছে। তার ধারণা, তার আর কিছু হবে না। এই ধারণা যদি ছেলেবেলাতেই না সারানো যায়, ভবিষ্যতে তার সত্যি কিছু হবে না।

(২)

হীনতার ভাব অল্প-বিস্তর মানুষ মাত্রেরই থাকে, লক্ষ্য করে দেখবেন। তবে একটা মাত্রা পর্যন্ত সেটা স্বাভাবিক, সেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটি হয়ে ওঠে মানসিক রোগ। নিজেকে এই ছোট ভাবা আসে কোথা থেকে? এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে—রোগ আমরা চিনি কিন্তু কেউ দিতে পারেন নি। অনেক সময় দেখা গেছে শারীরিক ত্রুটি বা বিকলাঙ্গতার জন্য এই ভাব জন্মায়। বিকলাঙ্গতা বা ঐ জাতীয় কোন দোষ থাকলে মনের উপর তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। খঞ্জ, কুব্জ, বামন, মূক, বধির—এমন কি ঠোঁটা একটু কুৎসিৎ হলে কিংবা জিহ্বায় একটু জড়তা থাকলে দেখা গেছে মনের গঠনেরও বৈলক্ষণ্য ঘটেছে। তালে বাঁদের গল্প নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। তাঁর মাতৃদেবীর অনবধানতায় শৈশবে পতনের ফলে তাঁকে চিরজীবন বিকলাঙ্গ থাকতে হয় এবং তার ফলে তাঁর পারিবারিক পেশা, সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যশ অর্জন করা, তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তার ফলে এমন ভাবে তাঁর মনে আঘাত লাগে যে উত্তর জীবনে তিনি কথা বলতেন কম, পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করার শক্তি তাঁর ছিল না এবং নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে কেউ দাঁড়ালে তাকে সমূলে বিনাশ করতে তাঁর একটুও বাধত না। জগৎ তাঁকে ঠকিয়েছে, অতএব তিনিও জগৎকে ঠকাবেন, এই ভাব নিয়ে ক্ষমতা ও যশের জন্য লড়াই করেছেন এবং পেয়েছেনও। যদিও যশের সঙ্গে 'অপ' কথাটি যুক্ত হয়ে গেছে।

ক্ষমতার লোভে তিনি কুকর্মকে কুকর্ম মনে করতেন না। যেমন বলেছেন, বিকৃতাঙ্গ ব্যক্তিরা প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। তাঁর বেলায় যেন সে কথা বর্ণে বর্ণে ফলে ছিল।

—

(৩)

যে লোকটি কানা বা যে মেয়েটি কুরূপা, অন্যের কাছে তাকে কোন না কোন সময় তার এই শারীরিক ত্রুটি নিয়ে ঠাট্টা সহ্য করতে হয়েছে। তার ফলে তার মনে একটা ভাব জন্মে গেছে যে লোকে বুঝি সর্বদাই তাকে এরকম ঠাট্টা করছে। সে নিশ্চয়ই এই ঠাট্টা পছন্দ করে না এবং ফলে জগতের উপর তার বিরূপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

আমাদের মনে হয়, এছাড়া আরও একটা বড় কারণ আছে। নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করে যখন মানুষ দেখে অন্যের মধ্যে সেই গুণ আছে বা সেই জিনিষটি অন্যে পাচ্ছে যেটা তার মধ্যে থাকা উচিত ছিল কিংবা তারও পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু নেই কিংবা পায়নি,—তখনই আসে তার ঈর্ষা, আর ঈর্ষাতেই জন্মায় এই হীনভাব। বন্ধু এবং মধু দুজনেই এক আপিসে চাকরী করে, উভয়ের বিদ্যাবুদ্ধি এক, কাজও করে এক রকম, চাকরীতে ঢুকেছেও একই সময়। হঠাৎ বন্ধু প্রমোশন পেয়ে বড়বাবু হয়ে গেল, কিন্তু মধুর কিছু হলোনা। মধু দু'চার বছর পরে মাহিনা বৃদ্ধি বা প্রমোশনের ব্যবস্থা করল—নামঞ্জুর হল। বন্ধু আবার এদিকে আর একধাপ উপরের দিকে পা বাড়িয়েছে। মধুর মনে তখন এই ভাবটি নিশ্চয়ই দেখা যেবে এবং তার মানসিক স্থিরতা উপরওয়ালা থেকে আপিসের সকলের পরে, আপিসের ওপর থেকে জগতের সকলের পরে সঞ্চারিত হতে থাকবে। মধু দেখছে বন্ধুর এলেম তার সমান হলেও বন্ধু পাচ্ছে প্রমোশন, আর সে পাচ্ছে বরাবর অবহেলা, এতে তার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক এবং তাতে জগতের উপর রাগ—সেটা নিজেকে ছোট ভাবার একটা প্রধান লক্ষণ—হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। পরস্পরকে তুলনা করে হীনতা বোধ করা শুধু আপনার আমার মধ্যেই যে আছে তা নয়, অনেক বড় বড় লোকের মধ্যেও আছে। প্লেটো জেনোফোনকে দেখতে পারতেন না—জেনোফোন ও প্লেটোকে যাচ্ছেতাই করেছেন; মাইকেল, বঙ্কিম, শরৎ এমন কি রবীন্দ্রনাথ ও হীনম্মন্যদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান নি; আধুনিক বাঙলাদেশে কাদা ছোঁড়াছুড়ি তো প্রত্যহই দেখছি। অথচ এই 'হীনম্মন্য'রা কেউই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিতান্ত হেঁজি-পেজি নন। ঈর্ষাই এর কারণ।

আপনার ছেলেটির চার বৎসরের সময় আপনার খুকীটি হল। এই চার বছর খোকা ছিল আপনার সবেধন নীলমণি, যাবা যায়, ঠাকুমার আদর কুড়িয়ে এসেছে। এবার খুকী তার আদরে ভাগ বসাতে সুরু করল। খোকার আস্তে আস্তে জাগতে লাগল হিংসা। ওইতো একটুখানি মেয়ে, এখনও হাঁটতে পারে না, ওকে অত মাথায় তুলে রাখবার কি আছে, এই গোছের ভাবটা। সে যে তার ছোট্ট বোনটিকে ভাল বাসে না তা নয়; কিন্তু সে চায় যে সে যতটা আদর এতদিন পেয়ে এসেছে ঠিক ততটা আদরই যেন পেতে থাকে—তার ভাগ আর কাউকে দিতে সে প্রস্তুত নয়। ছোটখাট ব্যাপারে তার এই হিংসা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে। আপনারা যদি বুদ্ধিমান হন তাকে ঠিক পথে চালালে আস্তে আস্তে সে দোষ সেরে যাবে, কিন্তু যদি বুদ্ধিমান না হন, তাহলে তার মনে তুলনা জেগে উঠবে এবং ক্রমশ সে তার নিজের এবং পরিজনদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। পরে পান থেকে চুণ খসলে তার হীনতাবোধ মাথা তুলে উঠবে।

(৪)

একটি লোক অত্যন্ত মনুষ্যদ্বেষী ছিল, মানুষের

উপর অসাধারণ বিদ্বেষ তাকে কয়েকটি খুন করতে প্ররোচিত করে। খোঁজ করে দেখা যায় তার জন্ম নীচকুলে এবং সেই জন্ম সে সমাজে অবজ্ঞাত। আমাকে যে সমাজ ঘৃণা করে, সে সমাজকে আমিও দেখে নেব—এই ভাব তার মনে এনে দিয়েছে হিংসা। কাজেই দেখছি অনেক সময় সামাজিক বিধি নিষেধও হীনতা বোধের প্রশ্রয় দেয়। সব সময়ই যে এই দোষ একই ভাবে প্রকাশ পাবে তা নয়। কেউ কেউ এ দোষ লুকোবার জন্ম বাইরে একটা গায়ে পড়া ভাব আহির করে সর্দারি করতে যায়। কেউবা তার যে বিষয়ে ত্রুটি সেটা চাপা দেবার জন্ম অন্য বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভের চেষ্টা করে। কেউবা একটুতেই তিড়বিড়িয়ে ওঠে—যাকে ইংরেজীতে বলে touchy, কেউবা হয় দাম্ভিক। আবার কেউবা তার ত্রুটিটা এমন ভাবে পাঁচজনের সামনে ধরে যাতে সকলেই সেটার আলোচনা করে বা সেটা নিয়ে ঠাট্টা করে, তাতে সে নিজে খুব আনন্দ পাচ্ছে এমন ভাব দেখায়। এ দোষ চাপা দেবার জন্ম নানা জনে নানা উপায় অবলম্বন করে। দলবদ্ধ গুণ্ডামি যারা করে বেড়ায়, তাদের কয়েকজনকে পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তাদের এই হীনতা-বোধই তাদের মানুষের জীবনের প্রতি উদাসীন করে তুলেছে এবং এমন দলের সর্দারি করতে প্ররোচিত করেছে যে দলের উদ্দেশ্য হল বিভীষিকা ছড়ান।

(৫)

হীনতাবোধ থাকলেই যে মানুষ বড় হবেনা, তার কোন কারণ নেই। ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। ডেমস্থিনিস্-এর উদাহরণ দেওয়া কেন। তিনি তোৎলা ও মুখচোরা ছিলেন। ছেলেরা তাঁর নকল করে বিদ্রূপ করত। ফলে তিনি এমন মনমরা হয়ে পড়তে পারতেন যে জীবনে তাঁর পক্ষে কিছু করা হয়তো দুঃসাধ্য হতো। কিন্তু অদম্য ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে তিনি শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হতে পেরেছিলেন উত্তর জীবনে। নেপোলিয়ন যে ছেলেবেলায় চুপচাপ একলা একলা কাটাতেন তার কারণও এই কুণ্ঠা বোধ। যে মেয়েটির বড় দুঃখ যে তার মত মুখসিং আর দুটি নেই, সে গানে, লেখাপড়ায় বা সেলাইয়ে সকলের মাথা ছাড়িয়ে যেতে পারে। পরীক্ষায় যে ছেলেটি খারাপ করে বরাবর, স্কুলের স্পোর্টস্-এ সে হেমনি হয়তো বরাবরই কাপ মেডাল পায়। যে খেলাধূলায় কিছু করতে পারলনা, হয়তো আঁকায় তার জুড়ি নেই।

(৭)

মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে—নিজেকে জাহির করা। ভাল, মন্দ, দুভাবেই তা প্রকাশ পায়! নিজেকে জাহির করার এই যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এটা অল্পবিস্তর সকলের মধ্যেই আছে। আমাদের এই 'অহং' ভাব, এই ego, আমাদের নিজেদের বিদ্যা,বুদ্ধি,অবস্থা, মর্যাদা, বিশেষত্ব প্রভৃতির দিকে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। অপরের সঙ্গে তুলনায় যখন এই অহং ভাবে ঘা খায়, তখন আসে হীনতাবোধ। কত ছোট ছোট ব্যাপারে এই ভাবটি আসে ভাবলে অবাক হয়ে যাবেন। কয় জনে মিলে গল্প করছি। পাঁচুবাবু তাঁর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছেন—কিরকম একবার সাপের মুখে পড়েছিলেন। হরিচরণবাবু কথার মাঝখানে এই ধরনের নিজের একটা অভিজ্ঞতার গল্প বলতে গেলেন, কিন্তু পাঁচুবাবুর শ্রোতারা তাঁর কথাটায় বিশেষ কান দিলেন না। হরিচরণ বাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে গেলেন। পাঁচুবাবুর চেয়েও বড় সাপ তিনি দেখেছেন, তিনি কি হিসেবে পাঁচুর চেয়ে ছোট যে এরা পাঁচুকেই মাথায় তুলছে, আর তাঁর কথা শোনবার মুহূর্ত নেই! এই অহং ভাবই যত গণ্ডগোলের মূল। এই ভাব যদি লুপ্ত হয় তাহলে ভাব থাকা হবে, আমি একটা কেউকেটা, এরা

সব ছোট, আর যদি তৃপ্ত না হয়, তবে হবে রাগ,—আমি এতই ছোট, এতই উপেক্ষণীয় ?

(৮)

এ রোগ সারাবার কোন উপায় আছে কিনা ? হীনতাবোধের প্রাবল্য একটা রোগ—এবং যখন সব রোগেরই চিকিৎসার চেষ্টা করা হয় তখন এটারও বা কেন চিকিৎসার চেষ্টা করা হবেনা ?

এর চিকিৎসার চেষ্টা করা যায় একাধিক উপায়ে। আগেই দেখেছি, প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে হীনতাবোধ সারানো যায়,—যেমন ডেমস্থিনিস পেরেছিলেন, আমাদের বাংলা দেশে অজ যাদব চক্রবর্তী পেরেছিলেন। সোজাসুজি এ দুর্বলতাকে আক্রমণ কর। তোৎলা বলে কথা বলতে পারি না ? মুখচোরা বলে আইনের কূট তর্ক করতে পারি না ? তোৎলামি জয় করব, মনের বলে মুখচোরা ভাব দূর করব।

মতিলাল শীল এবং পণ্ডিত মশায়ের গল্প সকলে জানেন। ব্যক্তিগত চেহারার জন্য পণ্ডিত মহাশয় বড় দুঃখিত ছিলেন—কিন্তু মতিলাল শীলকে দেখে তাঁর সে দুঃখ রইল না। শীল মহাশয় পরে তাঁর সুখী হবার রহস্য জেনে বড়ই আমোদ পান। এক কন্যাদী অভিনেত্রী ছিলেন, চেহারায় কৌলীন্য যাঁর ছিল না। বং মেখে, প্রসাধন করে সেই চেহারাকে সুশ্রী করতে গিয়ে আরও লোকের উপহাসভাজন হতেন। শেষে তাঁর স্বাভাবিক চেহারাকেই লোকের সামনে প্রকাশ করে ধরলেন, তাঁর কুরূপ আর তিনি লুকোতেন না—তিনি যে কুরূপা তা স্বীকার করে কুরূপেরই অভিনয় করতে সুরু করলেন। লোকে যখন যেখন তাঁর স্বাভাবিক রূপকে অস্বীকার করার মত সঙ্কোচ তাঁর নেই, তখন তাঁকে বিদ্রূপ করা ছেড়ে দিল, এবং তিনিও তাঁর কাজে সাফল্য সহজেই অর্জন করলেন।

কোন কোন পণ্ডিত আর একপ্রকারের প্রতিকারের কথা বলেছেন। আপনার চেয়ে অনেক বড় এমন কি সাধারণের চেয়েও বড় প্রতিভার সংস্পর্শে অনুক্ষণ থাকা। একটা উদাহরণ নিন। রামবাবুর ভূগোলের আপনার অনেক বিষয়ের জ্ঞানের অভাব আপনাকে কুণ্ঠিত করে তুলেছে। একটা বড় লাইব্রেরিতে গিয়ে বসুন—অত আর দরকার কি, এক খণ্ড বিশ্বকোষ নিয়ে বসুন, দেখুন তো বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের কতটুকুই বা আপনি জানেন আর কতটুকুই বা রামবাবু জানেন ! দেখবেন, আপনার নিজেকে ছোট মনে করার ভাব কখন আস্তে আস্তে সরে গেছে।

(৯)

একটা বিষয়ে যদি আপনার অভাব থাকে তাহলে তার জন্য দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই, অপরের চেয়ে নিজেকে ছোট ভাববার কোন কারণ নেই। আপনি অপরদিকে হয়তো বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন। ওই যে মেয়েটি যার চেহারা একবার দেখলে আর পরের বার দেখতে ইচ্ছা করে না, হয়তো গানে কিংবা সেতার বাজনায় ওর সমকক্ষ আর কেউই নয়, আর সেটা সে জানে বলেই তার চেহারার জন্য কুণ্ঠা তার নাই। যে ছেলে পড়াশোনায় ভাল করতে পারল না, তার লেকের ধারে গোমড়ামুখে সকল সন্ধ্যা বসে থাকবার কোন কারণ নেই। খেলাধুলায় সে চেষ্টা করলে সকলকে হারিয়ে দিতে পারে। এইভাবে একদিকের অভাব আমরা আর একদিকে নতুন সৃষ্টি দিয়ে পূরিয়ে দিতে পারি, সঙ্কুচিত হবার দরকার কি ? মনে হচ্ছে, বোধহয় এ্যাডলার বলেছেন, মানুষ সকল সময় চেষ্টা করছে নিজেকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর করে তুলতে আর তার এই প্রচেষ্টা সমাজের উন্নতির মূল। কথাটা অনেকাংশে সত্য। মানুষ কখনও পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব নয়। অপূর্ণতা তার জীবনে অনেক। যদি সে তার অপূর্ণতাগুলিকে ঝাঁকড়ে বসে থাকত তাহলে সমাজ কবে বিলুপ্ত হয়ে যেত। তার একদিকে যেমন

অপূর্ণতা, অপর দিকে তেমনি পূর্ণতা প্রাপ্তির সাধনা। এই পূর্ণতা প্রাপ্তির সাধনাই হীনতা বোধ জয় করার অন্যতম উপায়।

(১০)

প্রেম দিয়ে এ দোষটি জয় করা যায় বলে অনেকে নির্দেশ করেছেন। যাকে ভালবাসি, তার ভাল গুণগুলি আমার চোখের পীড়াদায়ক হতে পারে না—তার তুলনায় আমার এ গুণগুলি নেই স্বীকার করতে বাধে না। তাতে করে নিজেকে ছোট মনে হয় না। এই প্রেম যেটা ব্যক্তিবিশেষের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ, এটাকে নৈর্ব্যক্তিক করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিন না কেন? তাহলে আর অপরের ভাল দেখে আপনার চোখ জ্বালা করবে না; ওর আছে, আমার নেই ভাবটাও হবে না।

অবশ্য স্বীকার করছি মুখে এটা বলা যত সহজ, কাজে তত নয়। এতই যদি সোজা হত তাহলে লিখনিংস মিউটিনকে পাগল প্রমাণ করতে যেতেন না, অথচ দু'জনে বিশ্বসেরা পণ্ডিত। আমাদের দেশেও এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

মানুষের ego বা অহংকার বেশি মাত্রাতে থাকাও এক ধরণের হীনতাবোধ। হামবড়িয়া বা সবজান্তা ভাব বা আমি সব চেয়ে বড় আর সকলে ছোট, এ ভাব অহংকার বেশি থাকলে হয়। যেখানেই যেকে যিনি বসতে উঠতে অধিনায়ক হয়েছেন, তাঁর দাপট আজ-অধিনায়কের চেয়ে বেশি—তার কারণ তিনি জানেন তাঁর যৌক তাঁর অপর পাঁচটা সহকর্মী সকলেই জানেন এবং সেজন্যই তিনি সর্বদা ভাবেন যে এরা বুঝি আড়ালে তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গরস করে। অপরের কাছে নিজের মূল্য পাছে প্রমাণ হয় তাই তিনি ভয়ে ভটস্থ, তাই তাঁর এত হাঁক ডাক। আমি যা বলছি তাই ঠিক, ওর কথাটা কিছু নয়, এধরণের উক্তি প্রায়ই শুনি। এগুলো হীনতাবোধ থেকে প্রসূত। এর খুব সহজ তুলনায় নিজের দোষকে অকপটে মেনে নেওয়ার মত নৈর্ব্যক্তিক প্রেম অর্জন।

(১১)

ছেলেটা বাপু একটাও কথা শোনে না, এর চেয়ে ওধাড়ীর গদাই ভালো—এ-ধরণের কথা আপনি আমি বা ছেলেদের মায়েরা কত বার বলেছি। ভেবে দেখেছি কি যে এতে ছেলেদের খুনো করে তুলছি? কেউ কেউ বড় হয়ে বলে, ছেলেবেলায় আমার কতবার মনে হয়েছে আমার বাবা যা যদি অন্য কেউ হতেন। অতিরিক্ত তুলনা, অতিরিক্ত শাস্তি, অতিরিক্ত আবদার, অতিরিক্ত সবকিছু দিয়ে ছেলে-পুলেদের আমরা এভাবে মাথা খেতে পারি। গোড়া থেকেই আমাদের এদিকে নজর রাখা কর্তব্য, তাহলে ছেলেপুলেদের মনে অকারণ আত্মগ্লানি বা অহেতুক হীনতাবোধ জন্মাবে না।

(১২)

হীনতাবোধের সহজ কয়েকটি মুষ্টিযোগের সন্ধান করি, আসুন। আমরা নিজের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি ধন ঐশ্বর্য ইত্যাদি স্পৃহণীয় জিনিষের একটা বা একাধিক বা সবগুলির অভাব দেখলে ছোট হয়ে যাই, এই না? কিন্তু ভেবেতো দেখিনি তুলনা করবার মাপকাঠিটা যুক্তিসহ কিনা। যুক্তিসহ মাপকাঠি হলে আর আমাদের অভাবের দিকটা এতটা পাল্লাভারী মনে হত না। কাজেই আমাদের প্রথম কাজ হবে এই দাঁড়ি পাল্লার পাথর ঠিক করা। তা করতে গেলে পরের দোষগুণ বিচার করতে হবে ন্যায় ও সত্যের যুক্তি দিয়ে, পরছিদ্রান্বেষী বা আত্মদ্বেষী বুদ্ধিতে নয়।

নিজেকে ছোট নিশ্চয়ই ভাবব না, কিন্তু তাই বলে আমার সীমা যতটুকু তাও ভুলব না; অতিরিক্ত অহংভাব বা ego বর্জন করব।

অপরের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে ভয় পাব কেন? আমি এত ছোট নই বা আমাতে এতটা অভাব নেই যে তুলনায় আমি মাটিতে মিশে

যায়, আমার এত পাওয়া নেই যে অপরের যেটা বেশী আছে তার দিকে চোখ বুজে বলব, ও আর এমন কি। বাস্তব কঠোর হলেও দাংসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হতে হবে। আমার নেই বা ছিল না, এই অতীত নিয়ে বিলাপের কোন প্রয়োজন নেই।

আমরা যদি এভাব মনে আনতে পারি, তবে অনর্থক আর মন ভারী, প্যাচা মুখ করে বেড়াতে হবে না। নিজের দুরবস্থা ঢাকতে Cynic সেজে পরের পূর্ণতাকে বিদ্রূপের বাতাসে উড়িয়ে দেবার দরকার পড়বে না। যে মানুষ চেষ্টা করেও কমলে কণ্টক আর পুষ্পে কীট ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না সে বেচারা সত্যই বড় দুরভাগা, অনুকম্পার পাত্র। আমরা তা জানি, তাই তার মত হব না। অতীতকে নিয়ে পড়ে থাকবার দরকার নেই, ধরে নিই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। একটা দিক যদি আমাদের নাই থাকে, চেষ্টা করে মনের জোরে নানা প্রকারেও যদি সেটা অর্জন করতে না পারি, নাই পারলাম। আমার ভিতর নিশ্চয়ই অন্য কোন দিকে সম্ভাবনা আছে, আমার কাজ হবে সেই সম্ভাবনাকে খুঁজে বার করা, তাকে কোরক অবস্থা থেকে প্রস্ফুটিত শতদল করে তোলা। 'বৃথা জন্ম এ সংসারে' আমার নয়, এ কথাটি মনে রেখে দৃঢ় পদক্ষেপে আমাকে অগ্রসর হতে হবে আমার পূর্ণ বিকাশের দিকে—আমার মধ্যে হীনম্মন্যতার স্থান নেই, তা সর্বদা মনে রেখে।

কিশোর সাহিত্য

শ্রীসুধাংশুকুমার সাহা

অধ্যক্ষ

মুনিয়াদী শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয়, বগুলী

আমরা বড়দের জন্য গল্প লিখি, কবিতা রচনা করি, উপন্যাস লিখি, নাটক লিখি, আর ও কত কি করি। এগুলোকে আমরা বড়দের সাহিত্য বলতে পারি। কিন্তু বড়দের জন্য যা লেখা হয় ছোটদের পক্ষে তা যে আদৌ উপযোগী নয় তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি, যদিও বড়দের বই অনেক সময় আমরা ছোটদের হাতে তুলে দিই। ছোটদের জগৎ স্বতন্ত্র। তাই তাদের সাহিত্যও স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬ থেকে ১৩ পর্যন্ত শিশুদিগকে আমরা কিশোর বলতে পারি। তার মধ্যে আবার দু' ভাগ করা যায়। প্রাক কিশোর ৬+ থেকে ৯+আর কিশোর ৯+থেকে ১৩+পর্যন্ত অর্থাৎ যৌবন উন্মেষের পূর্ব পর্যন্ত। এই বয়সে বালকবালিকাদের মনে যে বীজ বপন করা হয়, বলা বাহুল্য উত্তর জীবনে তাই-ই ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে জীবনকে সুন্দর করে সার্থক করে। কিন্তু এই কিশোর কিশোরীদের মনের ভাব বোঝা অতি কঠিনের ব্যাপার। এই বয়সে বালকবালিকাদের দেহের পরিবর্তন সুরু হতে আরম্ভ করে—বিশেষ করে ১২।১৩ বৎসর বয়সে। এই বয়ঃসন্ধিকালকেই বৈষ্ণব শাস্ত্রে "কৈশোর" বলা বলা হয়েছে কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ৯+থেকে ১৩+বৎসর পর্যন্ত কালকে কৈশোর বলে ধরা হয়। বাস্তবিক এই বয়সের বালকবালিকাদের মনের ভাব বোঝা যায়। বৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর কিশোরীকে

কেন্দ্র করে আমাদের বাংলা সাহিত্য কতই না সমৃদ্ধ হয়েছে। কত কবি এই ব্রতের কিশোর কিশোরীর মনের কথা বোঝবার কত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনকালে কেউ তার কিনারা করতে পেরেছেন কি?

তাই বলছিলাম—কিশোরকিশোরীদের মনোভাব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। তবে মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য সাহিত্য রচনা করা চলে। মনস্তত্ত্বের এই দিকটি উপেক্ষা করলে কিশোরদের পক্ষে তা সুখপাঠ্য হবে না।

(১) কিশোর কিশোরীরা অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। তারা শিশুও নয় আবার পুরোপুরি যুবকযুবতীও নয়। অথচ যুবকযুবতী হবার জন্য তাদের কতই না আগ্রহ। কাজেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই আগ্রহ ও কল্পনাকে রূপ দিতে হবে।

(২) কিশোর কিশোরীরা মনে মনে কোন এক আদর্শ নরনারীর পূজারী (hero worship); সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সেই আদর্শের রূপ ফোটাতে হবে। তাই বলে সেটা আবার নীতিবাক্যের বোঝায় ভারাক্রান্ত হলে চলবে না।

(৩) কিশোরকিশোরীরা adventure ভালবাসে। কোন একটা ভীষণ কিছু করে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিতে চায়। এজন্য রোমাঞ্চকর ও সাহসিক গল্প তাদের খুব প্রিয়। এখন আর তারা নিছক পরীর গল্প ভালবাসে না, কিছুটা বাস্তবের ছবি দেখতে চায় এবং মনে মনে সেই বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের মিলিয়ে দেখতে চায়।

(৪) কিশোর সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হওয়া দরকার। ছোট, ঝরঝরে পরিষ্কার সরল বাক্য হওয়া দরকার। যথাসম্ভব যৌগিক ও ক্লিষ্ট ভাষা ত্যাগ করা ভাল। ভাষার মধ্যে অনুপ্রাস থাকলে শিশুদের চিত্তাকর্ষণের সুবিধা হয়। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা আদর্শ স্থানীয়।

(৫) কিশোর সাহিত্যের বিষয়বস্তু খুব সরল ও প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিষয়বস্তু যেন খুব বড় না হয়। এবং অযথা ঘটনা বৈচিত্র্যের সমাবেশ করে বিষয়বস্তুকে যেন ঘোরালো করা না হয়।

মোটামুটি এই কয়েকটি মূলনীতির উপর নজর রেখে কিশোর সাহিত্য রচনায় মন দেওয়া ভাল। তবে লেখক হচ্ছেন শিল্পী; তাঁর উপর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম ত চালিয়ে দেওয়া যায় না। তিনি সৃষ্টির আনন্দে এমন কিছু হয়তো রচনা করবেন—যেখানে—এইসব নিয়মের ব্যতিক্রম করেও তা কিশোরকিশোরীদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

আজকাল একটা ফ্যাশান হয়েছে—সবকিছুরই নিন্দা করে সহজে ও সুলভে নাম কেনা। ইদানিং লক্ষ্য করছি, অনেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গালমন্দ দিচ্ছেন—পাঠ্যপুস্তকের ও পাঠ্যসূচীর নিন্দাবাদ করছেন। কিন্তু কি করে তার সংশোধন করা যায় অথবা কি ভাবে তার সংস্কারে অগ্রসর হওয়া যায় এরূপ কোন গঠনাত্মক কর্মসূচী বড় একটা দেখা যায় না। শক্তি সামর্থ্য যা কিছু আছে তা গালমন্দ করতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজের বেলায় বড় বেশি অবশিষ্ট থাকে না। বাঁশি বাজাতে বাজাতেই সব ফুঁদিয়ে ফুরিয়ে যায়—গাড়ী আর চলে না।

সম্প্রতি কিশোর সাহিত্য সম্বন্ধেও এরূপ বিরুদ্ধ আলোচনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে কিশোর সাহিত্য সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। কি প্রচ্ছদ পটে, কি চিত্রে, কি গল্প সম্ভারে, কি প্রকাশনে বাংলা কিশোর সাহিত্য যে সত্যি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে—সে কথা বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই। বাংলা সাহিত্য এবিষয়ে সারা ভারতের মধ্যে গৌরব ও কৃতিত্বের দাবী করতে পারে।

ইদানীং শিশুকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বোম্বাইতে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক রাজ্যসরকারই এই প্রদর্শনীতে যোগ দেন এবং প্রত্যেক ভাষারই কিশোর সাহিত্য প্রদর্শনের

ব্যবস্থা হয় এবং এ বিষয়ে কোন দেশ কতখানি অগ্রসর হয়েছে, তাও পরীক্ষা করা হয়। আমাদের গর্বের বিষয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। সংখ্যায় ও সৌষ্ঠবে, গুণে ও বিজ্ঞানে বাংলা সাহিত্য শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের জন্য আমি কতগুলি বইয়ের তালিকা দিচ্ছি। আশা করি, সহজ ও সুযোগমত এগুলির সদ্ব্যবহার করা হবে আর যাঁরা মাকি কিশোর সাহিত্য সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছেন—তাঁরাও কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখতে পেয়ে হৃদয়ে নিশ্বাস ফেলবেন। এর মধ্যে কতগুলি মূল পাঠ্য হিসাবে আবার কতগুলি উপপাঠ্য হিসাবেও ব্যবহার করা চলবে।

কতগুলি কিশোরপাঠ্য পুস্তকের তালিকা

(৯+ বৎসরের শিশুদের জন্য)

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকারের নাম	প্রাপ্তিস্থান
১। আপদ্ভোম ঝাপদ্ভোম	বিনয় ঘোষ	শ্রীমতী চালধার ২৪, নমবার ম্যানস্ক্রিপ্ট কর্পোরেশন প্রেস, কলিকাতা।
২। হুড়িমাটিমটিম	ঐ	ঐ
৩। হাতে খড়ি	বিমলচন্দ্র ঘোষ	ঐ
৪। ছড়ার ছবি, ১ম ও ২য়	মহেন্দ্রনাথ দত্ত	৩২এ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা।
৫। ছড়া ছবিতে	সুনির্মল বসু	ঐ
৬। কথা শেখা	কিত্তিনাথ চ্যাটার্জী ও গোবিন্দমোহন গুপ্ত	দি সিটি বুক কোম্পানি ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা।
৭। ছবি ও পড়া	সুনির্মল বসু ও যোগেন্দ্রলাল ধর	দি ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ৯, শ্যামা চরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা
৮। ছবির পড়া	উষসী বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা
৯। ছড়ার ছবি	কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়	টিচার্স বুরো ৮১, সিমলা ষ্ট্রীট কলিকাতা
১০। ছবির পড়া	সতীশচন্দ্র মুখার্জী	যথার্থ বুক এজেন্সি ১০, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

পুস্তকের নাম	প্রকাশের নাম	প্রাপ্তিস্থান
১১। ভুলি ও বুলি, ১ম ভাগ	সাধনা দেবী	প্রকাশক ১।১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন কলিকাতা
১২। ছবি ও কথা	বীরেশচন্দ্র চ্যাটার্জী ও মনমোহন মুখার্জী	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা
১৩। সহজ পাঠ, ১ম ভাগ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা
১৪। ছবি ও ছড়া	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	দেশবন্ধু বুক ডিপো ৮৯-এ, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা
১৫। মজার পড়া	নগেন্দ্রকৃষ্ণ চ্যাটার্জী ও বিনোদলাল ধর	ইউ, এন, ধর এণ্ড সন্স্ ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা

(৭+ বৎসরের শিশুদের জন্য)

১। ছড়া ও পড়া	বিমলকুমার ভট্টাচার্য	বর্দ্ধমান প্রকাশনী ১৪-সি, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট কলিকাতা
২। ছবির পড়া	উষশী বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
৩। সহজ পাঠ, ২য় ভাগ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
৪। নূতন পড়া, ২য় ভাগ	সুনির্মল বসু ও যোগেন্দ্রনাথ ধর	প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা
৫। ছড়া ও গল্প	সুকুমার ভট্টাচার্য	চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স্ ১১, গৌর মোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা
৬। শিশুদের রামায়ণ	গৌরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স্ ১৮-বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা
৭। ভুলি ও বুলি, ২য় ভাগ	সাধনা দেবী	
৮। ছোটদের আজব দেশে এলিস্	অমল দাশগুপ্ত	বাণীতীর্থ ২৪৬-এ, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা

পুস্তকের নাম	প্রকারের নাম	প্রাপ্তিস্থান
৯। মজার পড়া, ২য় ভাগ	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চ্যাটার্জী ও দ্বিজেন্দ্রলাল ধর	
১০। ছবি ও পড়া, ২য় ভাগ	সুনির্মল বসু ও দ্বিজেন্দ্রলাল ধর	
১১। ছোটদের মহাভারত	দিগীশচন্দ্র ব্যানার্জী	প্রকাশ পোঃ খরিয়া ২৪ পরগণা
১২। ছোটদের রামায়ণ	ঐ	ঐ
১৩। ছবি ও কথা, ২য় ভাগ	দীনেশচন্দ্র চ্যাটার্জী ও মনমোহন মুখার্জী	
১৪। পড়া শেখা	কিতিনাথ চ্যাটার্জী ও গোবিন্দমোহন গুপ্ত	দি সিটি বুক কোম্পানি ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা
১৫। মজার গল্প	শৈবালকুমার পালিত	এস, কে, পালিত এণ্ড কোং ৮, শ্যামা চরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা
১৬। ইতি বিতির আসর	সুনির্মল বসু	প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা
১৭। ছোটদের ঈশপ (ঈশপস্ ফেবলস্)	তারাপদ রাহা	আশুতোষ লাইব্রেরী ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৮। ছবি ও পাখা	চিত্তরঞ্জন মাইতি	বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

(৮+বৎসরের কিশোরের জন্য)

১। ছোটদের আলিবাবা	বিনয়কুমার গাঙ্গুলি	আশুতোষ লাইব্রেরী ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা
২। ছোটদের আলাদিন	ঐ	ঐ
৩। হুবুরা	সুনির্মল বসু	ঐ
৪। হাসি কান্নার দেশে	ঐ	ঐ
৫। খেয়াল খুসি	আশা দেবী	ঐ
৬। কেবল মজা	প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	ঐ

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকারের নাম	প্রাপ্তিস্থান
৭। ছোটদের গোপাল ভাঁড়	তারাপদ রাহা	আশুতোষ লাইব্রেরী ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা
৮। ছোটদের শ্রিয় (শ্রিম্‌স্ টেলস্)	ঐ	ঐ
৯। ছোটদের আতঙ্ক (আতঙ্কের গল্পগুলি)	ঐ	ঐ
১০। ছোটদের ঈশপ	ঐ	ঐ

(৯+এবং ১০+কিশোরদের জন্য)

১। টম কাকার কুটির (আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন)	হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো	ঐ
২। কাদম্বরী	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ
৩। ছোটদের রবিন হুড্	তারাপদ রাহা	ঐ
৪। এক পয়সার হাসি (পদ্য)	জসীম উদ্দিন	ঐ
৫। কাড়াকাড়ি	হীরেন বসু	ঐ
৬। খৈ খৈ	সুকুমার রায়	নিপ্‌নেট প্রেস ১০।২, এলগিন রোড্, কলিকাতা
৭। পাগলা দাশু	ঐ	ঐ
৮। দিন দুপুরে	লীলা মজুমদার	ঐ
৯। আবোল তাবোল	সুকুমার রায়	ঐ
১০। ক্ষীরের পুতুল	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ
১১। ক্ষুধীর ক্ষুধীর	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ঐ
১২। শকুন্তলা	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ
১৩। আনোয়ারের ছড়া	সুনির্মল বসু	আশুতোষ লাইব্রেরী
১৪। পড়ার বই, ২য় ভাগ	ঐ	ঐ

(১১+এবং ১৩+বৎসরের কিশোরদের জন্য)

১। কালো পাখী	শৈল চক্রবর্তী	আশুতোষ লাইব্রেরী ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা
২। ছোটদের বেতালের গল্প	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ
৩। হাসু (পদ্য)	জসীম উদ্দিন	ঐ
৪। সত্য কাণ্ড	সাধারণ গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ
৫। পয়সার ডায়েরী	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ

	পুস্তকের নাম	গ্রন্থকারের নাম	প্রাপ্তিস্থান
৬।	ছোটদের সিন্ধবাদ	ধীরেন্দ্রলাল ধর	আশুতোষ লাইব্রেরী
৭।	টোল পড়া	ধীরেন বল	ঐ
৮।	ছেলেদের হাতের কাজ	নলীগোপাল চক্রবর্তী	ঐ
৯।	মহাভূতের দান	প্রভাতকুমার গোস্বামী	ঐ
১০।	রাম চরিত		ঐ
১১।	টেকচাঁদ ঠাকুরের	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ
	আলালের ঘরের দুলাল		
১২।	বার্ষিক বিত্ত সাথী		ঐ
১৩।	ভাগ্যের বিধান	প্রেমেন্দ্র মিত্র	সিগনেট প্রেস
			১০।২ এলগিন রোড
			কলিকাতা
১৪।	হাউই	বুদ্ধদেব বসু	ঐ
১৫।	কাণ্ডাহীনের কাহিনী	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ
১৬।	রাজ কাহিনী	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ
১৭।	আপন কথা	ঐ	ঐ
১৮।	নবাযুগের রূপকথা	মৌমাছি	মিত্রালয়
			১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভাষা সমস্যা

[শ্রীআদিনাথ সেন]

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের কার্যে একটি ভাষার ব্যবহার না। কোন রকমে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিলেই সুবিধাজনক সন্দেহ নাই। অধিকাংশ লোকের নিকট সহজে বোধগম্য বলিয়া, হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবী। আমাদের পূর্ব শাসনকর্তা ইংরেজদের নিকট ইহা বোধগম্য ছিল বলিয়াই, ইহা অধিকাংশ লোকের নিকটও বোধগম্য বলিয়া ধরা হয়। হিন্দী পূর্বেকার মুসলমান শাসনকর্তাদের উর্দু ভাষার সহিত মিলিয়া, হিন্দুস্থানী গঠন করিয়াছিল। ভাষাবিষয়ে উপরওয়ালাদের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। হিন্দী সহজ হইবার কারণ এই যে ইংরেজদের উহা লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। বানান ও ব্যাকরণ শুদ্ধ অশুদ্ধের কোন বালাই ছিল না। যে রকমে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিলেই হইত। বেশির ভাগ—"দে আও তোম বাবুকো আপ্ত বাইঠ (বাথ) অব্ ষ্টার্ট্ বস্তু"—এই ধরনের নমুনায়। ইসারায় তো অনেক কথা বুঝান যায়, উচ্চারণেরও কোন বালাই থাকে না। তবে মনের সকল ভাব শব্দিকায় বুঝান যায় কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞেরা বিবেচনা করিতে পারেন। মনোমুগ্ধকর গান তখন থাকা সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশের ও প্রয়োচনার শক্তি, গাম্ভীর্য ও ঐশ্বর্য হিন্দী ভাষার আছে কিনা, জ্ঞানের অভাবে জোর করিয়া বলিতে পারি না।

বাংলা ভাষা বাঙ্গালী জাতির মত, সমস্ত ভারতে

বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহা ভারতের সর্বাপেক্ষা অধিকাংশ ব্যক্তির কথিত ভাষা। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রগঠনে বাঙালীই প্রধান সৈনিক। সাহিত্যিক আবির্ভাবে ও সাহিত্য-সম্পদে ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা অতুলনীয়। সঙ্গীতে, বিশেষ, স্বাধীনতা অনুপ্রেরণার গানে, যেমন বন্দে মাতরম্ বা জনগণমন ইত্যাদিতে, বাংলা ভাষার একাধিপত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সুবিধার দিক হইতে আমাদের ইংরেজী ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে বহুদিন ব্যবহার করিতেই হইবে। "ভাগ্‌সিস্" নূতন কিছু করা" এই হুজুগে ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও অন্যান্য প্রয়োজনে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন বরাবরই থাকিবে। এখন যেমন বাঙালীর ঝোঁকে মাদ্রাজ গিয়া ইংরেজী ভাষার সাহায্য নিতে হয়, সেইরূপ, বিদেশে গেলে ইংরেজী ভাষার ব্যবহারই করিতে হইবে। কারণ, পৃথিবীতে যে কোন ভাষা অপেক্ষা ইংরেজীরই ব্যবহার বেশী প্রচলিত। তবে কালে, অল্প লোকেরই প্রয়োজনমত ইংরেজী শিক্ষার দরকার হইবে। তাহাও কথিত ভাষার। সেক্সপিয়র মিলটনের সৌন্দর্য অপরিচিতই থাকিবে, তাহাতে কি আসে যায়? ফরাসী বা জার্মান মনীষীও তো আছেন। আমরা তাঁহাদের বিষয় কি জানি?

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সংস্কৃতের উল্লেখ হইয়াছে। দক্ষিণ ভারত ব্যতিরেকে, অন্যান্য প্রদেশের মূলগত ভাষাই সংস্কৃত। সুতরাং এই সকল দেশে অন্তত রাজ্যশাসন ব্যাপারে, ইহার ব্যবহার সহজসাধ্য হইবে —এক পক্ষের অভিমত। প্রাচীন সাহিত্য পাঠে রুচি এবং বিচার শক্তির বিকাশ হয় এবং বহুকাল পর্যন্ত প্রাচীন ভাষা শিক্ষা, রুচির একমাত্র পরিচায়ক বলিয়া ধরা হইত। কারণ যে আদি সভ্যতা হইতে আমাদের সভ্যতা উদ্ভূত এবং চালিত, তাহা সম্যক বোধগম্য করিতে হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিতে হয়। আমাদের ইংরেজ শাসনকর্তারা, তাহাদের দেশের প্রচলিত ল্যাটিন্ শিক্ষার অনুকরণে প্রাচীন ভাষার পাঠ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন— এখনও সংস্কৃত ম্যাট্রিকে অবশ্যপাঠ্য তালিকাভুক্ত। অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই বেগার শিক্ষার কেবলমাত্র স্থায়ী স্মৃতি, মূল্য সময়ের অপব্যয় অপব্যবহার—এইভাবে। গত শতাব্দীর ষষ্ঠকে, বিখ্যাত শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ম্যাথু আর্নল্ড বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে জগতের লোক আমাদের হাউস্ অব্ কমন্সের বাহাদুরী দেয়, যেখানে ল্যাটিন্ উদ্ধৃতির এখনও ব্যবহার হয়। "Men of the world envy us a House of Commons, where Latin quotations are still made.

কিন্তু প্রাচীন ভাষা শিক্ষার দরকার অস্বীকার করা যায় না। ইহা সাহিত্যিকের পক্ষে উৎস। বিজ্ঞান, বিশেষত ডাক্তারী জ্ঞান পৃথিবীর সকল দেশের সম্পত্তি। অনুবিধা ও গোলযোগ নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একই ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য। তাই ল্যাটিন সংজ্ঞা সর্বত্র চালু। আইনেও কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ বুঝাইতে ল্যাটিনের ব্যবহার আছে। সংস্কৃতের এসব কোন দাবীই নাই। সুতরাং সাধারণের জন্য প্রাচীন ভাষা অবশ্য পাঠ্য হওয়ার অর্থ নাই। এইসব বিবেচনা করিলে ব্যবহারিক প্রয়োজনে সংস্কৃত রাষ্ট্র ভাষা হওয়া আবশ্যক মনে হয় না।

বাংলা ভাষার দাবী প্রতিপাদন না করিয়া বাঙালীর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়— বর্তমানে দুঃসময় বলিয়া আরও সচেষ্ট হওয়া দরকার।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১ম বর্ষ | শ্রাবণ ১৩৫৮ | ৯ম সংখ্যা

আলোচনা

পরীক্ষায় কৃতিত্ব

শ্রীমান সুনীলকুমার পাল এই বৎসর ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা ইহাকে অভিনন্দিত করি। ইনি কলিকাতা সৈদেশ্র সরকার মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের ছাত্র। আশা করি পর পর সব পরীক্ষায় এই কৃতিত্ব বজায় রাখিয়া ইনি ছাত্র-সমাজের ও দেশের গৌরবভাজন থাকিবেন। ভরুণদের কাছে দেশের অনেক প্রত্যাশা, বিশেষত মেধাবী ছাত্রছাত্রীর কাছে। কেবল নিজেরা বড় হইলেই চলিবে না, দেশের জনসাধারণকে বড় করিয়া তুলিতে হইবে।

অন্য বালক শ্রীমান বীরজিৎ দে এইবারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অরুণালোক-নিকেতনের ছাত্র শ্রীমান শিশির ঘোষও এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রী শোভেনা খাতুন উইমেন্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ হইতে এই বৎসর আই. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বি. এ পড়িবার জন্য ইনি লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজে ভর্তি হইয়াছেন।

ইহাদের সাফল্যে আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। পরীক্ষার অক্ষমতাকে তুচ্ছ করিয়া ইহারা স্বাভাবিক পথে লেখাপড়া ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাড়িয়া লইয়াছেন। ইহারা বিদ্যা বুদ্ধি ও হৃদয়বত্তায় বড় হউন। ইহাদের জীবন দশজনের কাজে লাগুক। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সমগ্র বিশ্বে আবশ্যিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

জেনেভাতে সম্প্রতি গণশিক্ষা সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৬৯টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। আবশ্যিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদ সমগ্র বিশ্বে শিক্ষাকে আবশ্যিক করার জন্য যে আন্দোলনের আয়োজন করিয়াছেন, এই সম্মেলনে তাহার প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইল।

অশিক্ষা ও অজ্ঞান সব রোগতাপ ও গ্লানির

মূল। মানুষের চোখে জ্ঞানের অঞ্জন লেপন করিয়া এই গ্লানি অপসারণের চেষ্টা করা মহৎ কাজ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে যে আশার কথা শোনা যাইতেছে তাহা কাজে পরিণত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

হাতে কলমে কাজ

আমেরিকার রিপোর্টারের একটি খবরে দেখিতেছি, আইওয়া স্টেট কলেজের কৃষি বিভাগ ছাত্রেরা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে খামার পরিচালনার কাজেও হাত পাকাইতেছেন। ভবিষ্যতে খামারের কাজে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, এই বিশ্বাসে ছাত্রেরা খামার বাড়ীতেই বাস করেন।

১৯৪৯ সালে পরীক্ষামূলক ভাবে খামার পরিচালনার সর্বোত্তম পন্থা সম্পর্কে কৃষি-ছাত্রদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। স্টেট কলেজের অধ্যক্ষ, স্থানীয় খামারের পরিচালকগণ ও খামারের মালিকগণ ছাত্রদের লইয়া ক্লাস করেন, তাহার পর ছাত্রেরা খামারে গিয়া প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।

পরীক্ষার দিন ছাত্রেরা প্রথমে কোনও খামার পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার বাড়ী ঘর, ক্ষেত, মাটির অবস্থা ও প্রকৃতি, গবাদি পশু এবং যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে, খামার পরিচালকের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে। তারপর তাহারা পরীক্ষার বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেয়। মালিক কি ভাবে সর্বাধিক লাভ পাইতে ও তাহা হইতে লাভ রাখিতে পারেন, ছাত্রেরা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী তাহা ব্যক্ত করে। শিক্ষাকালে ছাত্রদের নিকট দেশের যাবতীয় সমস্যার কথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে, দেশের সমস্যা সম্পর্কেও প্রশ্ন থাকে।

শুধু পুথির পাতায় বিদ্যা অর্জন করিয়া পরীক্ষা পাস করিয়া তাহা জাহির করিয়া আসিতে পারিলেই যে আমরা মনে করি শেষ কথা বলা হইল, তাহা একান্তই ভুল। বিদ্যার প্রয়োগ করিতে পারিলে তবেই না তাহা সার্থক, নতুবা তাহা ভার হইয়া চাপিয়া বসে।

আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্র

যুক্তরাষ্ট্রে। শিক্ষা-বিনিময় পরিকল্পনা অনুযায়ী ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়া সম্প্রতি ভারত হইতে কয়েকটি ছাত্র ছাত্রী যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছেন। ইহারা শিক্ষার কাজ আরম্ভ হওয়ার কিছু আগেই গিয়াছেন। এই সময়টা আমেরিকার জীবনযাত্রা-প্রণালী ও আচার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভে ব্যয়িত হইবে। এই অভিজ্ঞতা লাভের পর ইহারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইবেন। শিক্ষার্থীরা যেমন বিভিন্ন দেশ হইতে গিয়াছেন, তেমনই ইহাদের শিক্ষার বিষয়গুলিও বিভিন্ন।

এই বিনিময় পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিণ ছাত্রেরাও ফুলব্রাইট বৃত্তি লইয়া ভারতে আসিয়াছেন। এলাহাবাদ, দিল্লী, মাদ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহারা অধ্যয়ন করিবেন। বিদেশকে জানিবার ও নিজের দেশকে জানাইবার এই আগ্রহ প্রশংসনীয়। পারস্পরিক আদান প্রদানের ফলে মানুষে মানুষে একদিন হয় তো এমন মৈত্রীর ভাব জাগিবে, যাহার ফলে হানাহানি মারামারি বন্ধ হইবে, পৃথিবীতে সুখে বাস করা যাইবে। শিক্ষা সংস্কৃতির আদান প্রদান আমাদের দেশে নূতন কথা নয়, বুদ্ধদেবের বাণী প্রচার করিতে কতদিকেই না তাঁহার শিষ্যগণ একদিন অভিযান করিয়াছিলেন। দেওয়া আর নেওয়ার কথা আমাদের কবির কণ্ঠে বহুবার উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বের মাঝে মানবধর্মের যে এক অখণ্ড সুর নিয়ত বাজিতেছে, তাহা যেন সকল দেশের সকল মানবকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া রাখে, ইহাই ছিল ভারতের অন্তরের বাণী। বর্তমানের এই লোভ ও হিংসার জগতে, যুদ্ধের সম্ভাবনায় আশঙ্কাপীড়িত মানবের মনে আশার বাণী আনিয়া দিতে পারে, তবেই এই শিক্ষা-বিনিময় পরিকল্পনার সার্থকতা।

শিক্ষাব্রতীর পরলোক গমন

হাওড়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না বসুর অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি। গত ৮ই আগষ্ট তিনি নিমন্ত্রণে অতি শোচনীয় ভাবে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীকেশবের বসুর সহধর্মিণী। শ্রীযুক্ত বসুর এই গভীর দুঃখে আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি।

বুনিয়াদী শিক্ষা

[মহাত্মা গান্ধী]

[গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষার প্রতি সংখ্যায় কিছু কিছু আলোচনা থাকে। এই সংখ্যায় বাংলা হরিজন পত্রিকা হইতে গান্ধীজির 'বিশিষ্ট নমুনার লেখার অনুবাদ কিছু উদ্ধৃত করা হইল। অন্য পরিসরে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথাটি এই লেখার মধ্যে পাওয়া যাইবে।—সম্পাদক।]

১

আমার মতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন একমাত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গ অর্থাৎ হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতির চালনা ও শিক্ষণের মধ্য দিয়া চলিতে পারে। অর্থাৎ শিশুর দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যথাযথ ব্যবহারই হইল তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের শ্রেষ্ঠতম এবং দ্রুততম পন্থা। কিন্তু দেহ ও মনের বিকাশের সহিত যদি আত্মার জাগরণ না হয়, তবে সেই বিকাশ একটা তুচ্ছ একদেশে ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। অধ্যাত্ম শিক্ষা বলিতে আমি অন্তঃকরণের শিক্ষা বলি; অতএব দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির যুগপৎ অনুশীলন দ্বারাই মনের যথাযথ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইতে পারে। এই সকল বৃত্তি একত্র মিলিয়াই একটি অখণ্ড সত্তা। সুতরাং এই মত অনুসারে দেহ ও আত্মার বিকাশ খণ্ডভাবে এবং পরস্পর হইতে স্বতন্ত্রভাবে হইতে পারে, একথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

২

শিক্ষা বলিতে আমি বলি, শিশু এবং পূর্ণবয়স্কের দেহ, মন ও আত্মার দ্বারা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহার সর্বাঙ্গীণ প্রস্ফুটন। অক্ষরজ্ঞানটা শিক্ষার আদি বা অন্ত, কোনটাই নয়। পুরুষ বা নারীকে শিক্ষিত করিবার ইহা একটা উপায়মাত্র। অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা নহে। সুতরাং শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিবার জন্য তাহাকে কোন প্রয়োজনীয় হাতের কাজ শিখাইব, এবং শিক্ষারম্ভের মুহূর্ত হইতেই তাহাকে উৎপাদনক্ষম করিব। এই উপায়ে প্রত্যেক বিদ্যালয় আপন ব্যয়ভার আপনি বহন করিতে পারিবে —শর্ত এই থাকিবে যে, রাষ্ট্র এই সকল বিদ্যালয়ে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

আমার মত এই যে, এই শিক্ষাপ্রণালী দ্বারাই দেহ ও আত্মার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ সম্ভব হইতে পারে। কেবল হাতের প্রত্যেক কাজটি আধুনিকালের মত যান্ত্রিকভাবে নহে, পরন্তু বিজ্ঞান-সম্মতভাবে শিখাইতে হইবে, অর্থাৎ শিশু জানিবে প্রত্যেকটি ব্যাপার বা প্রক্রিয়ার কারণ কি, তাহার গতি কোন্ পথে। আমি অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, তাই এ বিষয়ে খানিকটা ভরসা না লইয়া আমি একথা বলিতেছি না। যেখানে কর্মীদের চরকা শেখানো হইতেছে, সেখানে এই শিক্ষাপদ্ধতির

সবটাই কমবেশি গ্রহণ করা হইতেছে। এই পদ্ধতিতে আমি চপল তৈয়ারি ও চরকা কাটা শিখিয়াছি। তাহার ভাল ফলই পাওয়া গিয়াছে। এই পদ্ধতিতে ইতিহাস ও ভূগোল-জ্ঞান বাদ পড়ে না। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, সাধারণ জ্ঞানের কথা মুখে মুখে শিখাইলে ইতিহাস-ভূগোল শিক্ষা সর্বাপেক্ষা ভাল করিয়া হয়। এই পদ্ধতি দ্বারা লিখন-পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা দশগুণ বেশি শেখানো যায়। প্রাথমিক বয়স্কজ্ঞান লাভ করিবার এবং শিশুর আপন বুদ্ধি কতকটা বিকশিত হইবার পর শিক্ষার্থীকে অক্ষর-পরিচয় করানো যাইতে পারে। আমার এই প্রস্তাব বিপ্লবাত্মক, কিন্তু ইহাতে অনেক পরিশ্রম বাঁচে, এবং যে সকল বিষয় শিখিতে দীর্ঘ কাল লাগে এই পদ্ধতিক্রমে ছাত্র তাহা এক বৎসরের ভিতর শিখিয়া লইতে পারে। ইহাতে সর্বরকমে লাভই হয়। ছাত্র যখন হাতের কাজ শিখিতে থাকে, তখন অবশ্য সেই সঙ্গে তার অন্য শিক্ষাও হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে আমি সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই। আমার ধারণা অনুযায়ী এই শিক্ষা ইংরেজী বা বর্তমানের ম্যাট্রিকুলেশনের তুল্য হইবে।

৩

এতাবৎ আমরা শিশুমনকে নানারকম তথ্যে পূর্ণ করিয়া দিবার প্রতিই একান্তভাবে মন দিয়াছি, তাহার মানসিক বৃত্তি সমূহকে উদ্দীপ্ত ও বিকশিত করিবার কথা কখনও চিন্তা করিয়া দেখি নাই। ও পথে আর নয়—এইবার ঐ হাতের কাজের মাধ্যমে শিশুকে যথার্থরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার দিকে মন সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। হাতের কাজ এই শিক্ষা ব্যাপারের একটা অঙ্গমাত্র হইবে না, শিশুর বুদ্ধি-বিকাশের প্রধান উপায়স্বরূপ হইবে। বালকগণকে এক বা অপর কোন একটি বৃত্তি শিক্ষা দিতে হইবে, এবং বিশেষ বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার দেহ ও মন গঠিত করিতে হইবে, তাহার হস্তলিপি ও শিল্প-সৌন্দর্যবোধ পরিচ্ছন্ন ও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। যে হাতের কাজটি সে শিখিবে, তাহাতে তাহাকে একবারে পাকা হইয়া উঠিতে হইতে হইবে।

৪

আমি আজ আপনাদের সম্মুখে যে শিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিতে চাই, তাহা তথাকথিত চলতি সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি যে-কোন একটি হস্তশিল্প-শিক্ষা নহে। আমি চাই, সমগ্র শিক্ষা একটি হস্তশিল্পের সাহায্যে দিতে হইবে। আপত্তি হইতে পারে যে, মধ্যযুগে ছাত্রদের তো শুধু হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এই বৃত্তি-মূলক শিক্ষা দ্বারা প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হইত না, মাত্র হাতের কাজের খাতিরেই হাতের কাজ শেখানো হইত, তাহার সহিত বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হইত না। বর্তমান যুগে যাহারা বিশেষ বিশেষ বৃত্তিধারী লোকের ঘরে জন্মিয়াছে তাহারা আপন পৈতৃক বৃত্তি তুলিয়া চাকরি করিতে শিখিতেছে। গ্রামের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য বালককে হাতে-কলমে একটা হস্তশিল্পের তত্ত্ব ও প্রয়োগের সব কিছু শিখাইতে হইবে এবং তাহার মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষা দান করিতে হইবে।

ছাত্রের হাতের কাজে যে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইবে তাহা দ্বারা শিক্ষকের ব্যয়নির্বাহ যাহাতে হয় সেজন্য আমি অতিশয় ব্যগ্র ও উৎসুক। কারণ আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি যে, আমাদের কোটি কোটি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার অন্য কোন পন্থা নাই। ইহার জন্য যতদিন পর্যন্ত যথাযথক সাহায্য আদায় না হয়, অথবা সামরিক ব্যয় যতদিন না (সরকার কর্তৃক) হ্রাস করা হয়, ততদিন আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না। আপনারা মনে রাখিবেন যে, এই প্রাথমিক শিক্ষার ভিতর থাকিবে স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, আপন নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন ও গৃহকর্মে

শিক্ষামাত্তার সহিত সহযোগিতা করার সরল সূত্রগুলি। বর্ত্তমান যুগের ছেলেদের পরিচ্ছন্নতা ও আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, আর তাহাদের শরীরও দুর্বল। সেইজন্য ছয়বছর ছিলের যারা আমি তাহাদের আবশ্যিক শরীরচর্চার ব্যবস্থা করিব।

৫

ভারতবর্ষের জন্য অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষার নীতিতে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমার আরও মত যে, ছেলেদের একটি প্রয়োজনীয় বৃত্তি শিখাইয়া এবং সেই বৃত্তিশিক্ষার মধ্য দিয়া তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বৃত্তি-সমূহের অনুশীলন করিয়াই শুধু আমরা ঐ নীতি কার্যতঃ সফল করিতে পারি। শিক্ষাসম্পর্কে এইরূপ বৃত্তিগত পদ্ধতির হিসাব কেহ যেন হীন অথবা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচনা না করেন। পয়সার হিসাবের ব্যাপারে মূলত হীন কিছু নাই। সত্যকার অর্থনীতি, শ্রেষ্ঠ ধর্মনীতির বিরোধী কখনও হইতে পারে না, যেমন সত্য ধর্মনীতি শ্রেষ্ঠ অর্থ-নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে তবেই উহার নাম সার্থক হয়।

৬

সহরের বিদ্যালয়ে কি প্রকারের বৃত্তি-শিক্ষা দেওয়া সব চেয়ে উপযুক্ত হইতে পারে? এই বিষয়ে বাঁধাধরা কোন নিয়ম নাই। আমি ভারতের গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাই। বর্ত্তমানে আমাদের গ্রামগুলি শুধু সহরের গায়ে ঝুলানো অবস্থায় আছে। গ্রামগুলি আছে যেন সহরগুলি তাহাদের খাদ্যিতে দিয়াছে বলিয়া। এই অবস্থা অস্বাভাবিক। সহরগুলি যখন বুঝিবে যে, স্বার্থ-চালিত হইয়া গ্রামগুলিকে শোষণ করিবার পরিবর্ত্তে গ্রাম হইতে তাহারা যে-শক্তি ও পুষ্টি আহরণ করিয়াছে তাহার যোগ্য প্রতিদান করাই তাহাদের কর্ত্তব্য, মাত্র তখনই উভয়ের মধ্যে বলিষ্ঠ ও কল্যাণ-কর সম্পর্ক বিকাশ লাভ করিবে। সমাজ পুনর্গঠনের এই মহান্ ও পুণ্যকর্মে সহরের ছেলেদের যদি নিজেদের খাদ্য পালন করিতে হয়, তবে বৃত্তিমূলক যে-কাজের মধ্য দিয়া তাহারা শিক্ষাগ্রহণ করিবে সেই কাজ যেন গ্রামের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তুলার বীজ ছাড়ানো ও পরিষ্কার করা হইতে সুতাকাটা পর্যন্ত কার্পাস শিল্পসংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া দ্বারা এই উদ্দেশ্য যতটা সিদ্ধ হইতে পারে, সেরূপ আর অন্য কিছুতে নহে। আজও কার্পাস জন্মে গ্রামে, আর বীজ ছাড়ানো, সুতাকাটা ও কাপড়বোনা হয় সহরে। কিন্তু কাপড়ের কলে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত কার্পাসকে যে সকল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহাতে মানুষ নষ্ট হয়, মানমর্যাদা ও যন্ত্রশক্তির অপচয় হয়—সে এক নিদারুণ দুঃখময় কাহিনী।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, তুলাধোনা, সুতাকাটা প্রভৃতি গ্রাম্য হস্তশিল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা-দানের যে পরিকল্পনা আমি করিয়াছি, তাহা বহুদূরপ্রসারী পরিণতির সম্ভাবনাপূর্ণ। একটা শান্তিপূর্ণ সমাজবিপ্লবের কর্মসূচি হিসাবেই তাহা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সহর ও গ্রামের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ ধর্মময় সম্পর্কের ভিত্তি পাওয়া যাইবে, এবং বর্ত্তমানে যে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে বিষময় সম্পর্কের প্রভাব রহিয়াছে, তাহার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য ইহা অনেকদূর পর্যন্ত সহায়তা করিবে। ইহা দ্বারা আমাদের গ্রামসমূহের ক্রমবর্দ্ধমান ঋণ নিবারণ হইবে এবং অধিকতর ন্যায়সঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হইবে। এই ব্যবস্থায় ধনী এবং নির্ধনের অস্বাভাবিক ভেদ থাকিবে না, প্রত্যেকেই জীবনধারণোপযোগী উপার্জ্জন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবে এবং প্রত্যেকেরই স্বাধীনতার অধিকার থাকিবে। রক্তকলঙ্কিত শ্রেণীসংগ্রামের বিভীষিকা এবং ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল ভূমিতে যন্ত্রশিল্প

স্থাপনের কৃতি যাদ যাওয়াতেই এই সকল সম্পন্ন হইবে। আর ইহার ফলে বিদেশ হইতে আমদানী করা কলকব্জার ও তাহার চালনার জন্য ওস্তাদদের উপর অসহায়ভাবে নির্ভর করিতে হইবে না। পরিশেষে এই কর্মব্যবস্থায় উঁচুদরের বিশেষজ্ঞের আর প্রয়োজন হইবে না, এবং তাহার ফলে জনসাধারণের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের হাতে সিধা পড়িবে। কিন্তু এই কাজে অগ্রণী হইবে কে? সহরের লোক কি আমার কথা আদৌ শুনিবে? অথবা আমার এ অরণ্যে রোদন হইবে? এই সকল এবং অন্যান্য প্রশ্নাদির উত্তর আমার অপেক্ষা শিক্ষানুরাগী যাঁহারা সহরে থাকেন তাঁহাদের উপর নির্ভর করিবে।

ইতিহাস-চর্চা

[শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য]

ব্যোমকে পুরোবর্তী করিয়া কিতি প্রবলবেগে আমার গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, বাঃ, তুমি তো বড় চমৎকার স্থানে আস্তানা গাড়িয়াছ!

শীতের মনোরম প্রভাতে জানালার ধারে বসিয়া একটু রৌদ্র সেবন করিতেছিলাম। কিতির কথায় জানালা দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম—হ্যাঁ, চতুর্দিকে যেরূপ ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের ছড়াছড়ি, আর তোমার যেরূপ ইতিহাস-চর্চায় অনুরাগ, তোমার ভাল লাগিবারই কথা!

ব্যোম ঘরের এক কোণে তাহার লগুড়াকৃতি যষ্টিটি রাখিয়া দিয়া আমার আরামকেদারার নিকটে চলিয়া গিয়া। তাহার পর তাহার লাল বর্ণের গলাবেষ্টনীর প্যাঁচ খুলিতে খুলিতে বলিল—আইস, ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজন কি সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

সমীর ও শ্রোতস্বিনী অপর পার্শ্বে জানালার ধারে কি একটা কৌতুকজনক ব্যাপার লইয়া স্মিতমুখে মৃদুস্বরে আলাপ করিতেছিলেন, এবং দীপ্তি একটা চেয়ারে ভাল করিয়া বসিয়া পশম বুনিবার সরঞ্জাম আয়োজন করিতেছিলেন। ব্যোমের কথায় সচকিত হইয়া তাঁহারা সকলে তাহার দিকে তাকাইলেন। ইতিহাস-চর্চার কথা তোলারূপ অপরাধ আমিই করিয়াছি—অতএব কিতি রোষকষায়িত লোচনে আমার দিকে চাহিতেই সঙ্কোচে মরিয়া গিয়া আমি বৎসর হিসাবে বাঁধানো একখণ্ড 'শিক্ষা' খুলিয়া তাহার অন্তরালে আত্মগোপন করিবার প্রয়াস পাইলাম।

ব্যোম কিন্তু এই সব ছোটখাট ব্যাপারে বাধা না মানিয়া বলিয়া চলিল—দেখ, চিরকালই আমরা ইতিহাস বলিতে মোটামুটি রাজাদের বা নেতাদের উত্থান-পতনের ঘটনাপঞ্জী আর সেই সঙ্গে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, কৃষ্টি-বিষয়ক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতির একটা সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করিয়া আসিয়াছি। সত্য বটে, কোন দেশের কোন সময়ের কোন রাজা বা নেতার জীবনী আলোচনা করিলে সেই দেশের সেই সময়ের ঘটনাবলীর কারণ, বিকাশ ও পরিণতির নিদর্শন পাওয়া যায়, এবং তাহাতে কি ভাবে জাতিটি দাঁড়াইল বা অধঃপতিত হইল তাহার একটা হদিশ পাওয়া যায়। কিন্তু—

দীপ্তি পশমের গোলা এবং বুনিবার কাঠি দুইটি কোলের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলেন—তাহাই

কি ইতিহাস-শিক্ষার শেষ নহে? আমি জানিতে চাই, আমার দেশ কি ভাবে গড়িয়া উঠিল; আমি ক্রম অনুসারে তাহার পুরাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলাম—কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা ঘটিয়াছে দেখিলাম, তাহার পরিণাম দেশের জাতীয় জীবনের উপর কি ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিলাম, এবং তাহাতে দেশের একটা ধারাবাহিক উন্নতি-অবনতির হিসাবের নিকাশ পাইলাম। ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনও আমার সেই সঙ্গে সমাপ্ত হইল। ইহার অধিক আর কিছু বক্তব্যের প্রয়োজন তো আমি দেখি না।

শ্রোতস্বিনী কহিলেন, ইতিহাস-চর্চা কখনও এরূপভাবে রাজরাজড়ার জীবনী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাহার উৎপত্তি, পরিণাম ও ফল এবং তৎকালীন দেশের অবস্থা,—সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি—এইটুকুতেই পর্যবসিত হইতে পারে না, ইতিহাস-শিক্ষার প্রয়োজনও এই খানে শেষ হইতে পারে না। দেশের ধারাবাহিক উন্নতি-অবনতির হিসাব-নিকাশ ইতিহাসের কাজ, সত্য; কিন্তু কেবল ঐটুকু দিলেই দেশের উন্নতি-অবনতির পুরা হিসাব পাওয়া যাইবে না, বকেয়া থাকিয়া যাইবে। যে মূক জনসমষ্টি দেশের সব চেয়ে বড় অংশ, তাহাদের ইতিহাসও জানিবার প্রয়োজন আছে, দেশের গঠনে তাহাদেরও দান আছে। তাহারা অস্থি দিয়া যে ইট প্রস্তুত করিয়াছে, রক্ত দিয়া যে চুনসুরকী মাখিয়াছে, বড় বড় নেতারা তাহাই লইয়া ইমারত গড়িয়াছেন। সুতরাং যাহার অর্থে প্রাসাদ হইল তাহার নাম মুখস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে কে স্থপতি তাহাও জানা দরকার। যিনি সেতু বন্ধন করিলেন, তিনিই ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আর যে পাথর বহিল, যে কাঠ আনিল, যে আর কিছু না করুক বেলা-ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া খানিকটা বালুকণা আনিল, তাহাদের কি ইতিহাসে কিছুই দাম নাই?

দীপ্তি একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন, যদি থাকে, তাহা নিতান্তই নগণ্য। আজকালকার দিনে, বিশেষ এই গণজাগরণের যুগে স্রোতস্বিনীর কথাগুলি শুনিতে মন্দ লাগে না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখিব, উহা বাষ্পের কাহুস মাত্র। চিরকালই একদল চালাইয়াছে, একদল চলিয়াছে। যাহারা চলিয়াছে, তাহারা নির্বোধমত কাজ করিয়াছে, উঠিয়াছে, বসিয়াছে, খাইয়াছে, যন্ত্রের মত চলিয়াছে, তাহাদের পৃথক কোন সত্তা নাই। যাহারা চালাইয়াছে, তাহারাই ইতিহাস গড়িয়াছে। সমুদ্রের অনন্তবীচির মালা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না, কিন্তু প্রচণ্ড ও বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের আঘাতে কি হইল, কয়টা জাহাজ ডুবিল, কোন বন্দর ভাসিয়া গেল, তাহাই ভাবিতে বসে। মূক জনসাধারণ বলিয়া একটি বস্তু থাকিলেও আসলে যে মস্তিষ্ক তাহাদের চালনা করে, তাহারই কাহিনী ইতিহাসের উপজীব্য। অত্যন্ত গণতন্ত্রাভিমানী দেশেও গণের চেয়ে গণনেতার কথা ইতিহাসে বলিয়া আজিও স্বীকৃত। নেপথ্য বলিয়া রঙ্গমঞ্চের যে প্রয়োজন, শ্রোতস্বিনী কথিত জনসাধারণেরও ইতিহাসে সেই প্রয়োজন।

শ্রোতস্বিনী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, আমি বোধ হয় আমার কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারি নাই। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় বুঝিতে কষ্ট হইবে না। সুরম্য মর্মর হর্ম্য দেখিয়া সম্রাটের কলাবিদ্যায় অনুরাগ ও শিল্পীপ্রেমের প্রগাঢ়তা ভাবিয়া চমৎকৃত হই, কিন্তু যে দাস চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া নির্মম কশাঘাত সহ্য করিতে করিতে প্রস্তর বহিয়া আনিল, তাহার চোখ দিয়া তো কই সম্রাটকে দেখি না। দেখে শ্রমিকের অভাবে ক্ষেত্রে শস্য জন্মাইল না, মুক্তিক চলিতে থাকিল, কিন্তু সম্রাটের হর্ম্য নির্মাণ স্থগিত রহিল না;—ক্ষুৎপীড়িত কঙ্কালসার শিশু বক্ষে লইয়া গ্রামবধূ স্থাপত্যের সেই অত্যাশ্চর্য নিদর্শনের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল তাহাতো ইতিহাসে আলোচনা করি না! সুন্দরী জনপদবধূ সম্রাটের বিলাস লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য

অপহৃত হইল, তাহার ও তাহার স্বজনবর্গের মন দিয়া তো কই পত্নীপ্রেমে মুগ্ধ সম্রাটের বিচার করি না! আমার মতে তৎকালীন ইতিহাসের প্রকৃত রূপটি পাইতে হইলে এই দুই দিক দিয়াই দেখিতে হইবে, এবং তাহার পর আমাদের মন দিয়া সমগ্র বস্তুকে সূক্ষ্ম ভাবে যাচাই করিতে হইবে। তবেই আমরা প্রকৃত ইতিহাস পাইব, দেশের উন্নতি-অবনতির কারণ ও ফলাফল আবিষ্কার করিতে পারিব, এবং ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজন তখনই সার্থক হইবে।

সমীর বলিল, যদি নীতি এবং স্রোতস্বিনী অতীত যেন, তাহা হইলে বলি, ইতিহাস-চর্চার কোনই প্রয়োজন নাই। আমাদের কাজ অগ্রগতি লইয়া, জীবন আমাদের ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে সম্মুখের পানে। আজ যাহা করিলাম, কাল তাহা বৃথা, কালের যাহিরে। আবার নূতন সৃষ্টি করিতে হইবে। এই যে ক্রমাগত নূতনের পর নূতন সৃষ্টি করিয়া যাইতেছি, ইহাতে পিছন ফিরিবার স্থান কোথায়, পুরাতনের দিকে তাকাইবার অবকাশ কোথায়? পুরাতন পাছে কিলটি লাগাইয়া তোমাকে পিছটানে টানিতে থাকুক, ইহা তুমি নিশ্চয়ই চাহিবে না। ধূলিমলিন বল্মীক-সমাচ্ছন্ন ভাঙা ভাঙা হইয়া-পড়িতে-থাকা পুরাতনকে লইয়া তুমি কি করিবে? সে পুরাতনকে আইস, ধ্বংস করি, এবং তাহার পর নূতন সৃষ্টির আনন্দে মত্ত হই। ইতিহাসের তাই কোন প্রয়োজন নাই, আইস, তাহাকে পুড়াইয়া ফেলি। আমাদের অতীতকে জাগাইবার কি আবশ্যক, যখন ভবিষ্যতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা লইয়া আমাদের কারবার?

কিন্তি কহিল, কিন্তু ভবিষ্যতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা তুমি করিবে কিরূপে, যদি অতীতের সন্ধান না পাও? তুমি বলিতেছ, তুমি বিংশ শতাব্দীর মানব পুত্র, অতীতের সঙ্গে কোন প্রয়োজনই তোমার নাই। কিন্তু আদি হইতে ঊনবিংশ পর্যন্ত শতাব্দীর পরিচয় না থাকিলে এটা যে বিংশ শতাব্দী তাহা জানিতে পারিলে কিরূপে? তুমি কি বুঝিতেছ না যে, ইতিহাসকে জানার আদল প্রয়োজন এইখানে? চিকিৎসক রোগীর রোগের শুধু বর্তমান বিবরণ শোনেন না, আদ্যোপান্ত বিবরণ শোনেন। তাহার কাজের একটা বিরাম শেষ হইতেই রাখিতে চেষ্টা করে। সকলেই দেখ, যে জিনিস লইয়া কাজ কারবার করে তাহার আদ্যপূর্বিক বিবরণ রাখিতে চেষ্টা করে। কেন? কাজের সুবিধা হয়, তাহার ধারা ও গতি ধরিতে পারা যায়। অতীতে কি ভাবে চলিয়া কি ফল পাইয়াছি, কি ভুল করিবার ফলে কি ক্ষতি হইয়াছে, জানিতে পারি, এবং তাহার জন্য ভবিষ্যতে কি করিলে কি ফল পাইব ও তাহার জন্য কি ভাবে চলিতে হইবে তাহার নির্দেশও পাই। ইতিহাস শুধু তাই নয়, সভ্যতার গঠনের কথা জানাইয়া ক্ষান্ত হয় না, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহারও একটা নির্দেশ দেয়।

আমি কহিলাম, ঠিক কথা। এইজন্যই কার্লাইল ইতিহাসকে Philosophy teaching by experience বলিয়াছেন, কালের আবর্তনে ঘটনার পরিবর্তন যুগে যুগে হইতেছে। আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, প্রত্যেটি পরিবর্তন অপরটি হইতে ভিন্ন। একটু ভাবিয়া দেখ, দেখিবে, বাহ্যিক রূপে উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু মূল সূত্র-গুলি এক। নিয়তি অবিরত ঘুরপাক খাইতেছে—এবং নিয়তি অলঙ্ঘ্য, তবুও তাহাকেও আইন মানিয়া চলিতে হয়। ধূম না হইলে পর্বত বহ্নিমান হয় না, কারণ না থাকিলে কার্য হয় না। আবার একই কারণের বা কারণ-সমবায়ের জন্য একই ফল বা ফল-সমবায় ঘটিবে। তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে বুঝিতে হইবে, আমরা ঠিক কারণটি অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। আমাদের ইতিহাস পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হইবে, প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা। কোন কারণে কোন ফল, তাহা জানিলে

ভবিষ্যতে কোন কারণে কি ঘটিবে তাহাও বুঝিতে পারিব। ইতিহাস আসলে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, সে নিয়তির সাক্ষীরূপে আমাদের এই কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধানের ক্ষেত্র যোগাইয়া যাইবে, তাহার মহাযোজনা হইতে আমরা আমাদের বিশ্লেষণের উপকরণ সংগ্রহ করিব। তাহাতে আমরা শুধু অতীতকেই যে বুঝিব তাহা নহে,ভবিষ্যৎকেও আগে হইতে অনুমান করিতে পারিয়া সেইভাবে প্রস্তুত হইতে পারিব। তাই ইতিহাস যে শুধু অতীতের অন্ধকারকে আলোকিত করে তাহা নহে, ভবিষ্যতের তাহাও উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। তবে একটা কথা আছে। স্রোতস্বিনীর কথামত শুধু এক দিক দিয়া বিচার করিলেই চলিবে না, অপর দিকটাও দেখিতে হইবে, শুধু রাজারাজড়ার খবর লইলে চলিবে না, গরীবের ঘরেরও খবর লইতে হইবে। তবে স্রোতস্বিনী তাহার স্বাভাবিক কর্তব্যবশত অত্যাচারী শাসকবর্গের প্রতি যেন একটু বেশী বিদ্বেষ ভাব দেখাইয়াছেন—এই স্থলে স্রোতস্বিনী সলজ্জ ভাবে আমার কথার প্রতিবাদ করিলেন—তাহা করিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ ব্যক্তি হইবেন, তাঁহাকে উভয় পক্ষেরই চিত্র লইতে হইবে, একটি অপরের পরিপূরক হিসাবে, এই দুই চিত্র একত্রে ধরিয়া তিনি যে উপলব্ধি পাইবেন তাহা হইতে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া মূলসূত্রে আসিতে হইবে। তবেই আমরা ইতিহাস শিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন সাধন করিতে পারিব।

স্রোতস্বিনী আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আমার একটু প্রতিবাদ করিবার আছে। আমার কথা তোমরা একটু ভুল বুঝিয়াছ। আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে ইতিহাসকে তোমরা শাসকবর্গের নীরস কুলপঞ্জীরূপে গ্রহণ করিও না, উহাতে তোমরা যাহাকে ইংরেজিতে বল human interest, তাহাই একটু আমদানি করিও, নীরস কঙ্কালে একটু রক্তমাংসের সঞ্চার করিও।

আমি কহিলাম—আমিও তো সেই কথাই বলিতেছি। শুধু পার্থক্য এইখানে যে ঐতিহাসিক যখন এই human interest-টুকু আমদানি করিবেন তখন তিনি কোনরূপ উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ হইয়া তাহা করিবেন, শুধু সত্যের সন্ধানেই তাহা করিবেন।

ব্যোম এইবার একটু নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, তোমরা এত বড় বড় কথা লইয়া যাহা বাধাইতেছ, কিন্তু আমাকে ছোট কথাটা বলিতে দিতেছ না। আমি বলিতে চাই—

সমীর বলিল, ব্যোম, তোমার ছোট কথা বুঝিতে সচরাচর যে পরিমাণ চিন্তিকার প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই, অতএব—

ব্যোম বাধা না মানিয়া বলিয়া চলিল, মানুষ তাহার সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সত্যের অনুসন্ধানের আপ্রাণ ও অবিরাম চেষ্টা করিতেছে। সেই সত্য-সন্ধানের প্রয়াসের ইতিহাসই তাহার ইতিহাস। এই ইতিহাস আমাদের জানাইতে হইতেছে যে এই পথ দিয়া মানুষ সত্যকে খুঁজিতে চাহিয়াছিল, তাহার এই এই ফল পাইয়াছে। সুতরাং সে বুঝিতে পারে, তাহাকে এই এই পথ দিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে হইবে। এই জন্যই তাহার ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজন। যেদিন সে চরম সত্যকে জানিতে পারিবে, সেদিন তাহার ইতিহাসেরও প্রয়োজন ফুরাইবে।

আমি কহিলাম, এতটা দার্শনিক তত্ত্বে না গিয়া আমি তো বলি যে, মানুষ ইতিহাসের মধ্য দিয়া আপনার বিকাশ ও পরিণতির ধারাবাহিকতা জানিতে পারে। তাহার বিকাশ কেন, কি কি যোগে তাহার এই বিকাশ, কি কি বিরোগে তাহার বিকাশের কোথায় অভাব ঘটিতেছে তাহা জানিয়া সেই সেই জিনিষের সন্ধান করিতে পারে, যাহাতে তাহার বিকাশের পূর্ণতা হয়। একটু আগে এই কথাটাই প্রকারান্তরে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং এখন আবার বলিতেছি। ঐতিহাসিকের কাম এই

বিকাশ ও পরিণতির মূলসূত্ররূপ যে সত্য তাহারই সন্ধান, এবং ইতিহাসেরও প্রয়োজন সেই জন্য।

নদীর ঢেউয়ে ঠেলিয়া ধাক্কাইয়া উঠিয়া কবিল, বেলা যখন বাড়িয়াছে আর রৌদ্রেরও একটু তেজ হইয়াছে, তখন এই শীতের দিনে এসব নীরস আলোচনা মুলিত রাখিলে ভাল হয় না? আমি প্রস্তাব করি, ওই যে অদূরে ঐতিহাসিক অংশাবশেষ দেখা যাইতেছে, আইস, তথায়ে আমরা বেড়াইতে বেড়াইতে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার প্রত্যক্ষ অনুধাবন করি। আর শ্রীমতী দীপ্তি ও শ্রীমতী শ্রোতস্বিনী যখন আছেন, তখন চা ও জলযোগ সরবরাহ করিয়া তাঁহারা human interest-ও যোগাইয়া যাইবেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। তাল কথা, যোষ, পথে যাইতে যাইতে তোমার এই লণ্ডভণ্ড তাঁবুর গদায় বংশখণ্ড কিনা, সে বিষয়ে একটা ঐতিহাসিক গবেষণাও চলিতে পারে।

শিক্ষা-সমস্যার একদিক

[শ্রীমতী বকুলমালা সেন]

আমাদের দেশে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন যে আবশ্যক, এ বিষয়ে দেশহিতব্রতী শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা আশার কথা। এ আশা পূর্ণ করিবার ভার শিক্ষা-ভবনী কুলে ছিড়াইবার দায়িত্ব যাঁহাদের হাতে, তাঁহাদের কর্তব্যবোধ জাগরিত হওয়া অবশ্যই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহা না হইলে সারগর্ভ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত পুঁথির পোতা বর্ষণ করিয়া নিষ্ক্রিয় পরম ব্রহ্মের মত স্বয়ং সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াই থাকিবে।

কিন্তু শিক্ষকগণের দায়িত্ব পালনের পথও সুগম নয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার আধুনিক রূপায়ণ হইয়াছে ব্রিটিশ যুগের প্রথম আমলে, ইউরোপীয় মিশনারীগণের উদ্যোগে—বৈদেশিক রাজশক্তির প্রভাবে। তখন তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজনে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষাদানের যে কাঠামো তৈরী করিয়াছিলেন, যে কাঠামোকে ভিত্তি করিয়া তাঁহারা আপনাদের অভিরুচি অনুযায়ী বাস্তবমূর্তি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আজও অপরিবর্তিত আছে। পরবর্তীকালে মুষ্টিমেয়ের বিচার-বিশ্লেষণে তাহার যে যে অংশের কুশ্রীতা, অযোগ্যতা ধরা পড়িয়াছে, তাহারই মাত্র সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে; কাঠামোতে হাত দেওয়া হয় নাই বলিয়া প্রতিমার রূপ প্রায় অপরিবর্তিতই রহিয়া গিয়াছে।

শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দিকে প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের। তাঁহার চিন্তাসঞ্জাত কল অপূর্ব সুষমায় বিশ্বভারতীকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার পর এ বিষয়ে কার্যকরী প্রচেষ্টা দেখা গেল গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষানীতি রচনায়। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া ইহার স্বতন্ত্র রূপ আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সাধারণত যে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া আজও প্রায় সকল শিক্ষার্থীই শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, সেগুলির ভিত্তিভূমির কোন পরিবর্তনই ঘটিল না। তাহার ফলে নব নব ব্যবস্থা করিয়া যে সুফল লাভের আশা করা হইল, তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বর্তমান কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্র ছাত্রীগণের শোচনীয় অকৃতকার্যতায় তাহাদের নিন্দাবাদে মুখর হইবার আগে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা-গণও সংশ্লিষ্ট শিক্ষায়তনের চিরাচরিত বিশেষ প্রকৃতি অতিক্রম করিতে না পারিয়া যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করিতেছেন, তাহা আধুনিক শিক্ষাবিদ্-গণের মনীষাসম্ভূত নয়; দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার মূল উৎস খুঁজিতে আজও অনুসন্ধানী দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে হয় সেই ব্রিটিশ আমলের প্রারম্ভিক যুগে, জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় শ্রদ্ধাহীন কেরানী সৃষ্টি করাই ছিল যাহার উদ্দেশ্য, সে শিক্ষার কোন রূপে গোটা কয়েক প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারাই যথেষ্ট ছিল সন্দেহ নাই। পরবর্তী কালের পরিবর্তিত রাষ্ট্রনীতির অন্তরালে সেই নীতিই প্রচ্ছন্ন থাকিয়া পাঠ্যসূচীতে নূতন নূতন বিষয় সন্নিবেশের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতেছে। শিক্ষণীয় সাহিত্য নির্বাচনে সুলেখকগণের ভাবঘন পূর্ণ রচনার নির্বাচনে সকল দক্ষতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পণ্ডশ্রমে পরিণত হইতেছে। শিক্ষকগণের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীগণ তাহা আপ্রাণ চেষ্টায় গলাধঃকরণ করিতেছে শুধু পরীক্ষার উত্তরপত্রে উদ্গীরণ করিবার জন্য। অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ স্বীয় অভিজ্ঞতা কার্যে পরিণত করার সুযোগ পাইতেছেন না, শিক্ষালয়ের ব্যবস্থায় অনমনীয়তায়। শিক্ষালয়-ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে অনেক আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া বিদ্যালয়ের গতি পার হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু শিক্ষাবিদ্‌গণ প্রশ্ন পত্র রচনা করিতেছেন শিক্ষার বর্তমান আদর্শ অনুযায়ী ফল-লাভের আশায়। তাঁহারা চাহিতেছেন জ্ঞানের, চিন্তাশীলতার, বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। তাহার ফলে ছাত্রছাত্রীগণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের শতকরা হার তিনের কোঠা হইতে দুই এর কোঠায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। এভাবে আর কিছুদিন চলিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দেখিয়া বিচারে আমাদের রাষ্ট্রশক্তি আতিপত্ত ভাবে বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে প্রমাণিত হইতে বিলম্ব হইবে না।

বর্তমানে যে পথ অবলম্বন করিয়া শিক্ষার মান ও প্রকৃতি উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে, তাহার দ্বারা এ সমস্যার জট খুলিয়া সহজ সরল পথের প্রবর্তন করিতে হয় তো সময় লাগিবে। কিন্তু এই মধ্যবর্তী কালে বিদ্যোৎসাহী বিদ্যোৎসাহীগণের মনে আশাভঙ্গ জনিত যে নিরুৎসাহ দেখা দিতেছে, সে ক্ষতির পরিপূরণ হইবে কি করিয়া? এই নিরুপায়ের বেদনা পরে যদি বিদ্রোহের বহ্নি হইয়া দেখা দেয়, তাহার ফলে সমাজ কি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না? এই পথ অনুসরণ করিয়া শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষালয়ের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ অধিকতর কটু হইয়া উঠিতেছে। পরীক্ষার্থীর ভিক্ত অভিজ্ঞতা তাহাকে একই সঙ্গে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীন করিয়া তুলিতেছে। এই দুর্নীতিকে রোধ করিবার জন্য রোগান্তর কোন পন্থা গ্রহণ সম্ভব কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

বাংলা ব্যাকরণের পাঠক্রম

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

ব্যাকরণের নামে বিদ্যালয়ে বিভীষিকা আসে, ইহা শুধু এখনকার অভিজ্ঞতা নয়; সুতরাং কতখানি ব্যাকরণ পড়াইব, তাহা শিক্ষকের পক্ষে যথাযথই ভাবিবার কথা। সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে নূতন করিয়া এক বোর্ড নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার নিকটও এই আলোচনা অবশ্যই উপস্থিত হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয় এতদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষার ভার নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন, ততদিন এ বিষয়ের কোন স্থির সমাধান তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহা হইলেও তাঁহারা এই বিষয়ের আলোচনার জন্য ১৯৪৪ সালে এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই কমিটি নিম্নলিখিত রূপ পাঠক্রমও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সহকর্মী ব্যাকরণ শিক্ষকদের বিচারের জন্য ইহা এখানে দিলাম।

ক

ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য

১। বাংলা ভাষা ও উহার সাধু ও চলিত দুই রূপ। বাক্য ও তাহার অংশ, উদ্দেশ্য ও বিধেয়, পদপরিচয়। যতি।

২। বাংলা বর্ণমালার শব্দ ও বর্ণ, তাহাদের সাধারণ শ্রেণীবিভাগ ও সংযুক্ত বর্ণ।

৩। সন্ধি, শব্দবিভাগ, শব্দবিভাগ।

৪। শব্দের ব্যুৎপত্তি; (ক) সহজ সংস্কৃত মূল প্রত্যয় (যেমন অল্, অস্, অঞ্, অনট্, ণ্যুট্; ই, কি, ভি, ক্তিন্; ক্ত, ক্তবতু, অনীয়, য, ণ্যৎ, যৎ, অক, তৃ)।

(খ) সহজ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় (যেমন ত্ব, তা, ইক, আ)।

(গ) সহজ বাংলা কৃৎ প্রত্যয় (আন্, আনো, ইয়, উয়, অন্ত)।

(ঘ) সহজ বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় (ই, ঐ, মি, পিনি, দার)।

৫। স্ত্রী প্রত্যয়, নির্দেশক প্রত্যয় (টা, টি, খান্‌টা, খানি, গাছা, গাছি।

৬। বাংলায় সমাস—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ (উপপদ তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব শুদ্ধ) কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি।

৭। বিশেষ্য—লক্ষণ; লিঙ্গ, কারক, বচন।

৮। কারক ও বিভক্তির সহজ প্রয়োগ।

৯। সর্বনামের রূপ।

১০। সর্বনামবাচক বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ।

১১। বিশেষণ—গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক।

১২। বিশেষণের তারতম্য; সংখ্যা—সাধারণ ও নির্দেশক।

১৩। ক্রিয়া; সহজ সহজ ধাতু (প্রাথমিক নিষ্পন্ন ও সংযুক্ত), সমাপিকা ও অসমাপিকা, সকর্মক ও অকর্মক, কাল, বাচ্য, ধাতুরূপ, সংযুক্ত ক্রিয়া।

১৪। অব্যয়।

১৫। বাক্যসংস্থান, উদ্দেশ্য ও বিধেয়, বাক্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রীতি, বিভিন্ন প্রণালীর বাক্য—সরল, মিশ্র, জটিল; কালের পৌর্বাপর্য।

১৬। ছন্দের জ্ঞান—স্বরাঘাত; পয়ার, ত্রিপদী চতুষ্পদী, অক্ষরবৃত্ত স্বরাঘাত প্রধান (শুধু সাধারণ লক্ষণ শিখিতে হইবে)।

১৭। সহজ অলংকার—অনুপ্রাস, যমক, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস।

খ

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার মান হিসাবে কমিটি নিম্নলিখিত রূপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

১। ভাষা—লিখিত ভাষা ও ব্যাকরণের বিভিন্ন ভাগ।

২। আরও বিস্তৃত ভাবে ব্যুৎপত্তি ও সমাসের আলোচনা।

৩। উপসর্গ, এবং বিভক্তি ও তাহার প্রয়োগ।

৪। আরও বিস্তৃত ভাবে শব্দরূপ ও ধাতুরূপ শিক্ষা।

৫। বাক্য।

৬। সংযোজক অব্যয় ও তাহার প্রয়োগ-রীতি।

৭। অন্যান্য বাগ্‌ধারা।

৮। আরও বিস্তারিতভাবে ছন্দ ও অলংকার শিখিতে হইবে।

গ

বি. এ. পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত রূপ পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হইয়াছিল:

১। ভাষা ও তাহার বৃত্তি; লিপির সৃষ্টি।

২। ব্যাকরণের বিভিন্ন ধারা, বর্ণনামূলক, ইতিহাসমূলক ও তুলনামূলক।

৩। লিখিত ও চলিত কথার ভাষা; প্রধান প্রধান উপভাষা ও তাহাদের লক্ষণ।

৪। বাংলা উচ্চারণ, শব্দবিজ্ঞানের দিক দিয়া ভাগ, উচ্চারণের ধ্বনির উপর জোর এবং সুর, পদের অংশ।

ভাষার পরিবর্তনের কতকগুলি সাধারণ রূপ, স্বরভক্তি, অপিনিহিতি, সমীকরণ, বিষমীকরণ, বিপর্যয় প্রভৃতি।

বাংলার শব্দ; উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ও বিদেশী বাংলার বিভিন্ন স্তর ও তাহাদের প্রধান প্রধান লক্ষণ, পুরাতন বাংলা, মধ্যযুগের বাংলা, আধুনিক বাংলা ও ভ্রমধ্বনি।

৫। বাংলার শব্দরূপ ও ধাতুরূপের ঐতিহাসিক আলোচনা; সংখ্যা; শব্দগঠনের প্রত্যয়।

৬। ভাববাচ্য—বাংলা শব্দার্থবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান ধারা।

আমাদের বি. এ. পরীক্ষার মান পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণের ক্রম এইরূপে ভাগ করিয়া পড়াইলে বিভীষিকা কতদূর বিদূরিত হইবে, তাহা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এই পাঠক্রম সম্মুখে রাখিয়া মাধ্যমিক বোর্ডের কর্তৃপক্ষ যদি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাকরণ পাঠের ক্রম নির্দেশ করিয়া দেন তাহা হইলে ছাত্রদের পক্ষে তাহা শেখা সহজ হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীশরৎচন্দ্র বসু]

Technique in Physical Education by Joseph Edmundson M. C. pp. 100 First published in 1950. George G. Harrap & Co., Ltd. Price 9s 6d. net.

আলোচ্য পুস্তকখানি মূলতঃ প্রাথমিক ব্যায়াম শিক্ষাস্তরগুলির ব্যায়াম-শিক্ষকদের জন্য লিখিত হইলেও যাঁহারা মধ্যবিদ্যালয়, ছাত্রীবালক প্রভৃতির মত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করেন, এবং কিশোর-কিশোরীদের শরীরচর্চায় আগ্রহশীল, তাঁহারাও পুস্তকখানিতে খেলাধূলা ও ব্যায়াম শিক্ষণ বিষয়ে যথেষ্ট ভাল মতলব পাইবেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ব্যায়াম শিক্ষণ পদ্ধতি ছাড়াও, খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ ও সন্তরণ প্রতিযোগিতা সংগঠন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। অল্প পরিসর স্থানের উপযোগী অনেকগুলি খেলার নিয়মের বর্ণনা পুস্তকখানিতে আছে এবং নক্সার সাহায্যে এইরূপ খেলার বিভাগাদির আলোচনা করা হইয়াছে। দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বয়সের কিশোর-কিশোরীদের কৃতিত্বের মানও পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

অয়োদশ পরিচ্ছেদে বিলাতের প্রখ্যাতনামা ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রী জে. পি. ওয়াকার শরীরশিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে অদূর ভবিষ্যতে শরীর-চর্চা শিশুর দেহ ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যম হিসাবেই গৃহীত হইবে। তাঁহার মতে, 'The aims of physical education embrace not only physical growth and powers, which are important, but also more moral strength and social qualities.' দৈহিক সমৃদ্ধি ও শক্তির উৎকর্ষ সাধনই শরীর শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। নীতির পথে ও সমাজের কল্যাণে কিশোর-কিশোরীদের অভিবৃদ্ধি জাগ্রত করাও ইহার লক্ষ্য।

পুস্তকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। পুস্তকখানিতে বিলাতের শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রকাশিত '1939 Syllabus of Physical Training for Schools' নামক গ্রন্থের প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থটিকে প্রমাণ-কোষ হিসাবেই ব্যবহার করা হইয়াছে। যাঁহারা আলোচ্য পুস্তকখানি শরীরশিক্ষার কাজে ব্যবহার করিবেন, তাঁহাদের উচিত এই গ্রন্থটির একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া লওয়া। কারণ এই গ্রন্থ নিরপেক্ষ হইয়া এডমণ্ডসন্ সাহেবের বই-এর নির্দেশ সব ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যায় না, এবং সেই হিসাবে উক্ত গ্রন্থের অভাবে আলোচ্য পুস্তকটির ব্যবহারিক মূল্যও অনেকখানি কমিয়া যাইবে।

Indian Child Art. Oxford University Press. Mount Road, Madras 2. Re 1/-

বইখানা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। এই ধরণের বই এই প্রথম। সংগৃহীত ছবিগুলি প্রায়ই সাধারণ শিশুর অপেক্ষা একটু বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের আঁকা, কিন্তু ইহারা সাধারণ শিশুর মত সুযোগসুবিধা পায় নাই। সেইজন্য ইহাদের কাজ প্রণিধানযোগ্য। এই রকম বইয়ে প্রায়ই বিদেশের ছেলে-মেয়েদের কাজের নিদর্শন আমরা পাই, শিক্ষককে এদেশের সঙ্গে মানাইয়া নিয়া ঐগুলি কাজে লাগাইতে হয়। এই বইটিতে এই দেশেরই ছেলেমেয়েদের কাজের নমুনা দেওয়া হইয়াছে, এবং নির্দেশগুলি বেশ স্পষ্ট। সেইজন্য শিক্ষকের পক্ষে নিজের নিজের পরিবেশ ও মানসিকতা অনুযায়ী কাজ করার খুব সুবিধা হইবে।

তবে এখানে বলা দরকার, বিগত কয়েক বৎসরে তাহাদের বিদ্যালয়গুলিতে এই ধরণের শিল্পকাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে, এবং অনেক জায়গায় বেশ ভাল কাজও পাওয়া গিয়াছে। শিশুশিক্ষার এই দিকটায় যাঁহাদের আগ্রহ, তাঁহাদের পক্ষে বইখানি খুব উপকারে আসিবে। ইস্কুলে পেন্সিল-স্কেচিংয়ের যে ধারা চলিয়া আসিতেছে ইহাতে তাহার বাহিরে খানিকটা নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইবে। ফলতঃ আনন্দে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আন্তরিক যোগ স্থাপিত হইবে। পিছনের অংশটি, যেখানে সিলেবাস ও পঠনযোগ্য বইয়ের তালিকা দেওয়া আছে, তাহা শিক্ষকদের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

লেখিকা বর্তমানে মাদ্রাজ শহরে আনোদয় ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ পুস্তকের মূল্য আছে। অভিজ্ঞতাই যে তাঁহার বক্তব্যের ভিত্তি।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের

সাহিত্য-প্রসঙ্গ
বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ

সাময়িকী
সংস্কৃতি প্রবন্ধ

আমাদের সাহিত্য
বিদ্যালয় পাঠ্য

বিবেকানন্দ চরিত
স্বামীজীর জীবন কথা

বাংলা পড়ানো
পড়াইবার প্রণালী আলোচনা

বাংলা সাহিত্যের খসড়া
সাধারণ পাঠকের উপযোগী

রায় রামানন্দের ভনিতাযুক্ত পদাবলী

প্রাপ্তিস্থান : সেন রায় এণ্ড কোং লিমিটেড
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মহাত্মাজীর দিল্লী ডায়েরী

১৩-৯-৪৭—২১-১-৪৮ প্রার্থনা ভাষণ

মূল্য ৪৲

হরিজন পত্রিকা কার্যালয়

২৭।৩ বি হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মহাত্মা গান্ধীর প্রতিষ্ঠিত

হরিজন পত্রিকা

বাংলা সংস্করণের বার্ষিক চাঁদা ৬৲

প্রাপ্তিস্থান : ২৭।৩বি হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১ম বর্ষ | ভাদ্র ১৩৫৮ | ১০ম সংখ্যা

আলোচনা

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের হীরক জয়ন্তী

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কলিকাতায় দশদিনব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন হয়। প্রাক্তন ও বর্তমান বহু সদস্য ইহাতে যোগ দেন। উদ্বোধন দিবসে বর্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এই পরিষদের সূচনা হইতে বর্তমান পর্যন্ত ইতিবৃত্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেন। তিনি বলেন, এই ইন্‌স্টিটিউট আত্ম:-কলেজ কর্মপ্রচেষ্টার ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার কেন্দ্রস্থল। ছাত্রসমাজের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি ইহার লক্ষ্য।

উদ্বোধন দিবসের সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলা দেশের অনেক বড় বড় লোক ইহার সভ্য ছিলেন এবং ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগের সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া ইহার গৌরব ও মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তিনি বলেন, ছাত্রগণ যেন মনোবিরোধ ভাবে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া তোলে; তবে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে। হীরক জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রদেশপাল মাননীয় ডাঃ কাটজু। তিনিও এই পরিষদের অতীত গৌরবের কথা ছাত্রদের স্মরণ করাইয়া দেন। লেখাপড়া ছাত্রদের প্রথম কর্তব্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার বাহিরেও তাহাদের শিক্ষণীয় ও করণীয় অনেক কাজ আছে। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান নিতান্তই দরকার যাহা ছাত্রগণ নিজেদের অন্তরের প্রীতিবলে, যত্নে ও সেবায় গড়িয়া তুলিবে।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা

যতদিন পর্যন্ত বেথুন কলেজই ছিল মেয়েদের একমাত্র মহাবিদ্যালয়। পরবর্তী কালে দক্ষিণ কলিকাতায় মিশনারি কর্তৃপক্ষের পরিচালিত ডায়োসিশন ও লোরেটো কলেজ দুইটি বেশ জনপ্রিয় হয় ও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথ অনেকটা সুগম করে। ক্রমে অবশ্য ডায়োসিশন কলেজটি উঠিয়া

গেল, বেসরকারি অনেক কলেজে ছাত্রদের সঙ্গে অথবা একই ভবনে পৃথক সময়ে মেয়েরা পড়িতে থাকে; কিন্তু তবু স্থানের যথেষ্ট অভাব ছিল। দক্ষিণ কলিকাতায় একাধিক কলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াও এ অভাব পূর্ণ হয় নাই। এই অভাব পূরণের জন্যই কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলা সরকার দক্ষিণ কলিকাতায় লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজটি স্থাপন করেন। নীচু আমলে ইহা মুখ্যত মুসলমান মেয়েদের জন্যই ছিল। শতকরা ৬০টি মুসলমান মেয়ে লইয়া তবে ৪০টি অ মুসলমান সভ্যার বিধি ছিল। দক্ষিণ কলিকাতার এক প্রান্তে অবস্থিত সুপরিসর ভূমিতে অবস্থিত এই মহাবিদ্যালয়ের গৃহটি অতি রমণীয়। ১৯৫১ সনের অক্ট হইতে ইহা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভাবে সর্বশ্রেণীর মেয়েদের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে ইহা ক্রমেই অধিকতর উন্নতির পথে চলিয়াছে।

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে পঠিত এই কলেজের বার্ষিক বিবরণী হইতে দেখিতেছি গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই কলেজের মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় খুবই ভাল ফল দেখাইতেছে। বর্তমান বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছে মোট ১৪ জন—তাহাদের মধ্যে ৪ জনই লেডী ব্রেবোর্ণের মেয়ে। সুখের অনার্সে ইহাদের দুইটি মেয়েই প্রথম শ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। লেখাপড়ার সঙ্গে মেয়েদের সঙ্গীতচর্চা ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষারও আয়োজন আছে। কলেজের পাঠ্যতালিকায় বাহিরে জীবনের নানারূপ বিকাশের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

মেয়েদের জন্য সম্প্রতি চাকুরীর একটি মহা-বিভাগের খোলা হইয়াছে। বিগত ১লা আগস্ট ইহার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়। ছাড়া সহরের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় যাতায়াতের অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যেই এই কলেজ স্থাপিত হয়। অনেকে বিনা পারিশ্রমিকে তত্ত্বাবধান ও অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের নিঃস্বার্থ সেবায় ও মেয়েদের আগ্রহে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলেজটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে। কলেজের পরীক্ষায় ফলও বেশ আশাপ্রদ। ছোট কলেজে শিক্ষক ও ছাত্রীদের মধ্যে যেমনটি সম্ভব; মেয়েরাও একান্ত সাধনায় পড়াশুনা করে। এখনও পড়াশুনার ব্যবস্থা ছাড়া মেয়েদের জন্য আর কিছু ব্যবস্থা করা যায় নাই বলিয়া কর্তৃপক্ষ বার্ষিক বিবরণীতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপকদের সক্ষমতা ও ছাত্রীদের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ক্রমে সকলদিকে কলেজটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার যত ব্যাপক হইবে, দেশের মুহূর্তের সার্থকতার পক্ষে ততই কল্যাণ হইবে।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব

বিগত ৩রা আগস্ট ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও ভাইসচ্যান্সেলার উভয়েই তাঁহাদের অভিভাষণ হিন্দীতে দেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাওয়া ডক্টর উপাধির এক বিশেষ মূল্য আছে। কারণ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম নিজের দেশের ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়াছে, এবং বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের পুস্তক ঐ ভাষায় প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছে।

তিনি বলেন, স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মতে ভারতে এমন সমাজ গঠন করিতে হইবে যেখানে প্রত্যেক নরনারী নিজ নিজ প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাইবে। শিক্ষাই শক্তি।

শিক্ষাহীন লোক আন্তর্বিকাশের বা রাষ্ট্রের কাজের ভার গ্রহণ করিতে পারে না, আর ব্যাপক ভাবে এই শিক্ষা শুধু মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই দেওয়া সম্ভব। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাহার শব্দসম্পদ, প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতির সামঞ্জস্য থাকা চাই। তাহা হইবে জনগণের অন্তরের প্রতিধ্বনি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে বহু ভাষা প্রচলিত; বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে আমাদিগকে একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার জন্য নাগরী লিপি ও হিন্দী ভাষা গ্রহণের উপযোগিতার কথা তিনি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

গ্রন্থাগার সপ্তাহ

সম্প্রতি কলিকাতার মহানগরী সোসাইটি ভবনে আলোয় গ্রন্থাগার প্রচারসমিতির উদ্যোগে জননেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি গ্রন্থাগার সপ্তাহের উদ্বোধন হয়।

যাহাতে পল্লী অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যায় পাঠাগার স্থাপিত হয়, তাহাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের সম্বন্ধ আধুনিক জগতে ঘনিষ্ঠ। আশা করি সমিতির চেষ্টা সফল হইবে, এবং দেশবাসীর জ্ঞানের ক্ষুধা দূর করিয়া গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষাকেন্দ্ররূপে কাজ করিবে।

পণ্ডিত মহাশয়

[শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়]

তখনকার দিনের অষ্টম শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত, এণ্ট্রান্স (আমার দাদার আর আমার বেলায়) আর ম্যাট্রিকুলেশন (আমার দুই ছোট ভাইয়ের বেলায়) পরীক্ষা অবধি মোতীলাল শীলের ফ্রী ইস্কুলে বিনা বেতনে আমরা চার ভাই আট বছর করে পড়ে মানুষ হই, মোতীলাল শীলের পুণ্য স্মৃতির প্রতি আমাদের অপরিশোধ্য ঋণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। ইস্কুলটি ১৮৩২ সালে স্থাপিত হয়; এর পুরোনো বাড়ী, চমৎকার বিতল ইমারত, বড় বড় ঘর, এখনও সগৌরবে চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে বিরাজমান। এই ইস্কুলে প্রত্যেকটি ছেলে বিনা বেতনে পড়ত বলে গরিব ছেলেদের ভীড় তখন বড্ড বেশী হ'ত। ইস্কুলের ব্যবস্থাতি পরিবর্তনের কোনও বালাই ছিল না, প্রত্যেক শ্রেণীতে কটি ক'রে ছেলে পড়বে তার কোনও বাঁধাধরা সংখ্যা ছিল না—বা থাকলেও তা পালন করা হত না। দুই সার বেঞ্চি নীচের ক্লাসগুলিতে, সামনে বই রাখবার জন্য উঁচু টেবিলের মত আর একটি ক'রে বেঞ্চি ছিল না। ছেলে ক্লাসে এত হত যে বেঞ্চিতে স্থান কুলাত না; মাটিতে বসবার জায়গা বিছিয়ে অনেক ছেলে ব'সত—মেঝেটা পাকা সিমেন্টের ছিল তাই রক্ষা। অষ্টম থেকে প্রথম পর্যন্ত আটটি শ্রেণী, প্রত্যেক শ্রেণীতে পৃথক পৃথক মাষ্টার ইংরেজি পড়াতেন, যিনি যে ক্লাসে ইংরিজি পড়াতেন সেটিকে তাঁরই ক্লাস বলা হত। প্রথম শ্রেণীতে হেড মাষ্টার মশায় ইংরিজি পড়াতেন। এ ছাড়া উপরের ক্লাস কয়টির গুরু বোধ হয় পণ্ডিতের মাষ্টার একজন বেশি ছিলেন, আর ছিলেন দুজন

পণ্ডিত মশায়। নীচেকার ক্লাসে একজন মাষ্টারের উপরেই ক্লাসের সব বিষয় পড়ানোর ভার থাকত—কেবল নীচের ক্লাসে বাঙলা আর উপরের ক্লাসের সংস্কৃত ছাড়া। দুজন পণ্ডিত মশায় এই দুই ক্লাসে ভার নিয়ে ছিলেন।

আমাদের নীচের ক্লাসে—মাইনর থেকে পঞ্চম পর্যন্ত কেবল এই চার ক্লাসে, বাঙলা পড়ানো হত। উপরের চার ক্লাসে বাঙলা ছিল না, তার বদলে সংস্কৃত। তখনকার দিনে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বাঙলায় পরীক্ষা হ'ত না, কেবল বাঙলা থেকে খানিকটা ইংরিজি অনুবাদ ক'রতে দেওয়া হত, এই যা। সংস্কৃতের জন্য একশ' নম্বরের একটি পূর্ণ পত্র ছিল।

নীচের ক্লাসে বাঙলা পড়াতেন রাম পণ্ডিত মশায়। পুরো নামটা তিনি সই ক'রতেন, "শ্রীরামচন্দ্র শর্মা।" গৌরবর্ণ সুপুরুষ, মাথায় টাক, মুখটি পরিষ্কার ক'রে কামানো—এত পরিষ্কার করে কামানো যে আমাদের মনে হ'ত বুঝি তিনি মাকুন্দ। তিনি কোনও কোনও দিন খালি গায়ে একটা উড়ুনী প'রে, কোনও কোনও দিন একটা পিরিহান পরে আসতেন। পড়ানোর সঙ্গে তিনি বড় একটা সম্বন্ধ রাখতেন না—তাঁর পদ্ধতি ছিল, laissez faire—যা খুশী ছেলেরা করুক, আর নিজেরাই পড়ুক। কখনও তিনি বই নিয়ে বিশেষ ধরে করে পড়াতেন না—বাঙলা পাঠ-পুস্তক, ছেলেরা ক্লাসে 'রীডিং' পড়ত, ব্যস্, তাইতেই কাজ হত। তবে উৎসাহী ছেলেরা জিজ্ঞাসা ক'রলে দুই একটা কথার মানেও বলতেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্ট-ভাষী লোক ছিলেন, মৃদু হাসি মুখে লেগেই ছিল। একটি বেত সর্বদা নিয়ে ঘুরতেন, কিন্তু বেতটির সার্থকতা ছিল কেবল ছেলেদের খাতা পিটে আর টেবিল পিটে; কখনও ছেলেদের পিঠে তাঁর হাতের বেত পড়ে নি। পড়াতেন না প্রায় কিছুই, কিন্তু সে জন্য ছাত্রদের কাছে তাঁর সম্মানের অভাব হত না (আর এই পড়ানোর ভারটা তাঁর ছিল না বলেই বোধ হয়)। বাঙলার উপরে তেমন জোর দেওয়া হত না—কাজেই বাঙলার মাষ্টার কি ক'রছেন কি পড়াচ্ছেন তা দেখবার গরজ কারো ছিল না। ইংরিজিতে ফল খারাপ হলেই সকলের টনক নড়ত। আমাদের এই পণ্ডিত মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি কতদূর তা আমাদের জানা বা বোঝা সম্ভবপর ছিল না। তবে গুরু করলে তিনি বুঝিয়ে দিতেন, আর ছেলেরা একটু ভাল করলেই তিনি উৎসাহ দিয়ে পিঠ চাপড়াতেন। গ্রীষ্মের দিন তিনি তো নিয়মিত দুপুরের ক্লাসে ঘুমুতেন। আমাদের খাতায় বা স্লেটে একটা কিছু নকল করবার ভার দিয়ে তিনি পা দুটি তাঁর চেয়ারের সামনের টেবিলের উপরে লম্বা করে দিতেন, আর খানিক পরেই মৃদু ভাবে তাঁর নাক ডাকত। দুচার জন ছেলে শুরুভক্তি দেখিয়ে খাতা নিয়ে তাঁর মাথার কাছে বাতাস করত, আবার কেউ পা টিপে দিত। একটি পয়সাওয়ালা ছেলে ছিল, সে আবার বরফ কিনে আনত, ইস্কুলের মালীকে দিয়ে জল আনিয়ে বরফ জল করে পণ্ডিত মহাশয়ের সামনে ধরত। এই সব শুরুসেবার একমাত্র পুরস্কার—পণ্ডিত মহাশয় একটু মৃদু হাসতেন তাদের দিকে চেয়ে। অনেকের ধারণা ছিল, সারা বৎসর এই ভাবে শুরু-সেবা করলে, বাস্তবিক আর বার্ষিক পরীক্ষায় (যা মৌখিক পরীক্ষাই ছিল আর পণ্ডিত মশায় নিজেই যে পরীক্ষা নিতেন তাতে) উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া সহজ ছিল। পণ্ডিত মহাশয় যতক্ষণ নিদ্রা যেতেন, আমরা কেউ কেউ লিখতুম, কেউ বা নিজেরাও বেঞ্চে বসে দুপুরের গরমে ঢুলতুম। মৃদু গুঞ্জন একটা সর্বক্ষণ ক্লাসে চ'লত। কিন্তু চেঁচামেচি বা ঝগড়া হ'লে, ছেলেদের মধ্যে কোনও রকম গোলমাল হলে, পণ্ডিত মশায়ের চটকা ভেঙে যেত আর তিনি তখন আমাদের ভয় দেখাবার জন্য বেত গাছটা নিয়ে টেবিলের উপরে পিটে চটাচট্ আওয়াজ করতেন; গোলমাল থেমে যেত—

অন্তত খানিক কণের জন্য। রায় পণ্ডিত মহাশয়ের স্বগ্রামবাসী একটি অধ্যাপক বন্ধু আমার একবার আমার ছেলেবেলাকার অন্যতম এই শিক্ষক সম্বন্ধে বলেছিলেন, তিনি জানতেন যে ষোড়ো শীলের ইস্কুলে আমি রামপণ্ডিত মশাইয়ের ছাত্র ছিলুম—"আপনাদের পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে একদিন দেখা। তিনি একটু গর্ব করে বললেন—তোমরা তো কলেজে পড়াতে আরম্ভ করেছ—সারাদিন গ্যাঙর-গ্যাঙর ক'রে ব'কে মরো। আমরা পড়াই, একটিও কথা কই না। আজ যেমন একটি ক্লাস করলুম। ক্লাসে গিয়ে চেয়ারে বসে বার কতক বেতের আওয়াজ করলুম, টেবিলের উপরেই। ছেলের দল অমনি চুপ। তার পরে বেত উঁচিয়ে ক্লাসের একটি ছেলের দিকে দেখালুম, সে উঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা রীডিং পড়ে গেল। খানিকটা পরে একটা প্যাসেজ যখন তাকে পড়া হল, আর একবার আর একজনের দিকে বেত দিয়ে দেখালুম, তখন সে পড়লে। এইভাবে একটি কথা না বলে ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া গেল—পরের আঠারো জন ছেলের পালা সাঙ্গ হল, রীডিং প'ড়ে।" যাই হোক, এই পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে অন্য পড়ার ভাল ছিলুম বলে আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। নির্বিরোধ মানুষ, ছেলেদের ঘণ্টাখানেক চুপ করিয়ে বসিয়ে রাখতে পারলেই তাঁর মতে শিক্ষার পরাকাষ্ঠা হত। এরকমটা অন্য লোককে, এমন কি শিক্ষাব্রতী লোককেও বলতে শুনেছি—ছেলেদের ইস্কুলে চুপ করিয়ে বসিয়ে রাখা, সেই হচ্ছে ডিসিপ্লিনের চরম, সেই হচ্ছে শিক্ষা। পণ্ডিত মশাইও তাই বুঝেছিলেন, ছেলেদের তিনি চুপ করিয়ে বসিয়ে রাখতেন তাঁর বিচি ব্যবহারে, আর এটা ওটা সেটা নানা গল্পে। বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতেন না—রীডিং পড়িয়ে সারা বছরের পড়ার কাজ সারতেন, তবে কেউ জিজ্ঞাসা করলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেন।

রায় পণ্ডিত মহাশয়ের শিক্ষকতাগুণ ছিল Dogmatic বা অপ্রাত্মক দিকে। যখন আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে (চতুর্থ শ্রেণী থেকে বাকি কটা ক্লাস উপরের তলার ঘরগুলিতে হত) উন্নীত হলুম তখন দেখলুম সংস্কৃতের পণ্ডিত, প্রসন্ন পণ্ডিত মহাশয়ের শিক্ষক-গুণগুলি সব Positive বা ধনাত্মক দিকে। উপরের ক্লাসে উঠে বাঙলার সম্পর্ক কমে গেল, কারণ বাঙলা এণ্ট্রান্সে পরীক্ষার বিষয় ছিল না। সংস্কৃতই পড়তে হত। প্রসন্ন পণ্ডিতমহাশয় সত্যকার পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তিনি ছিলেন খামখেয়ালী। আর সেকেলে পণ্ডিত, বহু কালে আমরা তাঁর চিন্তাপদ্ধতি ঠিক বুঝতে পারতুম না, যেমন অন্য মাস্টারদের বুঝতে পারতুম। চেহারাতেও ইনি রামপণ্ডিত মহাশয়ের বিপরীত ছিলেন। রামপণ্ডিত মহাশয় গৌরবর্ণ, পাকা আমটির মতো, চোখ দুটি গোলগাল, আলুভাতের মতন কোমল, আর ইনি ছিলেন লম্বা, একহারা, শ্যামলবর্ণ, মুখে গোঁফ আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি (সপ্তাহে একবার করে "সেভরী" হ'তেন)। ইনি পরতেন একখানি পাতলা সাদা চাদর, কখনও কখনও একখানি সাদা রেশমী চাদর পরে, গায়ে কখনও জামা দেখিনি, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, হাতে একটি মাঁদের শিঙের মস্তমান। প্রসন্ন পণ্ডিত মহাশয়ের মেজাজটা বাইরে থেকে একটু রুক্ষ ছিল—সেটা ঠিক রাগের মেজাজ নয়—একটু অসন্তোষের মেজাজ, কারণ তিনি জানতেন যে ছেলেরা তাঁকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করত। আবার এদিকে তিনি শিশুর মত সরল ছিলেন। তাঁকে আমরা "পাগলা পণ্ডিত" বলেই জানতুম নিজেদের মধ্যে।

পণ্ডিতমশাই আমাদের গুরুপাঠ থেকে আরম্ভ করে এণ্ট্রান্স সংস্কৃত সিলেকশন পর্যন্ত সব পড়াতেন। "উপক্রমণিকা ব্যাকরণ" শেষ করাতেন, "ব্যাকরণ কৌমুদী"ও খানিক পড়িয়ে দিতেন। ক্লাসে নানা ছেলেরা নানাভাবে তাঁকে জ্বালাতন করত। তিনি কিন্তু বেত হাতে ক'রে বেড়াতেন না; তবে

কারো উপরে চটে গেলে, ক্রমে তার কান মলে দিতেন, আর কখনও কখনও চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নাড়া দিতেন। আমরা দুই একবার লক্ষ্য করলুম, কান মলবার পরে, বা চুলের গোড়া মুঠো করে ধরবার পরে, নাইবার সময়ে মাথা সরষের তেল বা নারকেল তেল মাখার চুলের গোড়া বা কানের পাশ থেকে পণ্ডিত মশাইয়ের হাতেও অফুরন্ত' করে মাখা হয়ে গেল। তখন তিনি নিজের হাতের দিকে একবার ঘৃণার সঙ্গে তাকিয়ে দেখে, সেই অপরাধী ছেলের কাঁধে পিঠে হাত ঘষে নিজের হাতের তেলটা মুছে নিতেন। এই দেখে ক্লাসের দু-তিন জন কোঁপো ছেলে তাদের কাষপদ্ধতি স্থির করে নিলে—পণ্ডিতমশায় শাস্তি দেবার জন্য যাই কোনও দুর্ভাগা ছাত্রের কান বা চুলের মুঠি ধরেছেন, অমনি তিন দিক থেকে তিনজন ছেলে ছুটে এল, কেউ হাতে একখানা কাগজ নিয়ে, কেউ নিজের রুমাল নিয়ে, কেউ নিজের চাদরের একটা দিক উঁচু করে ধরে, পণ্ডিতমশায় তাতে তাঁর তৈলাক্ত হাত মুছবেন ব'লে: পণ্ডিতমশাইও শাস্তি দেবার পরে তাকিয়ে দেখতেন, কোন্‌টাতে হাত বেশি পরিষ্কার হবে, তার পরে তাতেই হাত মুছতেন। একটু বয়াটে ধরণের ছেলে মাথার সামনের চুলটা খুব বড় ক'রে রাখত আর তাতে ফরফরে করে গন্ধ তেল মেখে আসত, আর যাদের চুল অতি ছোট করে ছাঁটা। তাদের মাথায় হাত দিলে পণ্ডিত মহাশয়ের হাত মুছতে একটু বেশ সময় লাগত।

প্রথম পণ্ডিতমশাই নিজে যেমন সরল সাদাসিধে মানুষ ছিলেন, তেমনি তিনি ছেলেদের বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। ছেলেরা যদি বাসী জামা জুতো পরে আসত, বুঝতে পারা যেত এই বিলাসিতা তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে। ছেলেরা বলত, মৌখিক পরীক্ষার সময়ে ভাল উত্তর দিলেও খোশ-পোশাকী ছেলে বেশী নম্বর পেত না; এবং যে ছেলে উল্কো-খুস্কো মাথায় ধোপ দুরস্ত কাপড় পরে মৌখিক পরীক্ষার জন্য তাঁর কাছে হাজির হত, ভক্তিভাবে তাঁকে প্রণাম ক'রে নম্র ভাবে দাঁড়াত, তার পক্ষে বেশী নম্বর আদায় করা সহজ হত। পণ্ডিতমহাশয় ক্লাসে বাঙলা থেকে সংস্কৃত অনুবাদ করতে দিতেন, তাঁর বাঙলা বাক্যের প্রসাদ বেশী ছিল না—আমাদের মনে হত, ঘুরে ফিরে সেই গোটা বিশ পঁচিশেক বাক্যই আসত। তাঁর তৈরী এই বাক্যগুলি নৈতিক আদর্শের দিক ঘেঁষেই হত, "দুরাত্মাদের দমনই মঙ্গল, যে সব পাপী দুষ্কৃত করে তাহারা নরকস্থ হয়, বালকগণের উচিত সর্বদা দুর্বৃত্তদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা" ইত্যাদি। এইরকম বাক্য আমাদেরও পক্ষে হত, কারণ এগুলি নিষ্পাপ বাক্য, সংস্কৃতে অনুবাদ করা আমাদের পক্ষে বেশ সোজাই হত।

পণ্ডিত মহাশয় বাইরে কর্কশ হলেও ভিতরটা তাঁর খুবই কোমল ছিল। যে ছেলে পড়াশুনায় একটুও ভাল হত তার প্রতি তিনি খুবই স্নেহ দেখাতেন। আর সে যদি গরীবের ঘরের ছেলে হল, তো সোনায় সোহাগা' সংস্কৃতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় যারা ভাল করেছে, তাদের নিয়ে তিনি গর্ব করতেন, আনন্দে যেন তাঁর চোখের কোল ভিজে যেত। তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প আমরা শুনেছিলাম। তিনি থাকতেন খাল পারে, পূর্ব কলকাতার শুঁড়ো কি নারকেলডাঙায়। একবার তিনি বাজার থেকে জীওল মাছ কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন, তাঁর স্ত্রী তাঁকে কিনে আনতে দিয়েছিলেন মাগুর কি কই কি সিঙি মাছ। খালের পোলের উপর দিয়ে যাবার সময়ে মাছগুলো বেকায়দায় পুঁটলীর ভেতরে একটু ধটপট করতে থাকে। পণ্ডিত মশায় তা দেখে বললেন, বেচারীরা খালের জল দেখে ঘরে ফিরতে চায়। তিনি নাকি তখন মাছদের উদ্দেশ করে বলেন, "যা যাবি বাবা, যা যাবি?" ব'লে পয়সা দিয়ে কেনা কই মাগুর পুঁটলী খুলে বার করে পোল থেকে জলের ভিতরে ফেলে

দিলেন। এ রকম আশুতোষ গাঙ্গুলীমশায় ব্যক্তিটি আমাদের সঙ্গেও পড়াতেন। খুব রাশভারী খাঁটি মানুষ বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। আমরা সকলেই (ক্লাসে আর ক্লাসের বাইরে) তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতুম, আর তাঁর পায়ের ধুলো নিলে আমাদের মনে হত, আমরা ধন্য হতুম।

ভারত-সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনা

[শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য]

[ভারত-সরকারের নিযুক্ত পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট, প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার অঙ্গীকৃত শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল।]

প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটি

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা নানা দিক থেকেই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা সকলেই মানে যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়, বিশেষ করে নীচের স্তরে, শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রকৃত অপচয় হচ্ছে। স্কুলের প্রথম তিন বৎসরে বহু ছেলে পড়া ছেড়ে দেয়। তার জন্য যে অপচয় হবার তা তো হচ্ছেই। তা ছাড়া, শিক্ষার ফলও আশানুরূপ হচ্ছে না। বুদ্ধিকে মার্জিত করা, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা, এর কোনটাই এই শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা ঠিক ঠিক হচ্ছে না। প্রকৃত শিক্ষা ছেলের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে দেবে, তার বিচারবুদ্ধিকে বিকশিত করবে, তার অধ্যবসায় এবং সৃজন পথে চলার শক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে। প্রচলিত শিক্ষার অধিকাংশ ছেলের ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে না। তার উপর, যে সকল গুণ মানুষের নৈতিক উন্নতি ও চরিত্রের সবলতার পরিচয় দেয় তারও বিকাশ হচ্ছে না। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ছেলেদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা অত্যন্ত বেড়েছে। এ সম্বন্ধেও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের চিন্তা করার প্রয়োজন হয়েছে। এই শিক্ষার ফলে যেসব ছেলে তৈরি হচ্ছে, চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই মূল্য খুব কম হয়ে গেছে। এমন কি, যে সরকারী চাকরির জন্য এই শিক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সরকারী চাকরিতেও এরা ভাল কাজ দিতে পারছে না। দেশকে উন্নত করতে হলে শিক্ষিত ছেলেদের কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম কাজের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। প্রচলিত শিক্ষা তাদের সেভাবে তৈরি করতে পারছে না। তা ছাড়া, শিক্ষা যতই উপরের দিকে যাচ্ছে, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিতদের ব্যবধান ততই বাড়ছে।

লক্ষ্য

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করতে হলে কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে তা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। শিক্ষার একটা অব্যবহিত লক্ষ্য এই হবে যে ছেলের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভতি অনুসারে যতটা সম্ভব হচ্ছে-শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করবার বিষয়ে সাহায্য করবে। শিক্ষার আর একটা বড় প্রয়োজন আছে, তা হচ্ছে ছেলের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। শিক্ষা ছেলের ইন্দ্রিয়কে সবল করবে, বুদ্ধিকে মার্জিত করবে, মনকে উন্নত করবে এবং ছেলেকে কর্মক্ষম জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তুলবে। শিক্ষার ফলে ছেলের ব্যক্তিত্বের

সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হবে। এ ছাড়া আরও একটা বড় কথা আছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে, যেন জাতীয় পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে আমরা যে নূতন সমাজ সৃষ্টি করতে চাচ্ছি, সেই সমাজ গঠন করার এবং রক্ষা করার কাজে সহায়তা করবার মত মানুষ এই শিক্ষার দ্বারা তৈয়ারি হয়।

ভারত সংবিধানের লক্ষ্য এমন এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা, যেখানে সকল ব্যক্তি সমান সুযোগ পাবে এবং সকলেই ভদ্রভাবে জীবন যাপনের সমস্ত উপকরণ পেতে পারবে। এখানে আর্থিক উন্নতির দিকে যেমন দৃষ্টি থাকবে, তেমনই দৃষ্টি থাকবে সামাজিক সুবিচারের দিকে। এখানে ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, তবে সে স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করবে তার সামাজিক দায়িত্বের উপর। ব্যক্তিকে অধিকারের চেয়ে বেশি মূল্য দিতে হবে। সমাজে সেবা ও সহযোগিতার মনোভাব যাতে বৃদ্ধি পায় এবং স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতার প্রবৃত্তি সংযত হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আজ দেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এবং অঞ্চলে অঞ্চলে যে মানসিক বিরোধ আছে তা যদি দূর না হয় এবং সমাজে পরস্পরের মধ্যে মিলন ও একতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে প্রকৃত গণতন্ত্র কোনদিনই গড়ে উঠবে না এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক উন্নতিও সম্ভব হবে না। প্রকৃত শিক্ষার ভিতর দিয়েই প্রধানত এই পরিবর্তন হতে পারে।

একটা জাতির বিকাশের পক্ষে তার সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের পরিপূর্তি বিশেষ আবশ্যক। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এমন হবে যেন তার ফলে জাতির সৃজনী বুদ্ধি বিকশিত হয়, তার আনন্দ গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির রস-বোধের শক্তি জেগে ওঠে। সাহিত্য ও শিল্পে উৎসাহদানের বিষয়ে এবং সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সাহায্য করার বিষয়ে রাষ্ট্রেরও একটা কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য তাকে পালন করতে হবে।

আজ ছেলের বাড়ি, স্কুল ও বাহিরের জীবনের সঙ্গে কোন যোগ নাই। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, এবং দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করতে হবে। প্রত্যেককেই প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জনের এবং আজীবন জীবনে তার উপযুক্ত স্থান গ্রহণের উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে। জীবনের প্রয়োজন এবং সুযোগ সুবিধার সঙ্গে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে শিক্ষার ব্যয়ভার হতে রেহাই উচিত হবে না। শিক্ষার পদ্ধতি এমন হবে যেন সকলে শিক্ষার মূল্য বুঝতে পারে, ছেলে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে রাজি হয় এবং ছেলের বাপ মা স্বেচ্ছায় শিক্ষাকে সমর্থন করে। এই রকমের শিক্ষার ফলে জাতির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং প্রত্যেকে জাতির আর্থিক উন্নতির বিষয়ে যতখানি সম্ভব সাহায্য করতে পারবে। আগামী কয়েক বৎসর দেশের অধিক সংখ্যক ছেলেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ শেখানোর দিকে এবং যারা মানুষের উৎপাদনাত্মক কাজ করছে তাদের কর্মকুশলতা বাড়ানোর দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে হবে। নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হবে উত্তরোত্তর কর্মকৌশল, উপযুক্ত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, এবং ভাল করে নিজের কর্তব্য পালন করতে গেলে যে শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয় সেই শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া।

বুনিয়াদী শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার কিভাবে হতে পারে তা গত কুড়ি বৎসরের অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শকে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। ৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলেদের এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হবে, এটা জাতীয় শিক্ষা নীতি হিসাবে

গৃহীত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা হল এই যে, ছেলে তার জীবনের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ করবে এবং সেই জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ হবে সমাজের কল্যাণকর উৎপাদনাত্মক হস্তশিল্প। নূতন স্কুলগুলি যথাসম্ভব বুনিয়াদী ধরণের হবে এবং বর্তমানে স্কুলগুলিকে যতটা তাড়াতাড়ি পারা যায় বুনিয়াদী স্কুলে পরিবর্তিত করতে হবে। ইতিমধ্যে এই পরিবর্তনের প্রথম ধাপ হিসাবে সাধারণ স্কুলগুলিতে হস্তশিল্প ও অন্যান্য হাতের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার একটা মোটামুটি পদ্ধতি এখন দাঁড়িয়ে গেছে। সাধারণ ভাবে এই অনুসারেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করা যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতি তো নূতন। সেইজন্য এর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে এখনও আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। আমরা মনে করি, প্রত্যেকটি বড় রাজ্যেই একটি করে আদর্শ বুনিয়াদী শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বুনিয়াদী পদ্ধতির সকল স্তরের শিক্ষায়, যেমন পূর্ব বুনিয়াদী, বুনিয়াদী, উত্তর বুনিয়াদী, শিক্ষক-শিক্ষণ সব কিছুরই ব্যবস্থা সেখানে থাকবে। এগুলি হয়ে গেলে পরে সেখানে একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা যেতে পারবে। একটা বিষয়ে অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। দেশের—বিশেষ করে গ্রামীণ—সমাজজীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের কেমন করে যোগসাধন করা যায় তা স্থির করতে হবে। সমাজ-জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলে এই বিদ্যালয়গুলি আপনাআপনি দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির বিষয়ে অনেকখানি সাহায্য করতে পারবে।

মধ্যশিক্ষা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মধ্যশিক্ষার অবস্থাই সকলের চেয়ে খারাপ। সেইজন্য মধ্য-শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে ভাল করে অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। এমনভাবে মধ্যশিক্ষার সংস্কার করতে হবে যেন এই শিক্ষা সমাজের কাজে লাগে এবং এর থেকে ছেলেরা—বিশেষ ভাবে গ্রামীণ অঞ্চলের—ভবিষ্যৎ পেশা বৈছে নিতে পারে। মধ্য-শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষা কাল কি হবে তা সমস্ত দেশের জন্য সমপ্রভাবে স্থির করা দরকার। তেমনই, বিভিন্ন স্তরে কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইংরেজীর স্থান কি হবে তাও স্থির করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করবার জন্য এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করা বিশেষ প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা বলতে গেলে, অবিলম্বেই এই শিক্ষার সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করা দরকার। এই বিষয়ে ১৯৪৮-৪৯ সালের বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। দেশের অর্থাভাবের কথা বিবেচনা করে স্বানীয় বা আঞ্চলিক ভাবে নূতন নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয় করবার চেষ্টাকে সংযত করা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যুগপৎ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন থাকবে এবং এইজন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়-সাহায্য-কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কথা খুব যুক্তি-যুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন। এই পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে এই দিকে খানিকটা কাজ হতে পারবে বলে আশা করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সম্বন্ধে একটা কাজ এখনই করা দরকার। শিক্ষায় মাধ্যম পরিবর্তনের ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যেন প্রয়োজনীয় বই ইত্যাদি যথাসময়ে পাওয়া যায় এবং পরিবর্তনের জন্য শিক্ষায় ক্ষতি না হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যধিক ছাত্রবৃদ্ধি একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেসব ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যায় তাদের অনেকেরই এমন অবস্থা যে এই উচ্চ শিক্ষার দ্বারা তাদের কোন উপকার হতে পারে না এই উদ্দেশ্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে

যাওয়া অনেকখানি বন্ধ করা যায়, যদি অপেক্ষাকৃত নীচের স্তরে শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষায় এবং ছাত্রদের বৃত্তি নির্বাচন সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারা যায়। আমাদের দেশে বৃত্তি-নির্বাচন সম্বন্ধে পরামর্শের এবং এই বিষয়ে যোগ্যতার পরিমাপের উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। যথাসম্ভব শীঘ্র এই অভাব দূর করবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শিল্প শিক্ষা

শিল্প এবং বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা এতদিন যে ভাবে হয়ে এসেছে তার চেয়ে আরও অনেক ব্যাপকভাবে হওয়া দরকার। বিভিন্ন শিল্পের এবং সেই শিল্পের অন্তর্গত কর্মী তৈরারি করবে সেই স্কুলের সঙ্গে আরও বেশি সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন। তাহলে শিল্পের প্রয়োজন অনুসারে শিল্প বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হতে পারবে, এবং ছাত্রদের ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা দেবারও সুবিধা হবে। শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষার ব্যবস্থা দুই দিক থেকেই বর্তমান শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষালয়গুলির যোগ্যতা আরও অনেক বেশি হওয়া প্রয়োজন। যে সকল কর্মী দেশের বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে লিপ্ত আছে তাদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে আঞ্চলিক শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র এবং কৃষকদের জন্য কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক।

সমাজ শিক্ষা

জনসাধারণের সামাজিক শিক্ষার জন্য মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে। সামাজিক শিক্ষা স্কুলে বসে দেবার জিনিস নয়। সমাজের বিভিন্ন কাজের ভিতর দিয়ে নানাভাবে এই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজ-সেবা-কেন্দ্র এবং সমবায়-কর্ম-কেন্দ্রই হবে এই শিক্ষার প্রধান স্থান। প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেই এই জাতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উত্তরোত্তর বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। সমাজ-সেবা-কর্মীদের সমাজ-সেবাকেন্দ্র গঠন এবং সমাজের শক্তিকে গঠনাত্মক কর্মে নিয়োগ করবার কৌশল শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। লোকনৃত্য, যাত্রা, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি প্রচলিত সমাজ-শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সমাজ-শিক্ষা প্রসারের অনেকখানি সহায়তা হতে পারে। আমাদের শক্তি অল্প। এই অল্প শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে যথা সম্ভব পল্লী-উন্নয়ন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে ভাল হয়।

স্বাবলম্বন

সমাজের অন্তর্নিহিত স্বাবলম্বনের ক্ষমতাকে যদি আরও বেশি করে কাজে লাগাতে পারা যায় তাহলে শিক্ষার উন্নতি দ্রুততর হবে। পূর্ব-বুনিয়াদী এবং সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং স্কুলের জন্য বাড়ি তৈরারির বিষয়ে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব বেসরকারী প্রচেষ্টা চলছে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের যথা সম্ভব উৎসাহ এবং সাহায্য দিতে হবে।

আমাদের এই দরিদ্র দেশে দেশের অধিকাংশ লোকের জন্য জীবনযাপনের সর্বনিম্ন মান অনুযায়ী জীবনযাপনের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হচ্ছে না। উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার অতি অল্প অংশই এখানে দিতে পারা যাচ্ছে। সেইজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বনের সম্ভাবনা কতখানি আছে তা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। স্বাবলম্বন গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। শিক্ষার উদ্দেশ্য কোন রকমে ব্যাহত না করে শিক্ষাকে কতটা স্বাবলম্বী করা যায় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এক একটি পরিবারকে শিক্ষার জন্য গড়পড়তা কি পরিমাণ ব্যয় করতে হয় তাও একটা ভাববার কথা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে ছেলের শিক্ষার, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার—ব্যয় নির্বাহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাভাবে বহু বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা লাভ সম্ভব হচ্ছে

না। আমরা মনে করি, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহলে স্কুল কলেজে পড়বার সময় অন্তত কিছু ছেলেমেয়ে সম্পূর্ণ ভাবেই হক বা আংশিক ভাবেই হক, স্বাবলম্বী হতে পারবে। কয়েকটি দেশে এই রকম চেষ্টা অনেকটা সফল হয়েছে। আমাদের দেশেও এই রকম চেষ্টা করা প্রয়োজন। এতে আনুষঙ্গিক ভাবে আর একটা লাভ হবে। বর্তমান শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটার উপর যথেষ্ট জোর নাই। এই রকমের ব্যবস্থা হলে শিক্ষার সেই ত্রুটি দূর হয়ে যাবে।

নদীয়া জেলা শিক্ষক সম্মেলন

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

সমাগত বন্ধুগণ,

আজিকার এই অধিবেশনের দিনে আমাকে আপনাদের মধ্যে আহ্বান করিয়া, আমাকে আপনাদের নিকটে শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিতে দিয়া আমাকে যে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কৃতজ্ঞতা এইজন্য যে, গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপৃত থাকায় সময় সময় শিক্ষাবিষয়ে যখন যখন যাহা ভাবিয়াছি ও ভাবিতেছি, তাহা শিক্ষকদিগকে একবার বলিতে না পারিলে, শিক্ষকসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে না পারিলে যেন চিন্তার মধ্যেই তেমন সংহতি হইল না, চিন্তা যেন জমাট বাঁধিল না, এইরূপ আশঙ্কা হয়। একথা মেস্তাররা স্বীকার করুন আর না-ই করুন, আমরা শিক্ষকেরা অধিক উত্তেজনায় যদি বা ভুলিয়া যাই তাহা হইলেও শিক্ষকেরাই প্রকৃত প্রস্তাবে জাতি গঠন করেন। প্রকৃত সংগঠনের ভার শিক্ষকদেরই হাতে। আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, অন্যদের ব্যাপক অনটনের মধ্যেও ইহা আমাদের সকলেরই পক্ষে গৌরবের ও আনন্দের বিষয়; শুধু গৌরব ও আনন্দ নহে, আমাদের দায়িত্বও যে সেই সঙ্গে বাড়িয়াছে। আমাদের সকল আলোচনার মধ্যে নূতন পরিবেশে স্বাধীনতার পটভূমিকায় এই বড় কথাটা ভুলিলে চলিবে না। বার্ষিক অধিবেশনে আমাদের আলোচনার সুর যেন সেই মত উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকে। জাতির প্রয়োজনের দিক দিয়া, আপনাপন ব্যক্তিত্বের মর্যাদার দিক দিয়া—কি ভাবে চলিব, কোন্ ভাবের দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হইব, সেদিক উপেক্ষণীয় নয়; দিক নির্ণয় না করিয়া অগ্রসর হইলে আমরা যে শুধু নিজেদের জীবনই ব্যর্থতায় পরিণত করিব তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎ যুগকেও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়া দেশব্যাপী বিভ্রাটের সৃষ্টি করিব। আর তাই প্রার্থনা করি, যিনি মঙ্গলবিধাতা তিনি যেন আমাদের কল্যাণবুদ্ধি প্রদান করেন—শং নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

আমাদের সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়াই আজ শিক্ষা লইয়া আন্দোলন হইতেছে। আমাদের রাজ্যেও যে তাহার ঢেউ আসিয়া লাগিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। দুই একটি আন্দোলনের কথাই আজ এখানে আলোচনা করিব। আমি সোজাসুজি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত কর্মকেন্দ্রিক, মাতৃভাষামাধ্যম, অষ্টবর্ষব্যাপী স্বাবলম্বন-প্রধানী বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলি। একথা ঠিক যে, বুনিয়াদী শিক্ষাকে এখন আমরা আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছি না;

বেসিক কথাটা ভারতী. হইয়া সরকারি মহলের এ সরকারি নামযোগ মধ্যে এতখানি ঢুকিয়া গিয়াছে যে আমাদের উহা গ্রহণ করিতেই হইতেছে। কিন্তু গ্রহণ তো করিতে পারিতেছি না! আমাদের যে পদে পদে বাধা উপস্থিত। একে তো মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত জীবনধর্মনে আমরা বিশ্বাস হারাইয়াছি, তাহার উপর দেখিতেছি যে মাতৃভাষা-মাধ্যমে শিখিবার বিপক্ষ অনেক—মাতৃভাষার মাধ্যমে শিখিতে গেলে শিখাইবার লোক পাওয়া যায় না, পড়িবার বই নাই। আর, খানিকটা ঘুরে গেলেও বেশী দূর আগাইয়া চলিতে পারে না। আরও কত কি! অষ্টবর্ষব্যাপী শিক্ষাতেও আমরা আপত্তি করিতেছি, অত দীর্ঘ দিন এইটানো কোনও বিশেষ প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে আমাদের চলিবে কি করিয়া! বাঙালীর প্রতিভা কি তাহাতে নষ্ট হইবে না? আমাদের ছেলেরা যে দৃষ্টি-মার্জনার জন্য বিশেষ করিয়া তৈরিয়া চাই! আমরা সমগ্র বেসিক কালকে দুই ভাগ করিয়া ভূমিষ্ঠার বেসিক ও নিম্নিষ্ঠার বেসিক নাম দিয়াছি। অগত্যা ভূমিষ্ঠার বেসিকটা না হয় সকলে শিখিল, তারপর না হয় নিম্নিষ্ঠার বেসিকে কিছু ছেলে পড়িবে, অন্য ছেলে সোজা হাই স্কুলে পড়িবে। আমরা ভুলিয়া যাই যে, শিক্ষার কোনও প্রণালী হইতে ফল পাইতে হইলে তাহার জন্য পূরা সময় দিতে হইবে। অকালে আধ শিশুর মত যে শিক্ষা মধ্য পথে গিয়া থামিয়া থাকে, তাহার সার্থকতা নাই। তাহার উপর আবার স্বাবলম্বনের কথা। কোমলমতি শিশুদের পরিশ্রমের ফল শিক্ষকেরা গ্রহণ করিবেন? তবে তো না জানি শিশুদের কতখানি খাটাইয়া তাহাদের মুখের হাসিটুকু কাড়িয়া লইয়া বুঝি সে ব্যবস্থা সম্ভব হইবে?

কিন্তু এই সকল সমালোচক ভুলিয়া যান যে সমালোচনা করিতে গেলে যাহা আলোচনা করিব তাহার সঙ্গে খানিকটা পরিচয়ও থাকা উচিত। বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখিয়া এ পর্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই—মন্তত আমার জানা নাই—যে, ছাত্রছাত্রীদের কোনও অতিরিক্ত সুযোগ লইয়া এবং তাহাদের দিয়া অতিমাত্রায় পরিশ্রম করাইয়া কাজ করানো হইতেছে! কোন পরিচালকে—এই বাক্য অনুসরণ করিয়া কোনও বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখিয়া আসিলে এই আপত্তি ও অনুরূপ বহু আপত্তি সহজে খণ্ডন করা সম্ভব হইত। তাঁহারা একথাও ভুলিয়া যান যে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত, এবং পাশ্চাত্য জগতে, বিশেষ করিয়া আমেরিকার সংযুক্তরাষ্ট্রে, প্রদত্ত শিক্ষাবিদ ডিউই কর্তৃক এই শিক্ষা সমর্থিত। আর স্বাবলম্বনের কথার অর্থ কখনই এরূপ অনুমান করা হয় নাই যে, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় ছাত্রদের হাতের কাজের দ্বারা যাহা আয় হইবে তাহা দিয়াই শিক্ষার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইবে; যথাযথই এই কথা বলা হইয়াছে যে তাহাদের হাতের কাজ যদি ঠিকমত পরিচালনা করা যায়, তবে তাহা দিয়া প্রেষ্টার শিক্ষকের বৃত্তি পর্যন্ত দেওয়া চলিতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষাকে সার্বজনীন করিতে গেলে বুনিয়াদী শিক্ষার বিকল্পবিধান তো এ পর্যন্ত কেহ করেন নাই; দেশের ধনভাণ্ডার, রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার, যদি নিকট ভবিষ্যতে পরিপূর্ণও হয়, তাহা হইলেও তাহার সীমা সুনির্দিষ্ট। তাহার দ্বারা বর্তমান পরিবেশে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। এদিক দিয়া—স্বাবলম্বনের দিক দিয়া—যদি অল্প কিছুদূরেও অগ্রসর হওয়া যায়, পূরা না হউক, যদি টাকার আনা হিসাবেও কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তাহাও কম নহে—এ কথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিবার দিন আসিয়াছে।

কিন্তু শুধু তত্ত্বের দিক দিয়া নয়, তর্কের দিক দিয়া, বাস্তবের দিক দিয়া আমরা নূতন শিক্ষার পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারি? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ

করিবে। এই বৎসর বিভিন্ন খেলায় প্রায় সত্তাবধি বুনিয়াদী বিদ্যালয় চলিতেছে বা চলিবে; এ অবস্থায় এক দিক দিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও অন্যদিক দিয়া প্রচলিত ভাবের বিদ্যালয়, উভয়েই পরিপুষ্টি লাভ করিবে এমনটা তো আর হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কিসে দূর হইবে? এই দিক দিয়া একটা কাজ তো আমরা সহজেই গ্রহণ করিতে পারি। বুনিয়াদী শিক্ষা যে কর্মকে কেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, আমরা প্রচলিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তাহাকে কেন্দ্র করিতে পারি না বটে, কিন্তু আমাদের শিক্ষার পরিধির মধ্যে তাহাকে স্থান দিতে পারি, অর্থাৎ হাতের কাজকে অবশ্য শিক্ষণীয় বলিয়া পাঠ্য তালিকায় স্থান দিতে পারি। তাহাতে আর কিছু না হউক, আমাদের কর্ম-বিভীষিকা কাটিয়া যাইবে, কর্ম অভ্যস্ত হইলে পরে তাহাকে প্রয়োজন বোধ করিলে মাধ্যম করিতেও পারিব। তবে তাহা হয়তো অনেক দূরের কথা।

যদি হাতের কাজকে অবশ্য শিক্ষণীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে কোন কাজকে সে ভাবে গ্রহণ করিব, তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। সকলের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে গেলে চরকাকেই গ্রহণ করিতে হয়, আর চরকাকে রাখিতে গেলে সেই সঙ্গে তুলার ব্যবস্থা ও কাপড় বোনার ব্যবস্থাও করিতে হয়। এতদিন আমরা প্রায়ই চরকাকে মাঝে মাঝে গ্রহণ করিয়াছি, ফলে কত শক্তির অপচয় হইয়াছে; সুতাকাটার মধ্যে যে নূতন নূতন প্রণালী বাহির হইতেছে তাহা শিখিয়া লইয়া, এবং সম্ভব হইলে তুলার কিছু ব্যবস্থা নিজেদের গ্রাম হইতে করিয়া লইয়া, কাপড় বোনা পর্যন্ত যাইতে হইবে; না গেলে শিক্ষাও পুরাপুরি হইবে না সে কথা স্বীকার করা দরকার। বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক স্বরূপ মানিয়া লইয়াও কর্মের ব্যবস্থা না করিয়া শিক্ষা চলিতেছে—এ ব্যাপার তো আমাদের দেশে বিরল নহে। সুতরাং যদি সুতা-কাটাকেই হাতের কাজ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে যেন সমস্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ তুলা হইতে কাপড় তৈয়ারির কথা ভাবিয়া যেন তাহা করি; নতুবা আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে ব্যর্থতার আর এক অধ্যায় সংযোজিত হইবে মাত্র।

সুতাকাটা ছাড়া আর একটি হাতের কাজের কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারি—বাগান করা। আমাদের দেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা খানিকটা জমি পাওয়া অসম্ভব নহে; সেই জমিতে আপনাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যদি নিজেদের জন্য, প্রত্যেকের জন্য, অথবা জমি কম থাকিলে দুই তিন জনের জন্য, এক একটি কেন্দ্র পায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বাগানের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাগান বলিতে অবশ্য সবজী বাগানের কথাই প্রধানত বলিতেছি। কিন্তু বাগানের কাজকে হাতের কাজ বলিয়া গ্রহণ করিবার ব্যাপারে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাকে রীতিমত পাঠ্য তালিকায় স্থান দিতে হইবে, শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সর্বত্র হিসাবও রাখিতে হইবে। ইহাতে আর কিছু না হউক, আমাদের ছাত্রেরা কর্মঠ হইবে, তাহাদের শরীর শ্রমক্ষম হইবে, এবং বিদ্যালয়ের কিছু আয় হওয়াও অসম্ভব নহে। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়াই আমরা এইটুকু পরিবর্তন করিতে পারি।

এখানে আমি অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষা ও প্রচলিত শিক্ষা, উভয়ের মধ্যে যাতায়াত দূর করিবার জন্যই ঐরূপ সেতু নির্মাণ করিতে বলিতেছি—সুতাকাটা বা বাগান করার মত হাতের কোন কাজ বা এমনিতেই আবশ্যিক ভাবে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে আমাদের বিদ্যালয়ে গ্রহণ করিতে বলিতেছি।

আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের মন দিতে হইবে। বিদ্যালয়সমূহে খেলাধূলার দিকে

সঙ্গে ড্রিল করিবার কথা লইয়া বহুপূর্বে আলোচনা করিয়াছিলাম। জানি, আমাদের সময়ভাব আছে, অর্থসমস্যা ও বস্ত্রসমস্যা আমাদিগকে বহু বিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু নিজেকে পঙ্গু হইতে দিলে তো আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় থাকে না। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে ছাত্রেরাই আমাদের ভবিষ্যৎ—ছাত্রদের দ্বারা যদি আমাদের সমৃদ্ধি না ঘটে, তবে আর কিছুতেই ঘটিবে না। সেই ছাত্রদের কর্মপটু দেহ গড়িবার পক্ষে ড্রিল এক পরম সাধন। ইহাতে শুধু যে দেহ কর্মপটু করিবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনকেও শিক্ষা দিবে, সংযত করিবে, দশজনের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিতে শিখাইবে। চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার যে সর্বনাশা প্রবৃত্তি আমরা চারিদিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে সামাজিক চেষ্টা করিতে হইবে। সেই সামাজিক চেষ্টা করার একটা পথ হইল ড্রিল। পাশের গ্রামের সঙ্গে, গ্রামের দশটা জায়গার সঙ্গে, এমন কি পরস্পরের মধ্যেও পরিচয় নাই; পরিচয় পাইতে হইলে গতি চাই, গতিই জীবন। কি করিয়া আমাদের জীবনে সেই গতি সঞ্চারিত করা যায়, তাহাই হইল ড্রিলের উদ্দেশ্য। উপনিষদের আলোকে যে ধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল "সংগচ্ছধ্বম্" মন্ত্রে, আমরা বিংশ শতাব্দীর ছাত্র-জীবনে তাহাকেই আবাহন করিতে চাই। ড্রিল তাহার যুগোপযোগী সংস্করণ মাত্র।

আর একটি বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে চাই, আমাদের বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ প্রশ্ন তেমন ওঠে নাই। মাতৃভাষাই যে প্রাথমিক শিক্ষার একমাত্র বাহন, সে বিষয়ে আজ কাহারও মনে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজীর কি হইবে? ইংরাজী যে আমরা ফেলিয়া দিতে পারি না, রাখিতেও পারি না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী বিদায় করা যাইবে না, কারণ বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার পক্ষে ঐ পথটি আমাদের সুগম রহিয়া আছে। আমরা বলিতেছি, ইংরাজীর মর্যাদা কমাইয়া দেওয়া হউক, পূর্ণসংখ্যা ২৫০ কমাইয়া ১০০ করা হউক, অথবা ১৫০ করা হউক, কিন্তু ইংরাজী বাদ দিলে তো চলিবে না। মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, কতদূর ইংরাজী জানা চাই; তাহা আবার অনেকটা নির্ভর করিবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর, বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশার্থীর নিকট ইংরাজীর কতখানি জ্ঞান চান? বিদ্যালয়কে অন্তত সেই পরিমাণ জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাই যদি বিদ্যালয়ের উচ্চ মান হয়, বিদ্যালয়ের ইংরাজী শিক্ষার নিম্ন মান কি হইবে? অর্থাৎ কোন শ্রেণী হইতে আমরা ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিব? পঞ্চম শ্রেণী না ষষ্ঠ শ্রেণী? না সপ্তম? যেখানেই আরম্ভ করি, সেখান থেকে বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত যে কয় শ্রেণী, তাহাতে ইংরাজী পাঠ ক্রমিক করিয়া দিতে হইবে। এই আয়োজন কিন্তু বিদ্যালয়ের উপর প্রধানত নির্ভর করিবে না, শিক্ষাধিকারের উপর প্রধানত নির্ভর করিবে। চাই আমাদের শিক্ষকের অন্তত ধারার পরিবর্তন, চাই নূতন ধারা অনুসারে পুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষাধিকার হইতে স্পষ্ট তাহার নূতন ধারার প্রবর্তন। ইহার পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষাধিকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, সকলের একত্র বসিয়া ইংরাজীর মান ঠিক করা চাই। এখন ইহার অভাবে শিক্ষা-জগতে কপটতা বৃদ্ধি পাইতেছে; মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশার্থী ছাত্রের সুবিধার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী পড়াইবার ব্যবস্থা খোলাখুলি ভাবে না থাকিলেও শুনিতেছি বেসরকারী ভাবে ইংরাজী পড়ানো হয়! যদি পঞ্চম শ্রেণীকে প্রাথমিক বিভাগের মধ্যে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো মাধ্যমিক বিভাগে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ইংরাজী আরম্ভ করিলে সকল

দিকে সুবিধা হইতে পারে। আমরা আর কতদিন এইরূপ অনির্দিষ্ট ভাবে কাটাইব? শিক্ষাবিভাগেও যদি বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বোর্ড এবং প্রাথমিক বিভাগ একত্র বসিয়া পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের দুঃখের অবধি নাই। কিন্তু কেন এমনটা হয়? ইহাতে তো আমাদের সকলের সাধারণ স্বার্থ জড়িত, আমরা এবিষয়ে কোনও প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করিতে কাঠবিড়ালির সাহায্যও করিতে পারি না কি?

ইংরাজী ভাষা কতদূর শিখাইব, সে বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। ইংরাজী পত্রিকা বুঝিতে পারা, এবং ইংরাজী বলা ও চিঠিপত্র লেখার কাজ চালানো, দুই-ই আমাদের চাই। সুতরাং ইংরাজী রচনার কাজ-চলা জ্ঞান যাহাতে ছাত্রদের হয়, তাহা দেখিতে হইবে। বাস্তবিক পত্রলেখা ও শুধু নিজের কথা ইংরাজীতে লেখা, এমন কিছু কঠিন নহে। অথচ এ বিষয়ে সামান্য দেখাইয়া দেওয়ার অভাবে বৎসরের পর বৎসর কত ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া নৈরাশ্য সাগরে ভাসিতেছে। আই. এ, আই. এস্. সি পরীক্ষাতেও ইংরাজী ছন্দ-বিশ্লেষণে অসমর্থ হইয়া কত ছেলেমেয়ে—হয়তো এক নম্বরের জন্যই—অকৃতকার্য হইতেছে! নিবন্ধ রচনা আরও কঠিন, কারণ ব্যাখ্যা তাহার চেয়েও কঠিন। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সেইটুকু বাদ দিলে হয় না কি? দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সকল ভাষা শেখাতেই একটা দিক বাদ পড়ে। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত—কোনও ভাষাতেই আমরা কথা বলা অভ্যাস করি না, উচ্চারণের দিকে জোর দিই না। ফলে আমাদের ভাল ভাল ছেলেমেয়েরা সহজভাবে ইংরাজী বাংলা সংস্কৃত কিছুই বলিতে পারে না। আমার মতে স্কুলে এ বিষয়ের জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকা উচিত, এবং সেই সময়ের মধ্যে সকলে যাহাতে নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে ও সে চেষ্টায় সফল হয়, তাহা আমাদের দেখিতে হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বা মাধ্যমিক বোর্ডের পরীক্ষার মধ্যে ইহা না-ই বা থাকিল, আমরা যদি ছেলেমেয়েদের মধ্যে উৎসাহ দিয়া তাহাদের বলিবার কথাকে একটু বাড়াইয়া দিতে পারি, তবে অন্যান্য বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়িবে, এবং শিক্ষার অন্যতম যে উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও নেতৃত্বশক্তি অর্জন, তাহারও সিদ্ধি সহজে হইবে। এ বিষয়ে আপনাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে ও কার্যত কিছু করিতে অনুরোধ করিতেছি।

অন্যত্রও বলিয়াছি, এখানেও বলিতেছি, ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীরও রাজাসন টলিয়াছে। যে মর্যাদা সে এতাবৎকাল পাইয়া আসিয়াছে, সে মর্যাদা ছিল রাজকীয় মর্যাদা। ইংরাজী শিক্ষকের বেতন ও বাংলা শিক্ষকের বেতনের তারতম্য, ও বেতন অনুযায়ী মর্যাদার তারতম্য, আর কত দিন চালাইব? ইংরাজী ২৫০ নম্বর নহিলে চলিবে না, বাংলা বড় জোর ২০০, অঙ্কের পূর্ণমান ১০০—এমন কেন হইবে? বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার ও দেশে আমাদেরই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইন শিখিয়াছে এমন উকিলের মধ্যে এখনও কেন প্রভেদ? পূর্বতনের কঙ্কাল যাইতে বেশি দেরি হয়, সত্য; কিন্তু তাহাকে ঝুলাইয়া থাকায় কোনও অর্থ হয় না। এখনো আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে ইংরাজীকে আমরা যে মহিমায় মণ্ডিত দেখিতে অভ্যস্ত, সে মহিমা আজ হউক কাল হউক খসিয়া পড়িবেই, সাম্রাজ্যের গরিমা লুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, রাজনৈতিক শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানাধিকার ও জ্ঞান প্রচারের শক্তিও কমিয়া যাইতে বাধ্য। তাহাতে পরিণামে আমাদেরও ক্ষতি, বিশ্বেরও হয়তো আপাতত ক্ষতি, স্বীকার করি। কিন্তু সেইজন্য আমাদিগকে নিজের ভাষাতে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান প্রকাশের ব্যবস্থা আরও ভাল করিয়া করিতে হইবে। একাজে শিক্ষকের অগ্রণী

হইতে হইবে। শিক্ষকের দায়িত্ব সেবা বলিলে কেহ কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন সত্য, কিন্তু সাহিত্য লইয়া, বিদ্যা লইয়া যাহাদের নিরন্তর থাকিতে হয়, তাহাদের দ্বারা বিদ্যার আরাধনা যতটা আশা করিতে পারি, সত্য কথা বলিতে কি, সমাজের অন্য কোনও অঙ্গ হইতে ততটা আশা করি না।

প্ল্যানিং কমিশনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ঝলড়া মূল্যায়ণের মাধ্যমিক শিক্ষাকে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার weakest link, কীণতম যোগসূত্র—বলা হইয়াছে। ওদিকে আমাদের রাষ্ট্রে বহুদিনের পরে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কি ভাবে সেই বোর্ড কার্যপথে অগ্রসর হইবেন, জানি না। আশা করি নূতন পথে অগ্রসর হইবার মনের জোর তাঁহারা প্রকৃত হিতৈষী হিসাবে সঞ্চয় করিবেন। বোর্ড পথ খুঁজিয়া বাহির করিবেন, আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে নূতন ও গৌরবময় অধ্যায়ের সূত্রপাত হইবে। যদি তাহা না হয়, যদি রাজনীতির দলাদলিই বা দলীয় বুদ্ধিই বড় হইয়া উঠে, তবে আমরা শিক্ষকেরাও কি দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠিয়া একমাত্র দেশের হিতসাধনকেই বরণ করিয়া লইতে পারিব না? ইতিহাসের পাঠ কি আমাদের নিকট একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে? সে বিষম পরিণতি কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষকেরা আজিকার দিনেও, স্বীকার না করিয়া পথ নাই। এতদিন কি করিয়া চলিয়াছে, তাহা ভাবিয়া পাই না। প্রাথমিক শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনাদেরও জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো, কি করিয়া সকলে খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া আছি? দাবীর তো আমাদের অন্ত নাই। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে দাবী করি, কি পর্যন্ত দাবী করি? আমাদের সংখ্যাবিজ্ঞানের পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন না? আমাদের প্রত্যেকের আয় কত একবার খুলিয়া বলিতে হয়—আয়করের জন্য নয়, আয় ও ব্যয় দুই-ই জানিতে হইবে। এই ব্যয় কুলাইতে কত আয় হওয়া চাই? বেসরকারি ভাবে ছাত্র পড়াইয়া কত পাই, বই লিখিয়া কত পাই, অন্য উপায়ে (কী সে উপায়) কত পাই—কি করিয়া আমাদের কুলায়? সবটা জানিলে হয়তো একটা দাবী পেশ করিতেও পারি, যদি সংখ্যাবিজ্ঞানী তাঁহার বিশেষ জ্ঞান লইয়া আমাদের হিসাব খাড়া করিতে সাহায্য করেন।

চারিদিকে যখন তাকাই, তখন চোখে পড়ে শিক্ষাব্যাপারে আমাদের বিপুল ঔদাসীন্য। আমাদের বিধানে মানুষে মানুষে ভেদ দোষ করিয়া দেওয়ার কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু ঘোষণা অনুযায়ী কাজ কোথায়? এই মুক্তি যাহা আমরা ভোগ করিতেছি, যাহা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ভোগ করিবে, তাহার সুফল তো সকলকে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। তাহার অর্থ, আমাদের "খ্যাতিহীন পাড়ার সমাজ-হারানো দস্যীছাড়াদেরও মুক্তি চাই।" আমাদের সমাজে যাহারা অনগ্রসর, সেই হরিজন ও আদিবাসীদের চোখেও দেখিতে চাই শিক্ষার আলো। কিন্তু সে আলো কে জ্বালিবে? কে এ বিষয়ে অগ্রণী হইবে? আমাদের শিক্ষক-সমাজের কাছেই তো ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিব, তাঁহাদের শত শত সভার অনটনের মধ্যেও তাঁহাদের কাছেই বলিব—আসুন, আপনাদের সাহায্য চাই—বিদ্যাবিবর্ধনে, শিক্ষার প্রসারে আপনাদের সহযোগিতা চাই।

আমি জানি, ডাকিতে পারিলে তাঁহাদের নিকটেই সাড়া পাইব। আপাতত তাঁহাদের শক্তিবৃদ্ধি হউক, তাঁহাদের সংঘের জয় হউক, তাঁহারা কল্যাণের পথে অগ্রসর হউন, এই শুভকামনা লইয়া আমার আজিকার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

বন্দে মাতরম্

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

৯ম বর্ষ | আশ্বিন ১৩৫৮ | ১১শ সংখ্যা

আলোচনা

শারদীয়া

আমাদের শত দুঃখ অভাব অনটনের মধ্যেও উৎসবের সময় প্রাণ আপনা হইতেই নাচিয়া ওঠে। বাঙ্গালীর মনে আজ সে আনন্দ নাই, বাংলায় আজ সে প্রাচুর্য নাই ; তথাপি শারদীয় উৎসবের আগমনী ছোট বড় সকলের মনে একটা স্ফূর্তির হিল্লোল বহাইয়া দেয়, স্বীকার করিব। শিক্ষক ও ছাত্রের পক্ষে এই সময়টার বিশেষ আকর্ষণ আছে, পূজার ছুটি। আমাদের জীবনযাত্রা এতদিন এক ছন্দে চলিতেছিল, তাহাতে বিরতি হইল ; ছেদ পড়িল। প্রভাত রায়-মজুমদার বলিতেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একযোগে সমাজসেবার এই সময়ে আত্মনিয়োগ করুন, নিরক্ষরতা দোষ দূর হউক। নেতারা বলেন, 'ফিরে চল আপন ঘরে', অর্থাৎ গ্রামে। যে ভাবেই হউক, সুপরিকল্পিত প্রণালীতে আমাদের অবকাশ অতিবাহিত হউক, ইহা আমাদের অন্তরের গুঢ় কামনা।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অবশেষে গত সেপ্টেম্বর মাসের ২২ তারিখে সনদের বলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আমাদেরই সরকার, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় সরকারি বেসরকারি দুই পক্ষ থাকিবে না, এবং নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-নীতি সম্পূর্ণভাবে না হউক অনেকটা অনুসৃত হইবে বলিয়া আশা করি। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে কতই না ভাবিয়াছিলেন! তাঁহার ভাবনা খানিকটা রূপ পাইয়াছে তাঁহার শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় ; নব কলেবরে সেই পরিকল্পনার আত্মা অভিনব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেন দর্শনের অধ্যাপক ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হিসাবে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার পর অবসর লইয়া শান্তিনিকেতনেই বাস করিতেছিলেন। তিনি এক বৎসরের জন্য এই নব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ জাকির হোসেন এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয় সভার আজীবন সদস্য, সুতরাং প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের যোগ নিবিড় হইবে বলিয়া আশা করা

যায়। "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"—সন্ধিক্ষণে মাননীয় শিক্ষাময়ী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের মুখে এই মন্ত্রের প্রতিধ্বনি নবযুগেরই সূচনা করিতেছে।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

আগামী ২২ হইতে ২৬ অক্টোবর তারিখে বোম্বাই নগরীতে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের ২৩শ অধিবেশন হইবে। বোম্বাই রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী খালাসাহেব খের ইহার উদ্বোধন করিবেন, এবং লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ আচার্য নরেন্দ্র দেব হইবেন ইহার সভাপতি।

শিক্ষকদের আমেরিকায় যাত্রা

আমাদের শিক্ষা ব্যাপারে অগ্রসর হইতে হইলে দেশের ও বিদেশের অগ্রসর শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইবে, এ বিষয়ে সর্বদাই সজাগ থাকা উচিত। চল্লিশ বৎসর পূর্বে জার্মানি ও আমেরিকার উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য নাম ছিল; আমরা সেকালে শিক্ষাশাস্ত্র পড়িবার ও পড়াইবার সময় তাহাদের নাম করিতাম। যুদ্ধের পর জার্মানি একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমেরিকার শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও উচ্চ। জগতে আজ বেতাল্লিশটি জাতির মধ্য হইতে ৩৭৫ জন শিক্ষক আমেরিকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেখিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা ছয় হইতে নয় মাস আমেরিকায় থাকিবেন। ইহারা সাধারণ ছাত্র নহেন, সকলেই শিক্ষক, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা বুঝিবার জন্য যাইতেছেন।

ইহাদের মধ্যে ভারত হইতে পাঁচ জন যাইতেছেন—তিনজন শিক্ষিকা, দুইজন শিক্ষক। ইহাদের মধ্যে বাঙালী কেহ নাই।

ইংলণ্ডে মালয় শিক্ষকদের অভিযান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে মালয় শিক্ষা বিস্তার কি দ্রুতগতিতে বাড়িয়াছে, তাহা দেখার মত: ১৯৪৫ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল দুই-লক্ষ আট হাজার এখন প্রায় সাত লক্ষ, অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ! ভারত, স্বাধীন ভারতও কি শিক্ষার জন্য এতখানি আগ্রহের পরিচয় দিয়াছে?

কিন্তু এতগুলি শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষক চাই। মালয় এখনও ইংরাজ সরকারের সঙ্গে শাসন ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—লিভারপুলের নিকটে কার্কবি সহরের নিকটে শিক্ষকদের শিক্ষণপদ্ধতি অধ্যয়নের জন্য একটি কলেজ এমন মালয় শিক্ষকদের উদ্দেশে উন্মুক্ত আছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে মালয়ের বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে ১৫০ জন শিক্ষক এই উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর হইতে ইংলণ্ডে কার্কবি সহরে যাত্রা করিবেন। এই দেড় শত শিক্ষকের মধ্যে ভারতীয় ও চীনা শিক্ষকও আছেন।

আগামী সেপ্টেম্বরে (১৯৫২) আর একদল শিক্ষার্থী শিক্ষক ইংলণ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার আনুষঙ্গিক আয়োজন চলিতেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

ভারতবর্ষের ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়ে এসেছি, কিন্তু সেইখানেই তার অবসান ঘটে নাই। ইতিহাস তার পদচিহ্ন রেখে গেছে প্রতি ঘটনার উপর, চারদিকের নানা স্থানে, সামাজিক রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানের উপর; সে পদচিহ্ন সহজে মুছবার নয়। আমাদের সামনে তবু তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলে গিয়েছিলেন, বাংলার ইতিহাস নাই। সে ইতিহাস কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, আমরা সকলে মিলিয়া লিখিব। সে কাজ এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার সময় হতে এ পর্যন্ত বঙ্গের কৃতী সন্তানগণ সে কাজে হাত দিয়েছেন। কিন্তু নির্মাণকার্য এখনও শেষ হয় নাই; কবে হবে, কে জানে। হয়তো এসব কাজ শেষ হবার নয়। আমাদের দেশে এক শ বছর—এক শ বছরই বা বলি কেন, পঞ্চাশ বছর পূর্বেও, যে সব মেলা বসতো, এখন তারা ইতিহাসের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান যুগে আমাদের রাষ্ট্রবিপ্লব, অর্থনৈতিক দুর্গতি, আমাদের সাংস্কৃতিক বিপর্যয়—কিছু কম যায় নাই। সেই সব ইতিহাসের কথা এখনই তো লিখে রাখা দরকার, লিপিবদ্ধ করা দরকার। এই তো যে কথা মনে হচ্ছে, আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রাচীন কাল থেকে এ পর্যন্ত কত বিভিন্ন স্তরের মানব সভ্যতার নিদর্শন এসে একত্র মিশেছে, তা বিশ্লেষণ করা দরকার। এ দুটিই হয়তো পণ্ডিতের কাজ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের যে কৌতূহল সর্বত্র সমাজদেহে দেখতে পাওয়া চাই, তাতো চোখে পড়ছে না।

তবু আমাদের চারদিকে শত দুই শ বছরের ইতিহাসের এত চিহ্ন পড়ে আছে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ, আর ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ—মাঝখানে ১৮৫৭তে সিপাহিদের হাঙ্গামা, এই প্রায় দুই শ বছরের ঘটনাবহুল ইতিহাস মনে রাখা কিছু কঠিন নয়। এতো প্রায় আমাদের চোখের সামনে ভাসছে।

কিন্তু এই এখনকার ইতিহাসেই তো সব নেই, এতো হোল অর্বাচীন। আমাদের প্রাচীন যুগের ইতিহাস—ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, ঋগ্‌বেদের যুগ থেকে তার আরম্ভ। কিন্তু এর মধ্যে বহু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার হয়েছে। উত্তর দক্ষিণ, উভয় দিক থেকেই বাইরের বৃহত্তর সভ্যতার সঙ্গে যোগসূত্র পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পার সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার চাইতে প্রাচীনতর, এবং দক্ষিণের দ্রাবিড় সভ্যতাও বৈদিক সভ্যতার তুলনায় যে অর্বাচীন নয়, একথারও বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঋগ্‌বেদের যুগের কালই যে কত দিনের, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ নন, বরং নানাভূমির নানা মত; প্রাচীন আর্যদের বাসভূমি কোথায় ছিল, এবং তাঁরা যখন বেদ রচনা করেন, বৈদিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই যুগ কত কাল পূর্বের—আজ থেকে ছয় হাজার না বারো হাজার বছরের, পণ্ডিতদের তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু একটা বিষয় বলতে হবে—প্রাচীন ভারতে আর্যেরা যে কোনও একটা বিষয়েই প্রাধান্য দেখিয়েছেন তা নয়, তাঁরা চৌকষ ছিলেন, ইহকালকে তাঁরা অবজ্ঞা করতেন না, তাঁরা বাস্তবের জ্ঞানকে মূল্য দিতেন! প্রাচীন ভারতের কীর্তি শুধু বেদ ও উপনিষদ নয়। অপৌরুষেয়ের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ ও অর্থশাস্ত্রও আছে, সেকথা ভুললে চলবে না। এককালে লোকের ধারণা ছিল যে, প্রাচীন ভারত শুধুই বুঝি ত্যাগের কথা বলে গেছেন। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর গোড়া

থেকে তো বটেই, এর পূর্বেও আলোচনা শুরু হয়েছে, এবং সে আলোচনার ফল আমরা দেখতে পাই Positive Sciences of the Hindus প্রভৃতি সম্বন্ধে। আজও হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর অলঙ্কার ও হিন্দুর আয়ুর্বেদ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, জগতের আধুনিকতম আলোচনা তাকে ম্লান করতে পারে নাই।

সে কালে—সুদূর অতীতে—এ দেশের লোকেরা কি ভাবে চলাফেরা করতেন, কি খেতেন এবং কি পরতেন, কি ভাবে আত্মরক্ষা করতেন, বিবাহাদি কি ভাবে নিষ্পন্ন হোত, সে সম্বন্ধে দুখানি বইয়ের উল্লেখ করি—একখানি অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের Ancient Indian Life, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে, অন্যখানি Mrs Padmini Sengupta's Life in Ancient India—আমাদের মত সাধারণ পাঠক দুখানি বই থেকেই অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করতে পারবেন।

প্রাচীন ভারতের বিস্তৃতি ছোল মধ্যযুগে; হর্ষবর্ধন থেকে পৃথ্বীরাজ, পৃথ্বীরাজ থেকে পাঠানমোগল—এই বহু শতাব্দী ব্যাপী কালের সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন জনাব ইউসুফ আলি সাহেব, তাঁর Mediaeval India নামক পুস্তিকায়।

তার পরে এল মুসলমানেরা। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে আমরা এ যুগ বাদ দিতে পারি না, তাজমহল, কুতুবমিনার আমাদেরই কীর্তি। তবে এ জিনিসটাকে বুঝতে গেলে সমসাময়িক মুসলমানদের বুঝতে হয়। খ্রীষ্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের intellectual output খুবই উঁচু দরের ছিল; কিন্তু ত্রয়োদশ থেকে উনবিংশ শতকে তাঁরা সাহিত্যে অনুকরণই করে গেছেন, মৌলিক সৃষ্টি বড় কিছু করেন নাই—তবে ঠিক ঐ সময়েই তাঁদের স্থাপত্য শিল্প উৎকর্ষ লাভ করে। এটা পাকা পৃথিবী নিয়ে কথা—প্রথম যুগে এবং বহির্জগতে মুসলমানেরা যেমন বাইরের লোক ছিল, পরবর্তী কালে পাঠানেরা যখন দিল্লীর সিংহাসনে চেপে বসলো, তখন আর তারা তেমন বাইরের লোক রইলো না। বিশেষ করে, রাজধানী থেকে বাংলার মত দূরবর্তী প্রদেশে পরাধীনতা তেমন শিকড় গাড়তে পারে নাই। আলাউদ্দিন খালজীর মত মোর্যও সুলতান পর্যন্ত বাংলার চিত্তয়ের ব্যাপারে কিছু দাগ রেখে যেতে পারেন নাই। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানতে পারি, তখন বাংলার খুব দাপট ছিল; এমন কি, দিল্লীতে প্রতি বৎসর চাউল পাঠাতেন বাংলার শাসনকর্তারা। আর পাঠান আমলে সুদূর রাজধানী দিল্লীতেও বাংলার সঙ্গীতের আদর ছিল। অনেকে তো বলেন, বৈষ্ণবধর্মের মধুর রস ও কাশ্মীরী রস শৈবধর্ম, শক্তির সঙ্গে যার নাম জড়িত আছে, খানিকটা এই মুসলমান প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। নানকপন্থী, কবিরপন্থী ও শিখদের ধর্মের উৎপত্তিও তো এই মুসলমানদের সংস্পর্শে ও প্রভাবে। ঊনবিংশ শতকে মুসলমান শিল্পকলার ধ্বংস ঘটে, পৃথিবীর সর্বত্র—শুধু ভারতবর্ষে ইংরেজের আগমনে নয়। মোট কথা, মুসলমানকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষকে বোঝা যাবে না।

আজকেও, যখন ভারত খণ্ডিত হয়ে গেছে, মুসলমান কি করে না করে, তার প্রভাব ভারত এড়াতে পারবে না। এই দেশবিভাগ যে বিশ্ব-শান্তির পথেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, পূর্বে যে শান্ত সমাধানের সম্ভাবনা ছিল তা নষ্ট করেছে, সে বিষয়ে একজন ফরাসি পণ্ডিত সম্প্রতি কি বলেছেন তা শুনুন, অবশ্য ইংরেজি তর্জমায়। "The immense Indian nation, which seemed on the point of bringing into harmony, under the regime of the Pax Britannica, the teachings of Islam and one of the noblest systems of philosophical and religious thought

that humanity has conceived has removed its name from the map of the world. Hindustan and Pakistan are at each other's throats, and are preparing the way for a return to a general anarchy which will be but a caricature of the freedom which had appeared in such beauty in the dreams of Gandhi's noble spirit. Will Hindus and Muslims understand in time that their bloody quarrels can but prepare the way for the dictatorship of their powerful neighbour ?" (*Muslim Institutions* by Maurice Gaudefroy—Demombynes, pp. 213 14.)

ভগবান করুন, লেখকের এই আশঙ্কা অমূলক হোক। এখানে শুধু আমার বক্তব্য এই যে ইতিহাস শুধু অতীতের কথাই বলে না, ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও দেয়, উপরের উক্তি সেই ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য; তাঁর রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (৩৭৭-৮৭) এই বিষয়ে সকলকে পড়তে অনুরোধ করে আমাদের বক্তব্য আপাতত শেষ করি।

---

* আজ শিক্ষণের জন্য শিক্ষার্থী শিক্ষকদের নিকট আসছে আসে।

বর্তমান শিক্ষার প্রগতি

[শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত]

বর্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলিব না; না তুলিলে যদি লজ্জার হাত হইতে, পাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়! সমাজের শৃঙ্খলা, সংস্কৃতি ও উন্নতি বিধানে শিক্ষা এবং শিক্ষকের অবদান কত সমুচ্চ, ব্যাপক এবং গুরুতর —এই তত্ত্ব না বোঝা, বুঝিতে না চাওয়া যে কত বড় পাপ তাহা বর্ণনাতীত। এই পাপের বোধ নাই বলিয়াই তো আমি নিজে অধ্যাপনা ছাড়িয়া কেরাণী হইয়াছি; আমার মতই আমার স্নেহের শতশত ধীমান্ কৃতবিদ্য যুবকগণ অধ্যাপনার অবজ্ঞা করিয়া ডেপুটিগিরি প্রভৃতি কেরাণীগিরিতে জীবন সার্থক বলিয়া মনে করে।

থাক সে লজ্জার কথা, আত্মদৈন্যের কথা। কিন্তু দেশের এইরূপ দুর্ভাগ্যের কথা ভুলিয়া আমাদের নেতারা, শিক্ষাবিদেরা, শিক্ষাকে শিল্পমুখী, উপার্জনমুখী করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, এইটি আরও দুঃখের কথা, মানসিক অধঃপতনের কথা, চারিত্রিক অধোগতির কথা। 'এত স্কুল কি হইবে?—এত কলেজ কি হইবে?—ইহাতে দেশের যুবকদিগকে বিভ্রান্ত করা হইতেছে —বিপথে চালিত করা হইতেছে—খাইতে না পাইলে কাব্যচর্চায় কি হইবে?—ইতিহাস ভূগোল পড়িয়াই বা কোন্ পিতৃপুরুষের উদ্ধার হইবে?—সংস্কৃতের অনুস্বার-বিসর্গের বদলে কোন্ দিগ্‌প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?—চাই কারিগরি শিক্ষা, যাতে দুটো খেতে পারে।'—এই হইল এই যুগের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

ধরিয়া নিলাম, এই যুগবাণী একেবারে খাঁটি।

কিন্তু এমন কোন্ দুর্ভাগা শিল্পশিক্ষালয় আছে যার দরজা হইতে হতভাগ্য প্রবেশার্থীরা দলে দলে, শতে শতে, প্রত্যাখ্যাত, বিতাড়িত হইয়া আসে না? তার পরেও যে সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে গাদাগাদি করিয়া ছেলেরা ঢুকিয়া পড়ে, সে তো আমাদের দুরবস্থার কিংবা তাহাদের অভিভাবকদের দোষ নহে। শিল্পশিক্ষা লাভ করিয়াও যোলআনার কি হয়, তাহার বেশি কিছু না বলাই ভাল। জাতিতে ছুতার, মিস্ত্রি, কামার—চৌদ্দপুরুষে যাহাদের এই ব্যবসা—তাহারাই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারে না, জাত চাষীর দুর্দশার শেষ নাই। আর আহরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ ইহাদের ভাতে ভাত বসাইয়া অন্নসমস্যার সমাধানে কি করিতে পারিব, তাহাও বুঝি না।

এই সমস্ত কথা বলিয়া বিশেষ লাভ নাই। যুগের হাওয়া কারিগরী শিক্ষার দিকে বহিতেছে। সমাজের পাল সেই দিকেই সমাজকে টানিয়া নিবে। চলুক সেই দিকে। কিন্তু পরিণাম কি হইবে, তাহাই ভাবিতেছি। ত্রিকালদর্শী কবি না হইলে শাস্ত্রবিধি প্রণয়ন করা যায় না, জানিতাম। এখন কিন্তু অদূরদর্শী, অবিমৃষ্যকারী, গতানুগতিক গবেষণাই লোকশিক্ষক, লোকশিক্ষার নিয়ামক হইয়াছে। ত্রিকালদর্শী বলিলে খুব উদ্ভট কিছু বলা হয় না। মানুষমাত্রেই স্বভাবতঃ অল্পবিস্তর ত্রিকালদর্শী। অভিজ্ঞতা মানে অতীতের জ্ঞান। অতীত মানেই অন্ধই ইতিহাস। আর এই অতীতকে ভিত্তি করিয়াই তো বর্তমানে ভবিষ্যতের সৌধ নির্মাণ করা হয়। তবে এই ত্রিকালদর্শিতা সকলের সমান হয় না। যার জ্ঞান যত অধিক, যার বুদ্ধি যত পরিমার্জিত, নির্মল, যার চিত্তের সমতা স্থিরতা যত বেশি, তার দৃষ্টির প্রসারও তত বেশি।

প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্মের যতই দোষ থাকুক, পরিণাম যতই মন্দ হউক, তার একটা গুণ ছিল। অন্নবস্ত্রের সমস্যা তখন ছিল না বলিয়াই হউক, বর্ণাশ্রমধর্মের প্রেরণা উহার হইতে আসে নাই; হৃদয় এবং মস্তিষ্কই ছিল সেই প্রেরণার উৎস। বাণিজ্যব্যবসায়ী বৈশ্যই হউক, আর যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ই হউক, সকলকেই ব্রহ্মচর্যের কঠোর যম নিয়ম এবং আচার পালন করিতে হইত; তাহার উপরও ব্রাহ্মণ্যাভিমের এক শ্রেণীর লোক আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, যাহাদের অন্নবস্ত্রের দিকে দৃষ্টিই ছিল না, শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা, ভগবানের পূজা আরাধনাই যাহাদের ধর্মকর্ম ছিল। অর্থাৎ জৈব প্রয়োজনের সাধনা-মূলে মনুষ্য জীবনের সাধ্য এবং সাধনা হৃতগতিকৃত করিয়া রাখা হইত না। মানুষের প্রাণশক্তি নাভির ঊর্ধ্বে প্রেরণ করিবার চেষ্টা হইত। প্রাণশক্তি গুহ্যমূলেও নহে, লিঙ্গমূলে নহে, এমন কি নাভিমূলেও নহে, ভ্রূমধ্যে হৃদয়ে, মস্তিষ্কে চালনা এবং প্রতিষ্ঠা করিবার আদর্শ ও প্রয়াস ছিল।

বর্তমানে কিন্তু শিক্ষিতেরা তো জৈব প্রয়োজনের একান্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছেনই, যাঁহারা শিক্ষাবিদ্, দেশের শাস্ত্রকার, তাঁহারা কারিগরী শিক্ষার ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিতেছেন যে জৈব প্রয়োজন সাধনই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য, জীবনের প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ হওয়া উচিত। অর্থাৎ সংসার উদর-কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং ঘোরাই উচিত। সংস্কৃত পড়িবার দরকার নাই, দর্শন পড়িবার প্রয়োজন নাই—শেখ পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি বিজ্ঞান, শেখ মোটর-মেরামতি, কাপড়বোনা, বাড়ী তৈয়ারি ইত্যাদি। বিজ্ঞানও শিখিবে জ্ঞান-লাভার্থে নহে—অর্থোপার্জনের করণ বা সাধন হিসাবে। এই যে materialisation of culture and civilisation, সংস্কৃতির পার্থিবী-করণ, ইহার ফলে কি রাক্ষস ও দৈত্যই সৃষ্টি হইবে না? হিরণ্যকশিপু-প্রহ্লাদ সংবাদের মর্মকথাটি কি? রঘুনন্দনকে বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার পরিকল্পিত সমাজের চিত্ররূপ দেওয়া হয়—চরণযুগলের উপর একটা

টিকিওয়ালা মাথা। আর আমাদের আদর্শমানবের যদি মূর্তি আঁকিতে হয়, তাহা হইলে নাভি হইতে অবয়বই আঁকিতে হইবে, মাথাও থাকিবে না, মুকুও থাকিবে না। তাহাও আবার মাংসপেশি বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইতে হইবে। কারণ পাশ্চাত্য শূন্য আর উদরপী বৈশ্যের আজ অহি-নকুল সম্পর্ক।

বৈশ্য প্রয়োজন ন-গণ্য নহে; উহা জীবন ধারণের প্রথম এবং অপরিহার্য প্রয়োজন। কিন্তু অন্নবাদই মানুষের সর্বাঙ্গ নহে, তদুপরি উত্তমবাস স্থাপন না করিলে মনুষ্যমূর্তি সম্পূর্ণ হয় না। কৃষকও ভাল, মজুরও সজ্জন, কিন্তু কৃষক-মজুর-রাজ শিক্ষোদরবাদেরই নব-সংস্করণ হইয়া পড়িবে না কি? এ দেশ সৃষ্টিতে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রকৃতির দৈত্যই উৎপন্ন হইবে না কি? হিরণ্য বা স্বর্ণ অর্থাৎ অর্থই হইবে যাহাদের জীবনের লক্ষ্য—হিরণ্য-হরণই হইবে যাহাদের বৃত্তি, হিরণ্যই হইবে যাহাদের প্রহরণ, হিরণ্য বিতরণই হইবে যাহাদের সমাজধর্মন। হিরণ্যই হইবে মূল্য বা অন্বেষণীয়—হিরণ্যর মুগের ছলনায় সীতারূপিণী সংস্কৃতি অপহৃতা হইবে—রাবণ অর্থাৎ কাঞ্চনচোটা ঠেকাইবে কে? চার্বাকই এই সমস্ত লোকের মুনি, একচক্ষু শুক্র তাহাদের আচার্য, অন্নপ্রাণই তাহাদের ব্রহ্ম। রাম বা কৃত্তি জন্মিবে কি? প্রহ্লাদ বা আনন্দ, শান্তি মিলিবে কি? এখনই ত শিক্ষোদর-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। কারখ সন্ধানের বাহুল্য—স্বল্পে অসন্তোষ—ইহাই তো প্রথম এবং প্রধান সমস্যা।

বলিয়া রাখিলাম, কপাল-কপোল-বর্জিত কলেবরে জীবন ধারণ আমাদের পাপ নহে, আমাদের বর। শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্, এইখানে আদ্য শব্দের মানে প্রথম, প্রধান এবং অনন্য। তাহা হইলেও সকলে তো হাল চষিবে না, হাতুড়ি পিটিবে না, কলিকও চালাইবে না? শত শত লোক তো কলম চালাইবে, মুখবাজী করিবে। তাহারাও না হয় হাতুড়ি-কাস্তে-মার্কা পতাকা দেখিলে সম্মানে সসম্ভ্রমে শির নত করিবে, কপালে করাঘাত করিবে, কিন্তু ললাটে ঊর্ধ্বে সবিতৃ-মণ্ডলাঙ্কিত বা চন্দ্রচিহ্নিত, তারকা-শোভিত বৈজয়ন্তী-দর্শনে যদি একটু শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করে, তাহা হইলে কি তাহাদের স্বর্গ-চ্যুতি পাপ হইবে? তাহারাও যদি একটু সংস্কৃত পড়ে, একটু দর্শন ও ইতিহাসের চর্চা করে, তাহা হইলে 'অন্নময়' শব্দ ব্যবহার করিব না, কিন্তু অকর্মণ্য হইবে কি? তাহারা অপাংক্তেয় হইবে কি? যুদ্ধের প্রহারে তাহাদের মোহনাশের প্রাণ-নাশের চেষ্টা হইবে কি? Humanities-এর এইরূপ অবস্থানে Humanity থাকিবে কি? কৃষিবৃত্তি যাহাদের কাম্য-সাধনা, জীবনের ধর্ম-কর্ম, খাদ্যসংগ্রহ বিষয়ে উদরপূর্তিরক্ষে সমস্ত যে কোন উপায় তাহাদের পক্ষে ধর্ম হইবে না কি? বৃষপ্রথা বৃহস্পতিকে বহিষ্কার করিয়া দিলাম—একচক্ষু শুক্রাচার্যকে, কিংবা মূষিকবাহন লম্বোদরকে সমস্তাবও না হয় জানাইলাম—এইবার ও শান্তিঃ শান্তিঃ, শান্তিঃ এই ত্রাহ্বতি উচ্চারণ করিতে পারিব কি?

পুনশ্চ :—

এক বছরেরও উপর হইল, এই মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। মাস দুয়েক হইল—সার্ব সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে একই প্রকার মন্তব্য দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। রিপোর্টের ৬৬ পৃষ্ঠায় আছে :—

"If we wish to bring about a savage upheaval in our society, a *raksasa raj*, all that we need to do is to give vocational and technical education and starve the spirit. We will have a number of scientists without conscience, technicians without taste who find a void within themselves, a moral vacuum and a desperate need to substitute something, anything, for their lost endeavour and purpose. Society will then get what it deserves."

মন্তব্য অনাবশ্যক।

শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা

[শ্রীবকুলবালা সেন]

১

শ্রেণী কক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে না পারিলে শিক্ষকের শিক্ষাদানের সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া যায়, এ বিষয়ে আশা করি মতদ্বৈধের অবকাশ নাই। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীই জানেন, শৃঙ্খলার অভাবে কত আন্তরিক প্রয়াস শুধু যে তাঁহাদের মর্মবেদনার সৃষ্টি করে তাহাই নহে, ভবিষ্যৎ সমাজ যাহাদের মুখ চাহিয়া অগ্রগতির আর এক ধাপ অতিক্রম করিবার জন্য উন্মুখ আগ্রহে পথ চাহিয়া আছে, তাহাদের সে পথও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠে।

শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষা করার উপায় সম্বন্ধে নানা লোকে নানারূপ পরামর্শ নির্দেশ দিয়াছেন। সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত অর্থাৎ Spare the rod and spoil the child-এর যুগ হইতে বর্তমান কালের teacher none but a gardener-এর যুগ পর্যন্ত শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষার যতগুলি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেগুলির দ্বারা নিশ্চিত ফললাভের সম্ভাবনার উপর নির্মম কটাক্ষপাত করিয়া গৃহাভ্যন্তরের বাতাস যিনি গরম করিয়া তুলিতেছিলেন, তিনি তিরিশ বৎসরাধিক শিক্ষকতা করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, সুতরাং পুঁথির সাক্ষ্য স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না। মহাসন্তোষের সহিত তিনি বলিতেছিলেন, এত কাল শিক্ষকতা করিতেছি, কিন্তু এমন দুর্বিনীত শ্রেণী আমি ইতিপূর্বে দেখি নাই।

এক একটি শ্রেণী চাঞ্চল্য, নিয়মভঙ্গ, অমনোযোগিতা, অবাধ্যতা প্রভৃতির জন্য বিশেষ করিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়া থাকে। কিন্তু এই সব বিশেষখ্যাতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও যে শৃঙ্খলা আনা সম্ভব, অথচ একজন শিক্ষয়িত্রীর অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্য জানাইয়া এ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিলাম।

দীর্ঘ অবকাশের পর প্রথম যেদিন তিনি বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিলেন, প্রায় প্রতি শ্রেণীতেই কম বেশী বিশৃঙ্খলা ও মনোযোগের অভাব তাঁহার চোখে পড়িল। শিক্ষাদানের প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে পরদিন হইতেই তিনি বিশেষ করিয়া শ্রেণী-শৃঙ্খলা বিধানের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

কিন্তু কখন শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে তাঁহাকে বেশী অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শ্রেণীর প্রকৃতি বুঝিবার জন্য একদিন অর্ধঘণ্টা সময় ব্যয় করিতে হইয়াছিল মাত্র। সেদিন বাংলা সাহিত্যের ঘণ্টায় ছাত্রীদের সঙ্গে সাধারণ ভাবে সাহিত্য আলোচনা করিয়া তিনি তাহাদের সাহিত্যের রুচি-প্রকৃতি বুঝিয়া লইলেন। তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হইল। এই আলোচনার ফলে তিনি ছাত্রীদের মধ্যে দুটি শ্রেণী আবিষ্কার করিলেন। একদল খ্যাত ও এবং অখ্যাত লেখকগণের, বিশেষ করিয়া ঔপন্যাসিকদের সহিত কিছু কিছু পরিচিত, এবং নিজেদের সাহিত্য-রসজ্ঞ বলিয়া মনে করে; অপর দলের সাহিত্য-পরিচিতি ইহাদের অপেক্ষা পুস্তকের সংখ্যাগত হিসাবের দিক দিয়া কম হইলেও, শ্রেণীগত হিসাবে বেশী, এবং তাহারা একটু দার্শনিক ভাবাপন্ন। ইহারা নিছক উপন্যাস-পাঠিকাদের মত আলোচনায় যোগ দিতে পারিতেছে না, এবং সেজন্য কুণ্ঠাবোধ করিতেছে; অর্থাৎ সাহিত্যরসজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে ইহাদেরও আগ্রহ আছে।

শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদের এই সাহিত্য রস-লিপ্সা ও

দার্শনিক ভাবকেই পাঠদানের প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিলেন। প্রথম দিনের জন্য পাঠ নির্বাচন করিয়া লইলেন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের খণ্ডাংশ 'জীবন হইতে যত'। পাঠদানের শেষে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্বে শিক্ষয়িত্রী একবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে প্রথম বেঞ্চ হইতে শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, প্রত্যেকের দৃষ্টিই আগ্রহে উজ্জ্বল। সূচীভেদ্য, অন্ধতমোময়, তুণগুল্ম অন্ধকারের ন্যায় নিবিড় ঘনসন্নিবদ্ধ অধ্যয়নী যেন আর পুঁথির অক্ষরে আবদ্ধ নয়। ক্রোশের পর ক্রোশ পল্লবের অনন্ত অরণ্যের মর্মর ধ্বনি যেন তাহারা শুনিতে পাইতেছে, তাই এত উৎকর্ণ। শৃঙ্খলার অভাবের চিহ্ন মাত্র নাই। শব্দঝঙ্কারের গম্ভীর মাধুর্য ভ্রমর-নিনাদের মত শুধু তাহাদের মনকে সম্মোহিত করে নাই, এ চিত্র যিনি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইলেন, সানন্দ কৃতজ্ঞতায় সেই শিক্ষয়িত্রীর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তুলিয়াছে।

শিক্ষয়িত্রীর পরিকল্পনা আশাতীত সাফল্য লাভ করিল। সাহিত্য পড়াইতে গিয়া যে শ্রদ্ধা তিনি আকর্ষণ করিলেন, ব্যাকরণের শ্রেণীতে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইল। যাঁহাকে শ্রদ্ধা করে বা ভালবাসে, তাঁহাকে খুশি করিবার জন্য করিতে পারে না এমন কাজ নাই, ইহাই কিশোর চিত্তের বিশেষত্ব। সুতরাং শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি আজ শুধু কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া ছাত্রীদের মনে হইল না; কাঁটার পাশে একটি সুগন্ধি গোলাপও ফুটিয়া আছে বলিয়া মনে হইল।

শিক্ষয়িত্রীর পূর্ণ পরিচয় আসিল, শেষের ঘণ্টায়। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ সকলেই জানেন, বিদ্যালয়ে শেষের ঘণ্টায় ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বিষয়ে নিবিষ্ট রাখা সর্বাপেক্ষা দুরূহ। এই ক্লান্ত গৃহগতপ্রাণ ছাত্রীদের ইতিহাস পড়াইতে হইবে! শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করিয়াই শিক্ষয়িত্রী বুঝিতে পারিলেন, ছাত্রীরা নিতান্ত নিয়মাবদ্ধ বলিয়াই বসিয়া আছে, মানসিক অবস্থা শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল নয়। কিন্তু সাহিত্য পাঠনায় তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠনায় তাহা সাহায্য করিল। সন তারিখের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ গোটা কয়েক যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ ক্ষমতার উত্থান-পতনই ইতিহাস নয়, দেশের সভ্যতার ইতিহাস সাহিত্যের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত—শিক্ষয়িত্রী এই দিক ধরিয়াই ইতিহাসের আলোচনা সুরু করিলেন। তুর্কী, পাঠান, মোগল, ব্রিটিশ যেন শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। যে পটভূমির উপর এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—সেই যে ভারতবর্ষ, তাহার সভ্যতার রূপ কি? হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈদিক, দ্রাবিড় সভ্যতার নানা বিবর্তন—সেই নালন্দা, তক্ষশিলা, গুরুগৃহ—সেই তপোবন, যেখানে লৌহ্য সভ্যতাকে শুধু বিজোত্তর বলিয়া কোলে তুলিয়া লইতেছেন?

ছাত্রীদের চাঞ্চল্যের শেষ রেখাটিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিস্ময়ে আগ্রহে সেই ভারতের প্রতিটি ধূলিকণার পরিচয় লইতে তাহাদের মন উন্মুখ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় ছুটির ঘণ্টা বাজিয়া গেল। ছাত্রীরা সবিনয়ে জানাইল, তাহারা ছুটি চায় না, ছবিটির পরিপূর্ণ রূপ দেখিয়া তারপর বাড়ী যাইবে।

ইহার পর নবম শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বা ছাত্রীদের মনোযোগের অভাবে শিক্ষয়িত্রীকে আর কোনদিনই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

কিন্তু নবম শ্রেণীর জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নপথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

২

নবম শ্রেণী; বাংলা সাহিত্য পড়া হইতেছে। রামের বনগমনের পর ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় ফিরিতেছেন।

প্রথম বেঞ্চের মেয়েরা পূর্ণ আগ্রহে শুনিতেছে,

প্রশ্নের উত্তর দিতেছে, নূতন নূতন প্রশ্ন করিয়া মনের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া লইতেছে। দ্বিতীয় সারি প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহশীল, কিন্তু তাহাদের নিজেদের কিছু জিজ্ঞাস্য নাই। তৃতীয় ও চতুর্থ সারি—শিক্ষয়িত্রীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া,নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপের স্পৃহা মিটাইতেছে। প্রশ্ন করিলে বোঝা যায়, পাঠ্য বিষয়ের আলোচনার বিষয়-নির্দেশও তাহাদের অধিকাংশের কানে বা মনে প্রবেশ করে নাই। শেষ সারি দুটিতে—নিঃশব্দে একের চুলের সঙ্গে অপরের চুলের গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতেছে, শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, ভাষাহীন জগতের মানব সমাজের অনুকরণে সম্মুখের সারির মেয়েদের সঙ্গেও রহস্যালাপের চেষ্টা করিতেছে। শিক্ষয়িত্রী সম্বন্ধে সম্পূর্ণই নির্বিকার-চিত্ত।

কিন্তু ইহাই তাহাদের সর্বাপেক্ষা শান্ত ও ভদ্র মূর্তি। স্কুলের দুএকটি ঘণ্টা পাশের ঘরে বসিয়া শিক্ষয়িত্রী ইহাদের ভূগোল, ইতিহাস ও ইংরাজি পাঠনার সময়কার প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন। হয়তো নাম ডেকেই ডিক্রি করা হয়, অথবা শিক্ষক মহাশয় বোর্ডে কিছু লিখিতে থাকেন, ততক্ষণ তাহা কি বিড়ালছানা না মাছের বাজার, তাহা বোঝা মুস্কিল হইয়া পড়ে। শিক্ষক যখন প্রশ্ন করিয়া ছাত্রীদের পঠনীয় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করিতে প্রয়াস পান, তখন পরস্পরের মধ্যে আলাপের ফাঁকে ফাঁকে এক সঙ্গে পাঁচ সাতজন যাহার যাহা খুশী উত্তর দিতে থাকে, তাহার মধ্যে না থাকে কোন চিন্তাশক্তির প্রকাশ, না থাকে কোন তথ্যতার পরিচয়। শিক্ষক শ্রেণী-কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় বা প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় যে দাঁড়াইবার একটা সাধারণ রীতির সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই পরিচিত, সে সম্বন্ধে ইহাদের কিছুমাত্র মুক্তপাত আছে, এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

বাংলার ঘণ্টায় শিক্ষয়িত্রী শান্ত গম্ভীর ভাবে পড়াইয়া যেমন। প্রথমেই শ্রেণী-কক্ষে প্রতিপালনীয় নিয়মগুলি তাহারা জানে কিনা, প্রশ্ন করিলেন। বোঝা গেল, অধিকাংশ নিয়মই তাহাদের জানা আছে। এই প্রশ্নের পরোক্ষ ফলে মেয়েদের মনে নিয়ম-পালন করা সম্বন্ধে কিছুটা চেতনা আসিল। তারপর প্রতিজনকে প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইয়া উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দিতে দিতে দেখা গেল, অর্ধঘণ্টা পরিমিত সময় পরে প্রত্যেকে নিজে হইতেই দাঁড়াইয়া উত্তর দিতেছে। প্রশ্নোত্তরের সময় ছাত্রীদের প্রদত্ত উত্তর সংশোধন করিয়া বোর্ডে লেখার পন্থা অবলম্বন করায় এবং প্রথম বেঞ্চ হইতে শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত ইতস্তত যথেচ্ছ প্রশ্ন বর্ষিত হওয়ায় মেয়েরা সমষ্টিগত ভাবে আলোচ্য বিষয়ে একাগ্র হইয়া উঠিল। প্রত্যেকেই প্রতিটি প্রশ্নের প্রতি নিবিষ্ট হইয়া তাহার উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। যাহারা অনভ্যাসবশত চিত্তনিবেশ করিতে পারিল না, তাহারাও সতর্ক হইয়া রহিল, না জানি, কখন শিক্ষয়িত্রী তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া বসেন। অন্যান্য ঘণ্টার প্রথমার পর দ্বিতীয়া, তারপর তৃতীয়া এইরূপ ধারাবাহিক ক্রমে প্রশ্ন করার ফলে শুধু পার্শ্ববর্তিনীটিই আলোচ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া সতর্ক হইত। অন্যান্য ছাত্রীগণ ততক্ষণ পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত দিনেমার আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া গত রাত্রির স্বপ্নের কাহিনী কোনটাই বাদ দিত না। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর অবলম্বিত পন্থার অন্যথা হইবার বা কলহের করিবার কোন সুযোগই থাকিল না।

শিক্ষয়িত্রী শক্তি বোধ করিলেন। শুধু তাই নয়, একটু সাফল্যের আনন্দও মনে দেখা দিল। শেষ সারিগুলির ছাত্রীদের মধ্যেও প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পাঠের আলোচনায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছে। অপরার্ধ প্রস্তরবৎ চুপ করিয়া মনে মনে শিক্ষয়িত্রীর মুণ্ডপাত করিতেছে কিনা কে জানে। কিন্তু তাঁহার

কক্ষ হইতে নিষ্ক্রমণের সময় দাঁড়াইল। সম্মান প্রদর্শন করিতে কেহ ভুলিল না।

এখনও অনেক বাকি। শুধু নিস্তব্ধতা শিক্ষা-গ্রহণের অনুকূল নয়, তাহাদের প্রত্যেকের মনে আগ্রহ জাগাইতে হইবে। শিক্ষয়িত্রী এই শ্রেণীগত বিশৃঙ্খলার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পরদিন অবসরের ঘণ্টায় আবার পার্শ্ববর্তী কক্ষ হইতে ইহাদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ আসিল।

কলরব পূর্বের হইতে সপ্তমে উঠা নামা করিতেছে। শিক্ষক প্রবেশ করিলেন। কলরব তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না, যেন গত পরীক্ষায় কেন তাহাদের কম নম্বর দেওয়া হইয়াছে, এই প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া রোষারোপের ভঙ্গিতে আরও দু-এক ঝিল্লি বাড়িল। শিক্ষয়িত্রী তন্ময়ত্ব বিস্মৃত তাহাদের কথা ও প্রশ্নের প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নিজেদের সৃষ্ট এই হট্টগোলে অতিষ্ঠ হইয়া মেয়েদের মধ্যেই একজন একবার চীৎকার করিয়া উঠিল—আঃ, কি করছিস্ তোরা! একটু চুপ কর তো, কি গোলমাল!

শিক্ষয়িত্রী এবার যেন সূক্ষ্ম একটি আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন। মেয়েরা কথা বলিতে ভালবাসে বটে, কিন্তু গোলমাল পছন্দ করে না—এ সিদ্ধান্ত অন্তত পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করা চলে। বৈশোর আত্মপ্রকাশের যুগ। নিজেকে শক্তভাবে শক্তধারায় বিস্তারিত করিয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত একাত্ম হইয়া জগৎকে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিবার তৃষ্ণা এই সময়েই মনে জাগে। অথচ ইহার তৃপ্তিবিধানের পথ জানা থাকে না, সুতরাং কিশোর মনে সামর্থ্যের অভাব থাকাই তো স্বাভাবিক। তাহাদের প্রত্যেকটি ভাব, উচ্ছ্বাস, কল্পনা, চিন্তা, প্রকাশের সুষ্ঠু পথ দেখাইয়া দিয়া এখানে সার্থক আনিতে হইবে। তাহাদের মন সুসংবদ্ধ করিতে পারিলে এই অদম্য শক্তি শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়া শিক্ষা গ্রহণের কাজে নিযুক্ত হইবে, এবং প্রার্থিত ফললাভে সাহায্য করিবে বলিয়াই আশা করা যায়।

পরের ঘণ্টায় বাংলা সাহিত্য। আজ রবীন্দ্রনাথের নাটকাংশ অন্ত-পরীক্ষা পড়া হইবে। শিক্ষয়িত্রী কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দৃঢ়প্রত্যয়ের সুখে ছাত্রীদের প্রত্যেকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার বল মন্ত্রৌষধির মত কাজ করিল, এক মুহূর্তে কক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বহুকাল অনুসৃত অভ্যাস বশে যে দু চারিজন তখনও বলিয়াছিল—সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এবার শিক্ষয়িত্রী অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের আবরণ সরাইয়া দিয়া পাঠ্যবিষয়ের আলোচনা সুরু করিলেন; ছাত্রীরা স্বস্তিবোধ করিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিল, সাধ্যমত শিক্ষয়িত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল; প্রথম হইতে শেষ সারি—সবাই। এ সুযোগ শিক্ষয়িত্রী হেলায় হারাইলেন না। ছাত্রীদের দুটি ভাগ করিয়া দিলেন। তাহাদের নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে কথা বলার সুযোগ দিতে হইবে। উত্তরা ও রাজর ত্রিপুরা রাজের বিপরীত প্রকৃতির দুটি ছেলে। ছাত্রীদের উপর দল রাজপুত্রদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে কি বলিবার আছে, তাহাই যুক্তি সহযোগে প্রতিপন্ন করিবে ও পরস্পরের মত খণ্ডন করার প্রয়াস পাইবে। ছাত্রীরা ভারি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তাহারা শুধু কথা বলার সুযোগ পায় নাই, নিজেদের কথা যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত করিবার, নিজেদের চিন্তাধারা উন্মুক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছে। শিক্ষয়িত্রী শুধু লক্ষ্য রাখিলেন, তাহারা একসঙ্গে কলরব করিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা না করে। আশাতীত ফল পাওয়া গেল, সুন্দর সুষ্ঠু নিয়মবদ্ধ ধারায় তাহারা আলোচনা শেষ করিল। এই আলোচনা অর্থাৎ উত্তর রাজপুত্রের চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা

বাড়ী হইতে গুছাইয়া লিখিয়া আনিবার নির্দেশ পাইয়া তাহারা খুশী হইল।

ছাত্রীদের আলোচনার ধারা লক্ষ্য করিয়া শিক্ষয়িত্রী বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধিমতী। সুতরাং চিন্তাশক্তি পরিচালনার পথে আত্মপ্রকাশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলে তাহাদের বিশৃঙ্খল নিরুদ্ধ ভাবপুঞ্জ প্রতিদিনের বোঝাপড়ার মতই শিক্ষয়িত্রীর অভিপ্রেত খাত বাহিয়া চলিবে।

ইহার পর হইতে সাহিত্য পাঠনায় কখনও দলগত ভাবে কখনও ব্যক্তিগত ভাবে ছাত্রীদের মধ্যে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিলে, সে পথ শিক্ষয়িত্রী কখনই উপেক্ষা করিতেন না। তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইল। আপনাদিগকে প্রকাশ করিবার সুষ্ঠু পথ পাইয়া সাহিত্যের যে কোন প্রকারের পাঠনাতেই ছাত্রীরা শুধু যে কলরব করার অভ্যাস ত্যাগ করিল তাহাই নয়, উন্মুখ ও জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল।

ইতিহাস পাঠনাতেও এ প্রভাব কার্যকর হইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়; অর্থাৎ ছাত্রীরা যতটা নিস্তব্ধ থাকিত, ততটা উন্মুখ থাকিত না।

ইহার কারণ সুস্পষ্ট। প্রথম কারণ, ইতিপূর্বে ছাত্রীরা যে পদ্ধতিতে ইতিহাস শিক্ষা করিয়াছে তাহা দ্বারা তাহাদের মনে কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকা গড়িয়া উঠে নাই। যে সামান্য তিথির উপর দাঁড়াইয়া ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে গল্পের মত ধারাবাহিকতা দেওয়া যাইতে পারে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একান্ত পরিচিত বিষয়েরই আবরণমুক্তিরূপে উদ্ঘাটিত করা যাইতে পারে, সেই মূল বস্তুরই সম্পূর্ণ অভাব ছিল। দ্বিতীয় কারণ, ইতিহাস পাঠনার নির্দিষ্ট সময় প্রতিদিনই শেষের ঘণ্টায়। একবার মাত্র পনের মিনিট টিফিনের ছুটি থাকে, শিক্ষয়িত্রী বা ছাত্রী কাহারই কোন অবকাশ নাই। সুতরাং শেষ ঘণ্টায় শিক্ষাদাত্রী এবং শিক্ষার্থী উভয় পক্ষের ক্লান্তি প্রবল বাধা হইয়া দাঁড়ায়। তৃতীয় কারণ, এরূপ অবস্থায় ক্লান্ত, স্বভাবচঞ্চল ছাত্রীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইলে যতখানি সময় সজাগ প্রয়োজন তাহারও একান্তই অভাব। কারণ, বিদ্যালয়ের পাঠসূচিতে প্রতিমাসের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের পরিমাণ উপযুক্ত পরিমাণের দ্বিগুণ। সুতরাং নানা ধারা-উপধারা সম্বলিত আইন কানুন ও রাজশক্তির উত্থান পতনের সাল তারিখ সম্বলিত ঘটনাবলীর ব্যাকরণের মতই কণ্টকাকীর্ণ হইয়া আবির্ভূত হওয়া রোধ করা যায় না। আবার মাসিক পরীক্ষায় এই সকলের হিসাব নিকাশ ছাত্রীরা ঠিক মত দিতে না পারিলে কর্তৃপক্ষের নিকট শিক্ষয়িত্রীকে জবাবদিহি করিতে হইবে। লর্ড কার্জনের দেববাক্যের তীক্ষ্ণতা সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিতে করিতে অগত্যা শিক্ষয়িত্রীকে সংক্ষিপ্ত নোট লিখাইয়া দেওয়ার পথই গ্রহণ করিতে হইল। অভ্যস্ত পথার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয় তো বা খুনীই হইল, মাসিক পরীক্ষার ফল দেখিয়া বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর তৃপ্তি আসিল না। উদ্যান সমুদ্রকে ছন্দে বাঁধা হইল, তাহাতে পাল তোলা নৌকার বিহার দেখা অদৃষ্টে ঘটিল না। যন্ত্রচালিত জলযানের ক্ষিপ্রতা ও কর্কশতা একটা মস্ত বড় ছন্দপতনের মত মনে অস্বস্তি জাগাইয়া রাখিল।

শিক্ষক

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুহ]

শিক্ষক তাঁহার অধীত বিদ্যা নিঃশেষে দিয়া সুখী, ছাত্রগণ ছাত্র সর্ব-প্রযত্নে তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ। ইহাই শিক্ষক ও ছাত্রের ধর্ম। এই ধর্ম পালন করিয়া গিয়াছেন এরূপ একজন শিক্ষকের কথা প্রত্যহ অন্তরে এখানে স্মরণ করিতেছি।

ত্রিশ-পঁইত্রিশ বছর আগেকার কথা। অধ্যাপক ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় তখন চাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ললিত বাবু ইংরাজির নাম ডাকের অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রও তিনি ছিলেন সেরা। সেরাই বলিলাম। তাঁহার বি. এ. পরীক্ষার বার ললিত বাবুর বন্ধু বান্ধবেরা ললিতমোহনকে বলিয়াছিল—"ললিত, এ বছর তুই পরীক্ষা দিসনে, প্রথম হতে পারবিনে। প্রথম হবে যদুনাথ (সরকার)", তার উত্তরে ললিতমোহন বলিতেন—"তাতে আমার লাভ কি! বন্ধুর সঙ্গে না হয় দ্বিতীয় হব,—that giant" কথাটা ললিতমোহনের মুখেই ক্লাসে শুনিয়াছিলাম।

ললিতমোহন বি, এ, ক্লাসে Shakespeare পড়াইতেন। বইয়ের আকারের নোট পেপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে নোট লিখিয়া আনিতেন। কোথা দিয়া ছাত্রদের একটি ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। আমরা যে সময়ের কথা এখানে বলিতেছি তার আগে তিনি Merchant of Venice, Macbeth, Hamlet, As You Like It, ইত্যাদি বহুবার ছাত্রদের পড়াইয়াছিলেন। বলা যাইতে পারে বারবার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ফলে সেক্সপিয়ার তাঁহার নখদর্পনে ছিল। তবুও দেখিয়াছি কচিৎ কখনও তিনি ক্লাস লইতেন না। ক্লাসে আসিয়া বলিয়া যাইতেন—"আজ তৈয়ারি হইতে পারি নাই।" বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, অভিজ্ঞ অধ্যাপক, যে বহির অধ্যাপনা হয়ত পূর্বে বার কয়েক করিয়াছেন, তাহাও তিনি প্রতিবার পড়াইবার সময় আর এক বার পড়িয়া লইতেন, কি বলিবেন তাহা নোট করিয়া আনিতেন। আর যেদিন সে সময় পাইতেন না, ক্লাসে লইতেন না। "ছাত্রদের সর্বোৎকৃষ্ট আমার যাহা দেওয়ার আছে, আর দিতে পারি, দিব" এই প্রেরণাই উহার মূলে ছিল। পড়িয়া যে আসিতেন এ কথা স্বীকার করিতে তাঁহার গ্লানি বোধ ছিল না, উল্টা গৌরব বোধ করিতেন।

সেই দিন, আর এই দিন! 'যাহাদের মন বয়সে জীর্ণ হইয়াছে তাহারা তো পুরাতনের দোহাই দিবেই', জানি, এই চাপান দেওয়া হইবে। কিন্তু সম্ভবতঃ তাহা চাপানই হইবে। সে সময়ে কলিকাতায় এমন দুই একজন অধ্যাপক ছিলেন, যাঁহাদের পঠন-পাঠন শুনিতে অন্য কলেজের ছাত্রও তাঁহাদের ক্লাসে যাইত। আজ সেরূপ যায় কিনা তার সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই; ছাত্র-জগত হইতে লেখকের ব্যবধান ত্রিশ-পঁইত্রিশ বছরের। যতটা শুনিতে পাই ও দেখিতে পাই, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে সেই পঠন যাহারা নাই, আর সাধারণ ছাত্রদের সেই বিদ্যা অর্জনের স্পৃহাও নাই। ইস্কুল কলেজ এখন বিদ্যবিদ্যে পর্যবসিত হইয়াছে, বোল তার ফিরিয়া গিয়াছে। এখনকার বিদ্যারণ্যের বোল হইতেছে কেল কড়ি, মাখ তেল।

আজিকার চিত্র বিপরীত। অধ্যাপকেরা বাড়িতে পড়িবেন কখন; তিন সিফ্‌টে তাঁহাদের ক্লাস নিতে হয়। তদুপরি গৃহশিক্ষকের কাজও তাঁহাদের অনেকে করেন। অবসর নেই মন দিয়া অবসাদই মাত্র পরিবেশন করা যায়। কবে মোড় ঘুরিবে? কে বলিবে? অর্থ যে আজ পরমার্থের আসনে আসীন।

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীশরৎচন্দ্র বসু]

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান—শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, বি ই এস। প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৪৮। পৃষ্ঠা ৸৶০ + ৩১৫। মূল্য ছয় টাকা। এ মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা—১২।

শিক্ষকশিক্ষণ-বিদ্যালয়গুলিতে বাংলায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হওয়াতে সম্প্রতি শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকটি এই গ্রন্থগুলির অন্যতম। সম্ভবত পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লেখক বিষয়বস্তুর চয়ন ও বিন্যাসে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগবিধির শাস্ত্রানুমোদিত ধারা সর্বত্র মানিয়া চলেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রথম ও তৃতীয় ভাগের বহুলাংশ এবং সমগ্র পরিশিষ্ট-টি মনোবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এই হিসাবে গ্রন্থখানির নামকরণও সঙ্গত হয় নাই। পুস্তকটির এই অধ্যায়গুলিতে লেখকের মতামত অনেকস্থলে যুক্তিহীন উচ্ছ্বাস এবং তথ্যনিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার সাম্যবাদী পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত হিসাবে লেখক রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার গুণানুকীর্তন করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সম্পর্কে কোন নজির বা তথ্যের উল্লেখ করেন নাই। মৌলিক মানসিক শক্তির আলোচনায় লেখক সম্ভবত সূত্রাকারে টিপ্পনী করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, 'সোজা কথায় Hormo বলিতে আমরা অবচেতন মনের কার্যকলাপকেই বুঝিয়া থাকি।' এইরূপ ব্যাখ্যায় প্রথম শিক্ষার্থী, Hormo বা এষণা এবং অবচেতন মনকে একার্থ-বোধক মনে করিবে না কি?

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের শেষাংশে এবং তৃতীয় ভাগের প্রথমাংশে এমন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে যাহা সচরাচর শিক্ষা-সম্পর্কিত মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থে আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতার অভাবে এবং আলোচনা তথ্যবাহী না হওয়ায় এই অধ্যায়গুলিও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞাতব্য বস্তুর নিরূপণেও লেখকের বিষয়-প্রবেশের ক্রমের পরিচয় পাওয়া যায় না। বংশানুবর্তন ও পরিবেশ অধ্যায়ে লেখক বংশানুবর্তনবাদকে কর্মফলেরই প্রকার বিশেষ বলিয়াছেন, কিন্তু এই মন্তব্যের পক্ষে কোন যুক্তি দেন নাই। বংশানুবর্তনের আলোচনায় লেখক Mendel সাহেবের পরীক্ষা ও গবেষণার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, কিন্তু Galton সাহেবের ভাগ্যে সে মর্যাদাটুকুও জোটে নাই। শিক্ষা-অর্জনের রীতির আলোচনার প্রসঙ্গে মনস্তত্ত্ববিদ্ Kohler-এর পরীক্ষা বা মতবাদ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। Temperament বা মেজাজ সম্পর্কে লেখক বলিয়াছেন যে, অন্তঃক্ষরা-গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়া-সাম্যের উপর ব্যক্তির মেজাজ যে নির্ভরশীল, তাহা নাকি বিজ্ঞান দ্বারা এখনও সমর্থিত হয় নাই। লেখক কি মনে করেন যে মেজাজ ধাতু-পিত্ত বা কফের আধিক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?

পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারে সর্বত্র পদ্ধতি রক্ষিত হয় নাই। পরিশিষ্টে গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা থাকিলে এই অসঙ্গতি সত্ত্বেও প্রথম শিক্ষার্থীর নিকট এই গ্রন্থ অনেক সুগম হইত। তাহাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের অধ্যায়গুলির রচনাকৌশল বহুলাংশে সাময়িক পত্রাদির জন্য লিখিত প্রবন্ধাদির শৈলীর অনুরূপ

বলিয়া এইরূপ প্রামাণ্য গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়গুলির মধ্যে যে যোগসূত্র থাকা উচিত, উহাদের মধ্যে তাহা নাই।

সমালোচনায় যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলা হইয়াছে তৎসত্ত্বেও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার দিক দিয়া বিচার করিলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ পর্যন্ত শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে যতগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে আলোচ্য গ্রন্থটি সেগুলি হইতে আর-এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতা, তথ্য ও তত্ত্বের সাবলীল বিধান, এবং উপস্থাপনা সম্পর্কেও সে কথা বলিতে পারিলে আমরা আরও খুশী হইতাম।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা ২৷৷০ টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ তোতার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি ৭৲ টাকা। পৃষ্ঠা পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ তোতার লেন, পোঃ মাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম-এ, প্রণীত

অনাথগোপাল সেন স্মৃতি সমিতি হইতে প্রকাশিত

মূল্য ৯৸০

প্রাপ্তিস্থান : ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯

পুরাতন শিক্ষার কয়েক খণ্ড বাঁধানো আছে

প্রয়োজন থাকিলে অনুসন্ধান করুন

১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯

শ্রীঅজিতকুমার বসু কর্তৃক শক্তি প্রেস, ২৭।৩ বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীঅনাথগোপাল সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও কার্যালয় : ১ ডোভার লেন কলিকাতা ২৯

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

৯ম বর্ষ | কার্ত্তিক ১৩৫৮ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনা

ইংরাজি শিক্ষার ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত মাধব মেনন বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ যে, ভবিষ্যতে ইংরাজির পঠন পাঠন লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। "লোকে হয়তো মাতৃভাষা বা হিন্দীর প্রতি অনুরাগের জন্য ইংরাজির নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে বিশ্বে আদান প্রদানের ভাষা হইল ইংরাজি।"

"রাজনীতিক্ষেত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের দেশে যত বেশী জন ইংরাজি শিখিতে পারে তত বেশী জনের ইংরাজি শিখাইবার ব্যবস্থা থাকা উচিত; অতীতের সংস্কার যেন আমাদের এবিষয়ে বাধাস্বরূপ হইয়া না দাঁড়ায়।"

ইংরাজি-শিক্ষকদের পুনরালোচনার (refresher course) পাঠব্যবস্থার উদ্বোধন করিতে গিয়া শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এইরূপ বলিয়াছেন। ইংরাজি শিখিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা কোনদিনই অস্বীকার করি নাই। কিন্তু তাহা সার্বজনিক বা বাধ্যতামূলক বা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের যৌক্তিকতাও আমরা কোনও দিন স্বীকার করিতে পারি নাই, মাননীয় শ্রীযুক্ত মেননের কথাতেও না। সম্প্রতি ডক্টর অনরনাথ ঝাও এই মর্মে বলিয়াছেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরাজিকে শিক্ষার মাধ্যম করিবার পক্ষপাতী নন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাপ্রসঙ্গ

ভারতীয় পার্লামেন্টের গত অধিবেশনে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লইয়া যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে মাদ্রাজের সভ্য শ্রীমতী দুর্গাবাঈ যে মন্তব্য করেন তাহা শিক্ষানুরাগী মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করিবে। পণ্ডিত নেহেরুর পরিকল্পনা-প্রণতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইহাতে শিক্ষার জন্য তেমন কোনও বিশিষ্ট ব্যবস্থা নাই, কিন্তু অর্থাভাবে কি আর কোনও কারণেই শিক্ষায় অগ্রগতি রুদ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন যে লোকে বিদ্যালয় চায় আবার river-valley পরিকল্পনাও চায়; কিন্তু সকলকে তো আর খুশি করা যায় না। শ্রীমতী দুর্গাবাঈ বলেন, river-valley পরিকল্পনা বাদ দিয়াও শিক্ষার জন্য যথেষ্ট টাকা ব্যয়

করা যাইতে পারে। আমাদের টাকার অনেক অপব্যয় হইতেছে; এই অপচয় বন্ধ করিয়া দিলে এদেশের কিশোরদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অর্থের অভাব নিশ্চয় হইবে না।

এ সম্পর্কে সম্প্রতি ২০ অক্টোবরের হরিজন পত্রিকায় বিনোবা ভাবের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। "বুনিয়াদী পদ্ধতি উত্তম, কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে না। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি অপেক্ষা ইহাতে ব্যয় অধিক কি কম তাহা দেখাইতে হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় ছাত্রের মনে গোড়া হইতেই এক সুসংহত ঐক্য ভাবের পরিশোধন হয়; যাহার ফলে শুরুতে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্বাবলম্বী না হইলেও শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র স্বাবলম্বী নয়, পরন্তু ইহা শ্রেষ্ঠ প্রণালী বলিয়া পরিগণিত হইবে। ব্যয়ের হিসাবেই ইহার পরিকল্পনা সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে দুই একর জমি থাকিবে। ছাত্রগণ ইহাতে শাক, তরকারী ও কার্পাসের চাষ করিবে। এই জমি হইতেই শিক্ষক নিজের প্রয়োজনের সব্জী ও কার্পাস পাইতে পারিবেন।"

'শিক্ষার চর্চা'

সম্প্রতি আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্রের প্রচার বিভাগ হইতে এক সাময়িকী বাহির হইতেছে। ইহার প্রথম সংখ্যায় 'শিক্ষার চর্চা' দেখানো হইয়াছে। আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্র যে শিক্ষা-ব্যাপারে সজাগ, তাহার পরিচয় এই পুস্তিকায় পাই। পুস্তিকা-সংযুক্ত সুমুদ্রিত সুশোভিত পুস্তিকা হাতে লইয়া বিস্মিত হইতে হয়। কর্মে রূপে বর্ণনায় সমুজ্জ্বল এই ৭২ পৃষ্ঠা (বৃহদাকারের, 'কোলিও' পরিমাপের)-ব্যাপ্ত বস্তুটির মূল্য মাত্র আট আনা! ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল! যদি বলি, 'প্রত্যেক শিক্ষালয়ে ইহার এক এক খণ্ড থাকা উচিত', তাহা হইলে কিছু অসঙ্গত কথা বলা হয় না। রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা, শিশুর চারুকলা শিক্ষা, শিক্ষায় নৃত্যের স্থান, অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও শিক্ষালয়ের সম্পর্ক, নাগরিকতা শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য-শিক্ষা—বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত চিত্রে লেখাগুলির ঐশ্বর্য বাড়িয়াছে।

অথচ এই সংযুক্ত রাষ্ট্র কত দিনেরই বা সৃষ্টি! এব্রাহাম লিঙ্কনের সময় হইতে ধরিলে এখনও তো শতাব্দী পূর্ণ হয় নাই। আর আমাদের বিপুল দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য—শিক্ষার গভীর অন্তর্দৃষ্টি—বহুযুগের চিন্তাধারার ঋজুতা ও স্বাধীনতা, কত কথা আমাদের বলিবার আছে! ভারত সরকার হইতে অনুরূপ পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে আমাদের কতখানি গৌরব বোধ হইত, পুস্তিকাখানি হাতে লইয়া তাহাই ভাবিতেছি।

ছাত্রজীবন ও পরিশ্রমের কাজ

'দেরাদুনে একটি 'পাবলিক স্কুল' আছে, তাহা 'শিক্ষা'র পাঠকেরা অবশ্যই জানেন। সম্প্রতি সেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া সুর চিন্তাঘন দেশমুখ বলিয়াছেন—"জাতি হিসাবে আমরা যতটা উচিত ততটা কঠোর শ্রম করি না। বয়স যখন কাঁচা তখন হইতে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া ও ত্রুটি সংশোধন করার দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর। শিক্ষকই তো শিশুর মনে সর্বপ্রথম ভাল-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত, ওচিত্যবোধের ধারণা জন্মাইয়া দেন।" দিল্লীর ছাত্রসঙ্ঘের উদ্বোধন করিতে গিয়া একজন প্রবীণ শিক্ষাকর্মীও সেদিন বলিয়াছিলেন, "দেশে শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা যত কম, সেই অনুপাতে গঠনমূলক কর্মের দ্বারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার দায়িত্ব তাহাদের তত বেশী।" সুতরাং একদিকে যেমন কঠোর শ্রমে অভ্যস্ত হওয়া চাই, অন্যদিকে আবার সেই শ্রমের অভ্যাস গঠনমূলক কর্মে প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

আগে শিক্ষাধাম, পরে বিদ্যালয় চালনা

গত ২২ শে অক্টোবর বোম্বাইয়ে আড়াইশত প্রবীণ শিক্ষকের সম্মুখে ডক্টর অমরনাথ ঝা যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশের সমস্ত প্রধান-শিক্ষকের প্রণিধানযোগ্য। উপলক্ষ্য ছিল বোম্বাই রাষ্ট্রের প্রধান-শিক্ষকদের সম্মেলন। আজকাল ছাত্রদের মধ্যে যে অসংযমের পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, ডক্টর ঝার মতে তাহার কারণ হইল এই যে, শিক্ষক, বা প্রধান-শিক্ষক, জোর করিয়া কোনও কিছু বলিতে পারেন না। আমাদের যুগের লোকেরা শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, ইহাই হইল সবচেয়ে দুঃখের কথা। আমাদের না আছে দেশের গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা, না আছে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা, না আছে মেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা। সুতরাং সেই শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাহার জন্য প্রয়োজন, পরিচালন বা তত্ত্বাবধানের অপেক্ষা প্রধান-শিক্ষকদের শিক্ষাদানে বেশি সময় দিতে হইবে।

পরলোকে মিঃ মাথুর

দিল্লী রাষ্ট্রের শিক্ষাধিকর্তা শ্রীমাথুর গত আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহে এক দিন মাত্র ভুগিয়া পরলোকে গমন করেন। তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষকতার কাল ছিল প্রায় ২০ বৎসর। তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে মৃত্যু ছেদ টানিয়া করিল। ইহাতে শিক্ষাজগতের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিবার নয়।

ডক্টর তারাচাঁদ

ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের কর্মসচিব ডক্টর তারাচাঁদ ভারত সরকারের দূত হইয়া পারস্যে যাইতেছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ডক্টর তারাচাঁদের জন্ম ১৮৮৮ খ্রীঃ, সুতরাং এখন তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর। তিনি প্রথমে এলাহাবাদ ক্যানিং কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন ও পরে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হন। হিন্দী, উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইসলামের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার একখানি গবেষণাপূর্ণ পুস্তক আছে। আশা করা যায়, ডক্টর তারাচাঁদ শিক্ষক হিসাবে যে সুনাম অর্জন করিয়াছেন, ভারতীয় দৌত্যকর্মে তাহা উজ্জ্বলতর হইবে।

বিজয়া

শিক্ষার পাঠক পাঠিকা সকলকে আমাদের বিজয়ার সম্ভাষণ জানাই। বাঙালীর পক্ষে বিজয়া জাতীয় বার্ষিক উৎসব, নব বর্ষের অপেক্ষাও ইহার উৎসবের ব্যাপকতা ও গভীরতা বেশী। শিক্ষার জন্য হউক, শুধু 'শিক্ষা' পত্রিকার জন্যে—শিক্ষার অন্যেই মানব সভ্যতার ভবিষ্যতের আশা নিবদ্ধ রহিয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা

[শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়]

হাজার বছরের পরাধীনতার হাত থেকে আমরা কেবল এই মাত্র মুক্তি পেয়েছি। ইতিহাসের একটা ঘটনা হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইংরেজ চলে গেল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের এখনও ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। চোখে এখনও আমাদের ঘুমের ঘোর! আর একবার পাশ ফিরে শুতে পারলেই যেন ভাল হয়!

হাজার বছর ধরে তিল তিল করে আমাদের মনুষ্যত্ব উবে গেছে। আমরা অমানুষ হয়ে পড়েছি। হুকুমের তাঁবেদার হয়ে আমরা প্রাণস্পন্দনহীন যান্ত্রিক মানুষে পরিণত হয়েছি। প্রাণের উৎস আমাদের শুকিয়ে গেছে। এই হাজার বছর ধরে স্বাধীন মানুষের মত আমরা ভাবি নি, চিন্তা করি নি, কথা বলি নি, কাজ করি নি। আমরা কেবল বিদেশীর হুকুম তামিল করেছি, আর তাদোহারের জীবন যাপন করেছি। দেশের জন্য ভেবেছে, কর্ম-কল্পনা করেছে, পেটেছে, কাজ করিয়ে নিয়েছে বিদেশীরা। করেছে তাদের সুখের, আমাদের জন্যে করে নি। কিছু যাই করুক, করেছে তারাই, আমরা বিশেষ কিছুই করি নি। আমরা কেবল দিনমজুরি করেছি। আমরা কেবল চিনেছি কর্তাকে, গভর্মেণ্টকে। আমরা যে স্বাধীন ভাবে কিছু করতে পারি, বা এক দিন যে স্বাধীনভাবে আমাদের কাজ-কারবার করতে হবে, একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

পরদেশী রাজা দেশকে করেছে শোষণ। বেশি লোককে রেখেছে উপোসী আর নগ্ন করে, আর কিছু কিছু লোককে দিয়েছে একটু ভাল খাবার-দাবার। পেছনে মেরেছে গুঁতো, আর সামনে ধরেছে ছুটো তৈলমসৃণ শুষ্ক তৃণগুচ্ছ। আর দেশের শিল্প-বাণিজ্য, ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবই নষ্ট হয়ে গিয়ে কিছু কিছু লোকের পেট ভরে উঠেছে কতকগুলা বিলিতি বুলির কাগজে। তাদের পেট টিপলে ফিরে গদ্য গদ্য করে, কিন্তু এক রত্তি রস তা থেকে বেরোয় না। তাতে বিদ্যার দীপ্তি নাই, দাহ আছে; বিনয় নাই, আত্মম্ভরিতা আছে; স্বাধীন ভাবে কাজ করবার ক্ষমতা একটুও নাই।

তাই ছোট বড় সকল ব্যাপারে আমরা দেশশুদ্ধ লোক চেয়ে আছি গভর্মেণ্টের দিকে। ভাত নাই, কাপড় নাই। গভর্মেণ্ট দেয় না কেন? গভর্মেণ্ট কেন ইস্কুল করে দেয় না, কেন মাষ্টারদের মাইনে বাড়ায় না, কেন অফুরন্ত চাকরির সৃষ্টি তারা করে না? ত্যাগী পুরুষ ছিল সব কংগ্রেসের লোক, তারা কেন আমাদের হিতের জন্য কাজ করে যায় না? আমাদের হিতটা কি? অনেক চাকরি, কম কাজ, মোটা মাইনে, আর লম্বা ছুটি। এর সঙ্গে আছে কম পরিশ্রমে, অপরের তুলনায় নিজের বেশি সুখ-সুবিধা ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। দাসনির্মুক্ত ভোগের এই সকল সুবিধা, ব্যাপকভাবে দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া যদি সম্ভব হতো, তা হলে দেশের চেহারা কি রকম দাঁড়াত সে আলোচনা এখানে করার কথা নয়।

এখানে আমরা শুধু এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছি যে দেশশুদ্ধ লোকের চোখ নাই, কান নাই, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নাই। সকলেরই নজর পড়ে রয়েছে কেবল গভর্মেণ্টের উপরে, নিজের উপরে নয়। এ কথা আমাদের মনে পড়ছে না যে, এই গভর্মেণ্টের কাজ-কারবার যে-যন্ত্রটা দিয়ে চলছে সেটা বিদেশীরই কায়েম-করা যন্ত্র। বিদেশী

মানুষগুলো চলে গিয়েছে। রয়ে গিয়েছে নির্জীব প্রাণহীন কাঠামো ও আর কতগুলো হতোদ্যম নির্জীব বিদেশী-বুলি-কপচানো সাজানো পুতুল। তারও উপরে আমরা যাদের বসিয়েছি তারাও আমাদেরই মত দোষে-গুণে-জড়ানো লোক; সমাজের বিশেষ প্রয়োজনে, বিধাতার ভাবের বিধানে, এক মহাপুরোহিতের মহামন্ত্রের আবাহনে যজ্ঞকালের জন্য তাদের প্রাণের তন্ত্রী এক অপূর্ব উন্মাদনায় সপ্তগ্রামে বেজে উঠেছিল। সেই পরিপূর্ণ সপ্তস্বর আজ প্রশমিত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাদের ভিতর থেকে আমাদেরই মত কাদার তৈরি সাধারণ মানুষ আজ বেরিয়ে পড়েছে।

কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়েছি। এই সকল কথা পরস্পরের সঙ্গে এতই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত যে, একটার টান্ দিলে অপরগুলিও সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে। মূল বিষয় হল এই যে, নির্জীব হয়ে আমরা জড় হয়ে পড়েছি। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে, আমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে হবে এবং প্রাণের খেলার ও প্রকাশের যোগ্য ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সজীব ও প্রাণবান লোক হয়ে উঠি নাই। স্বাধীন হয়েছি মানে, সে দিকে কাজ করার বাধা আমাদের দূর হয়েছে। আমরা এখন আসল কাজ করার সুযোগ লাভ করেছি মাত্র।

সেই আসল কাজটা কি? গ্রন্থের লুপ্তপ্রায় প্রাণকে সঞ্জীবিত করা, প্রাণহীনের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করা। একমাত্র প্রাণ থেকেই প্রাণের সঞ্চার করতে পারা যায়, আলো থেকেই আলো ধরাতে হয়। কঠিন কাজ, কিন্তু তা ছাড়া সহজ আর কোন পথ নাই। কেমন করে সে কাজ করা যাবে?

আমাদের প্রাণশক্তি অবসাদের প্রায় শেষ-সীমায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু আমরা যত বড় একটা জাতি। নিঃশেষ হতে হতেও এখানে সেখানে একটু আধটু অবশেষ রয়ে গিয়েছে। শুষ্কিত ও স্তিমিতপ্রায় প্রাণশক্তি দু-চার দশ জন লোকের মধ্যে তখনের জড়তা কিছু কিছু কাটিয়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন করে এগুলিকে আহরণ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একে চকিয়ে দিতে হবে অপরের ভিতরে প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, ভবিষ্যতের মানুষকে সজীব করে গড়ে তোলবার জন্য।

এই উদ্বোধনই হল নূতন শিক্ষার কাজ। সে শিক্ষা হল মানুষ হওয়ার শিক্ষা। এই কাজেরই ভার আমাদের সকলকে আগে নিতে হবে।

ভাত কাপড় আমাদের নাই, একথা ঠিক। কিন্তু তার জন্য আমরা সকলে মিলে পথের দিকে চেয়ে থাকবো না, হাজার অসুবিধার মধ্যেও আমরা ভাত কাপড় উৎপাদন করে নেবো। আর সেই কাজ করতে করতে তার ভিতর দিয়ে, তাকে অবলম্বন করেই, আমরা লোককে মানুষ হতে শেখাবো, কাজের ভেতর দিয়ে তাকে নব রকমে শিক্ষিত করে তুলবো।

বিশেষজ্ঞের পরিভাষায় এই শিক্ষার যে নামই দেওয়া হোক না কেন, এ হল মানুষ হওয়ার শিক্ষা। আমাদের ভাষায় আমরা একে বলতে পারি, জাতীয় জীবনে নূতন প্রাণসঞ্চারের সাধনা।

পুঁথির শুকনো পাতার পরোক্ষ অভিজ্ঞতা নয়, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর হবে এই শিক্ষার ভিত্তি। জীবনের সমস্যা, কাজ, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতির সংস্কৃতি ও উৎসব, বাইরের আলো আর বাতাস, এই সকলের সংস্পর্শ ও ঘাতপ্রতিঘাতে, একদিকে যেমন তৈরি হবে নিজের দেহ, আর একদিকে তেমনই সজাগ ও বিকাশোন্মুখ হয়ে উঠবে তার বুদ্ধি ও মন। কাজ তার কাছে বয়ে আনবে নতুন সৃষ্টির উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দ। জীবন তাকে নিয়ে যাবে কাজে, কাজ নিয়ে যাবে তথ্যে, তথ্য জাগিয়ে তুলবে মনের মধ্যে তত্ত্ব, তত্ত্বের আলো ফিরে এসে তথ্যকে করে তুলবে নবীন ও সমৃদ্ধ,

এবং সেই উজ্জ্বল আলোর প্রয়োগে জীবন হবে উঠবে পরিপূর্ণ, বিচিত্র, বলিষ্ঠ ও সুন্দর।

এরই নাম হল বুনিয়াদী শিক্ষা। পুঁথিতে এর সুরু নয়। জীবনচর্চায় এর সুরু, সমস্তের জীবনে ও উজ্জ্বলতর উপলব্ধিতে এর শেষ। অপরের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এ শিক্ষায় তখনই নেওয়া হবে যখন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীরা তার সত্যাসত্য নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারবে। ["সাধারণী" হইতে।]

প্রধান শিক্ষক পার্শ্বনাথ

[শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়]

ইস্কুলের সমস্ত রকমের মর্যাদা নির্ভর করে তার প্রধান-শিক্ষকের উপর। এমনও দেখা গেছে, একটি প্রধান-শিক্ষকের চরিত্রকে অবলম্বন করেই ইস্কুলের জাতি নিরূপিত হয়ে যায়। পাবলিক স্কুলের জাতিতত্ত্বের মূলে প্রধান-শিক্ষকদের চরিত্র অনেকখানি রয়ে গেছে।

আমাদের দেশের শিক্ষকদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় নি। অবশ্য তা বলে এ নয় যে, শিক্ষকেরা সমাজে কোন স্থানে পান না। আমাদের দেশের ভোলা ময়রা প্রভৃতি শিক্ষককে নিয়ে নাটক উপন্যাস যথেষ্টই হয়ে থাকে। আদালতে ডুরীর বলে শিক্ষকদের স্থান আগে। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে শুনে এবং পড়ে, কেন জানি না, কেবলই মনে হয়, বাংলা দেশের পাঁতর-বের করা গোরুর চোখের ভাষা, যখন সে কম্প মাঠে দাঁড়িয়ে সুদূর শ্যামলিমার দিক চেয়ে অনাবশ্যক পুরোন খাবার চর্বিতচর্বণ করে চলে। বড় শান্ত, বড় নিরীহ, বড় নির্লিপ্ত। সাহিত্যিকেরা হয়ত উপমা প্রয়োগ করে বলবেন, হার্মোনিয়মের খীস্তধোক্তের যেমন 'পলেস্তারা' শিক্ষকের ব্যক্তিগত গৃহগত আচরণও তেমনি 'পলেস্তারা'র কাজ করে, চরিত্রকে সুরের মতোই নরম করে, মিষ্টি করে, মানবিক করে।

কিন্তু পলেস্তারা-বিহীন করে, শিক্ষকতার চড়া সুর নিয়েই আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। রামনাথের চরিত্রের যেটুকু আমরা পেয়েছি তাতে তিনি খুনো হয়েই থাকলেন। চরিত্র বিচারে কর্মীর চরিত্রের উৎকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের কাহিনী এখন খুনো মাত্র হয়েই দাঁড়ায়। অতএব সোনার-তরী যেন সোনার ধান টুকু নিয়েই ক্ষান্ত হয়, কবির সবটুকু জীবনকে নিয়ে নয়।

শিক্ষকতার চড়া সুর নিয়ে বিচার করতে বসে প্রথমেই আমার মনে পড়ে, উত্তরবঙ্গের সার্থকনামা প্রধান-শিক্ষক পার্শ্বনাথ সেনের কথা। প্রধান-শিক্ষককে সাধারণত ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-পরিদর্শক-কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে এমন ভাবে কাজ করতে হয় যে, তাঁর বায়ু-পিত্ত-কফ এবং শারীর উপাদান পঞ্চভূতের অস্তিত্ব অনেক সময় ভুলেই থাকতে হয়, পাঠ্যপুস্তক কিম্বা কলার উৎস স্বরূপ শিক্ষকসংঘ তৈরী করা বা টেস্ট-পেপার সম্পাদনা করার ধৈর্য বড় একটা আর অবশিষ্ট থাকে না। শহরের অধিকাংশ লোকই ইস্কুল পার্শ্বনাথ কি পার্শ্বনাথ ইস্কুল, একথা বিশ্লেষণ করতে ভুলেই গিয়েছিল।

ইস্কুলের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর ভালো ঘরই

ছিল শিক্ষক আর প্রধান শিক্ষকের। এটিকে প্রধান শিক্ষকের ঘর না বলে শিক্ষকদের মেলাঘরই (Common Room) বলা যায়। একটি সুবৃহৎ ঘূর্ণায়মান চেয়ারে পার্শ্বনাথ উপবিষ্ট থাকতেন।

ঐ চেয়ার আর ঘরটিই ছিল তাঁর কাজের বড় সহায়ক। ইস্কুলের আঙিনা থেকে আরম্ভ করে এই ঘরের শিক্ষকদের প্রত্যেককে সুবৃহৎ ক্যামেরার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের চোখে বুলিয়ে নিতে পারতেন। ক্লাস বসবার ঘণ্টা অবশ্য বাজত; কিন্তু তার চেয়ে আঙিনার দিকে পার্শ্বনাথের দৃষ্টি ফেরানো অধিকতর কার্যকর ছিল; ঘণ্টা না বাজালেও ছাত্রদের কাছে পার্শ্বনাথের চেয়ার-ঘুরে-যাওয়াটাই যেন ঘণ্টার কাজ দিত। ভগবান তাঁকে চোখ দিয়েছিলেন, আর চোখকে তিনি ইস্কুলের কাজে লাগিয়েছিলেন। সহকারী শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে ছাত্রেরা পর্যন্ত তাঁকে ভয় করতে অভ্যস্ত ছিল, তার প্রধান কারণ, নিয়মের তাঁর ব্যতিক্রম ছিল না, ইস্কুলের ঘড়িটি পর্যন্ত ঠিক মিনিটটি মেনে চলত। এপারোটা দশে কখনও এপারোটা বাজত না।

১৯৩০—৩১ সালের কথা বলছি। তখন ছাত্রদের উপর নির্ভর করত ইস্কুল চালানো। ছেলেদের মনের ধনুকে প্রকোপের ছিলা চড়েছে তখন টনটনে হয়ে। ধর্মঘট লেগেই আছে। ধর্মঘট তো নয়, সে যেন ভাদ্র মাসে নটচন্দ্রা করা। তখনও নির্ভীক ভাবে তিনি সাইকেলে চড়ে পাড়ার পাড়ার ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর ইস্কুলের ছাত্রেরা কেমন পড়াশুনা করছে তাই দেখতে।

মনে পড়ে আসাগুল্লা নিয়াজীকে একদিন তিনি বলেছিলেন,

ইস্কুলে স্ট্রাইক করছ, কর; কাজে স্ট্রাইক করছ আমি মানিনে। কিন্তু বাড়ীতেও ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়ে দেবে—দেশের পক্ষে এ ক্ষতি কতদূর তা একবার ভেবে দেখ।

শাস্তি যখন দিতেন তখন বেত নিয়েই দিতেন, অভিমানা করা বা সমঝিয়ে দেওয়া (warning) ইত্যাদির তেমন ধার ধারতেন না। কিন্তু বেত তার পিঠেই পড়ত যে তাঁর চোখকে ফাঁকি করতে ভুল করত। এই জন্যে শিক্ষকেরাও যতদূর সম্ভব ছাত্রদের দোষত্রুটি নিজেরাই সংশোধন করতে তৎপর হতেন। প্রধান শিক্ষকের কানে ছাত্রদের নামে কোন নালিশ জানাতে কেউ খুব ব্যগ্র ছিলেন না। পরীক্ষার ঘরে কিছু দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা, তা সে যত সামান্যই হোক, তাঁর কাছে বেত খাওয়ার একটা বড় অপরাধ ছিল। প্রথমে তিনি নির্মম কড়নামি ছিলেন মানিনে, কিন্তু নির্ভীক ছিলেন। ইস্কুলের সবচেয়ে পাজা ছেলেদেরই তিনি এমন অমোঘ নিয়মে শাস্তি দিতেন। ছোট, খাস্তু, রোগা, ভীরু এদের তিনি গায়ে হাত তুলতেন না। পর্বতে কথা আছে, পার্শ্বনাথে ছিল এই খানে মমতা। পড়াশুনা না পারলে মারপিট চলত না। কোনক্রমে এমনিতে কোন শিক্ষক বেত হাতে গেলে শিক্ষককে পার্শ্বনাথের কাছে নানা কৈফিয়ৎ দিতে হত।

চতুর্থ শ্রেণীতে একটি ছেলে নতুন ভর্তি হয়েছে। সহরে সবে এসেছে পাড়া গাঁ থেকে। আগেকার ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় একটা বৃত্তি পেয়েছিল। দরকার থেকে যেদিন ইস্কুলে তার টাকাটা পাঠিয়ে দিল পার্শ্বনাথ ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। তীরু ছেলেটা আকাশ পাতাল নানারকম ভাবতে ভাবতে কাছে গেল। কাছে ডেকে নিয়ে তিনি তার বৃত্তির কাগজটা খুলে টাকাটা বের করে গোনার ছলে তার মধ্যে থেকে একটি মিষ্টি হাসি নিয়ে সেই পড়ার বড় ছেলেদের সঙ্গে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। বাল্যবয়সে ছেলেদের মনে ঐ হাসি একবার আঁকা হয়ে গেলে আর কোনদিন তারা ভুল বুঝতে পারে না।

ছাত্রদের মানবার পক্ষে তাঁর ইস্কুলে আর

একটা বিষয় ছিল। নীচের ক্লাসের ছেলেরা উপরের ছেলেদের দাদা বলে ডাকবে। এ বিষয়ের অন্যথা হলেও বেত চলত।

ধুতি আর কোটই ছিল তাঁর সাধারণ পোষাক। ইস্কুলের কাজের সময়ের মধ্যে বারান্দা দিয়ে ঘরের মতো মাঝে মাঝে চলতেন। কাপড়-জামা কোথাও এতটুকু বাধা সৃষ্টি করেনি। বরং ঐ ধুতি জামার আবির্ভাব ক্লাসের নিদ্রাতুর শিক্ষক আর ছাত্রদের চকিত করে তুলবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল বলে মনে হয়। বারান্দা দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে চলতেন বটে, কিন্তু আড়ি পাততেন না; কখনও ক্লাসের দরজা বা জানালার কাছে দাঁড়াতেন না। তিনি লক্ষ্য রাখতেন একটু দূর থেকে। কাছে এসে চোখ ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু তিনি যখন ক্লাসের নিকট দিয়ে গেলেনই, তখনই বুঝতে হবে ক্লাসে কোন অনিয়ম তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এই জন্যই নিশ্চিন্ত অন্যমনস্ক হবার সুযোগও ক্লাসে ছিল না, কেন যেন কেবলি মনে হত ঐ বুঝি ধুতির খস্‌খস্‌ এদিকে এগিয়ে আসছে। পার্শ্বনাথ যেন বুকের মধ্যে গাঁথা হ'য়ে যেতেন।

সরস্বতী পুজোর দিন সকাল বেলা হঠাৎ পার্শ্বনাথ ইস্কুলে ছাত্রদের মধ্যে এসে কাঁচি নিয়ে বাগানের আদর-ফুল কাটতে বসলেন। দু-তিনটি বাগানের সবকটা কেটে কাঁচি ছেড়ে দিয়ে বললেন —কাটো।

অনুরোধের সঙ্গে হুকুম এমন জড়াজড়ি করে হুমড়ি খেয়ে মনের উপর আছড়ে পড়ে গেল যে সামনের ছেলেটি যন্ত্রচালিতের মতো হাতে কাঁচি তুলে নিল-ই। ভুল করলে তিরস্কার নেই, ভুল হলে প্রশংসা নেই। পর্বতের গায়ে গাছের ফুল কেমন ফুটছে, পর্বত সে সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু পর্বতের গাছ বন্ধ্যা হয় না; পার্শ্বনাথের দেখিয়ে দেওয়ার পর কেউ আর ভুল করে না। কোন্ ছেলেকে কতটুকু কেমনভাবে বোঝাতে হবে এ তাঁর একেবারে হিসাবের মধ্যে ছিল।

তাঁর পাঠনা ভালো ছেলেদের জন্যে ছিল না। পড়াশুনায় পিছিয়ে থাকা ছেলেদেরই তাঁর ছিল সহরের এই ইস্কুলটাতে। দশম শ্রেণীতে পড়াতে এসে বললেন,

ভালো ছেলেরা আমাকে কিছু ক্লাসে জিগগেস করবে না। তারা মাথাও নাড়িও না। বলেই ক্লাসে আমি সাতের ক্লাস খুলনাম।

একবার তিনি এক অদ্ভুত ব্যবস্থা করলেন। পাড়ায় পাড়ায় তাঁর ইস্কুলের ছাত্রদের জন্যে একটা করে কেন্দ্র করলেন। কতগুলি বাছা বাছা ছাত্র একত্র হত সপ্তাহে দু দিন। সেই পাড়ার এক শিক্ষককে ভার দিতেন ঐ দুদিন তাদের তত্ত্বাবধান করবার। আর্থিক দায়ভার সমাধান তিনি শিক্ষকদের কিছু করতেন কি না জানিনে, তবে তাঁদের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন অভিযোগ শুনিনি। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যে ছেলেরা ক্লাসে প্রথম হত তাদের যেতে হত পার্শ্বনাথের কাছে।

সহকারী শিক্ষকদের উপর আস্থা ছিল তাঁর পূর্ণমাত্রায়। কোন শিক্ষক সম্বন্ধে কেউ কোন দিন অভিযোগ করে তাঁর কাছে সুবিধা করতে পারে নি। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও নয়। বৃদ্ধ অভিযুক্ত শিক্ষককে যখন কর্তৃপক্ষীয়েরা বলতেন অকেজো, পার্শ্বনাথ তখন তাঁকে আরও আঁকড়িয়ে ধরতেন।

কিন্তু শিক্ষকদের কাজে ব্যক্তিগত পরিবর্তন ছিল তাঁর কঠিন রকমের। পণ্ডিত মশায়ের প্রথম কর্তব্য আছে সপ্তম শ্রেণীতে সংস্কৃত পড়ানো। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন। হঠাৎ তাঁর কাছে খবর গেল, ও ক্লাস তাকে আর আর নিতে হবে না। সাময়িক স্বস্তি পেলেন। কিন্তু যেইমাত্র দেখলেন পার্শ্বনাথ বেরিয়ে যাচ্ছেন ক্লাসের দিকে,

তখন তিনি ইষ্টনাম জপ করতে ঐকান্তিক মনোযোগ দিয়েছেন। ক্লাসে গিয়ে পড়া, খাতের লেখা, সন্ধি সমাস প্রভৃতি ব্যাকরণের নিয়ম যা কিছু একবারে হয়েছে তার ঠিক ঠিক হিসাব মনে মনে ছকে নিলেন। যে সংস্কৃত অঙ্ক পড়তে পারল না তাকে হুহুম করলেন, সংস্কৃত খাতের লেখা খাতা—যাতে এতদিন সে লিখেছে তা—তারপর দিন তাঁর কাছে হাজির করতে।

কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে বাড়তি ক্লাস যা কিছু তা অধিকাংশ তিনি, আর সহকারী প্রধান শিক্ষকই নেটে নিতেন। শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে ক্লাসের শেষ ঘণ্টার জন্য কোন বাড়তি ক্লাস উপস্থিত শিক্ষকের ঘাড়ে পড়ত না। তখন ক্লাসের ছুটি হয়ে যেত। ছুটি-ছাটা বিষয়ে তিনি বছরের প্রথম দিনে কথা হিসাবই ছেনে চলতেন। ও বিষয়ে খুব ব্যতিক্রম ছিল না।

ছেলেদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিতেন। কিন্তু সাপ্তাহিক বা ত্রৈমাসিক পরীক্ষাকে তিনি আমল দিতেন না। তিনি বার্ষিক আর ষাণ্মাসিক পরীক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সাপ্তাহিক পরীক্ষাকে তিনি বলতেন 'অনিয়মের আনন্দ', আর ত্রৈমাসিককে বলতেন 'অনিয়মের নিয়ম', মাসিক পরীক্ষা মাসের শেষে তিন দিন ধরে চলত। ইংরেজি বাংলা অঙ্ক সংস্কৃত পার্সী অবশ্যই; আর ভূগোল ইতিহাসকে আনত মাস হিসাবে। নবম দশম শ্রেণীর ঐচ্ছিক বিষয়ও ঐ নিয়মে।

মাসিক পরীক্ষায় তিনি পরীক্ষক থাকতেন না। কিন্তু কি মার্কেই দেখা যেত, হঠাৎ শেষ সময়ে তিনি ডাক দিয়ে বসলেন। হয়তো পঞ্চম আর নবম শ্রেণীর ইংরেজি অঙ্ক দেখতে বসে গেছেন। ঐ বিষয়ের পরীক্ষকদের এক দিক দিয়ে পোয়া-বারো বটে, কিন্তু যতদিন তাঁর খাতা দেখা শেষ না হচ্ছে, ততদিন তাঁরা নির্ভাবনায়ও নেই।

বক্রিম সিংহাসন সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই জানি, কিন্তু ক্লাসে এসে পার্থনাথ পড়াতে যখন বসতেন তখন ঐ চেয়ারও তাঁর পক্ষে বক্রিম সিংহাসন হয়ে বসত। ক্লাসের চেয়ার তাঁকে মুখর করত। তিনি যে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে পারেন, তিনি যে অনেক ছেলেরই বাড়ীর খবর আর পরিবেশ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তা একমাত্র ক্লাসের চেয়ারে বসলেই টের পাওয়া যেত। এমনিতে হাসি নেই, কিন্তু পড়ানোর সময় কথার তাঁদের মধ্যকার অন্তর্নিহিত হাসি মনে সাহস এনে দিত। সর্বক্ষণ মুখের চেহারা গুরু, কিন্তু ক্লাসে ঢুকলে তিনি অন্য মানুষ। এমনিতে দশহাত দূরে চলতে হয়, কিন্তু ক্লাসে পড়াতে এসে হঠাৎ ডেকে বললেন,—শ্যামলকান্তি এস।

শ্যামলকান্তির ত্রস্তপদে আগমন। হঠাৎ তার জামাটা টেনে বললেন—এটি এল কেন? জামাটাকে তো ডাকি নি। এখানে দাঁড়িয়ে ভাব, জামাটা বেকে ছেড়ে আসতে তিন।

ক্লাস হেসে অস্থির। যিনি এল, যখন তার সেই ঘরে 'বিশেষণ' বোঝাতে লাগলেন, কি ব্যাকরণ-বিশ্লেষণ পড়াতে বসলেন। তাঁর প্রশ্ন করার ভঙ্গী ছিল গল্প বলার ভঙ্গী মতো। ছেলেকে প্রশ্ন করছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেকক্ষণ ধরে তিনি গল্প করে যাচ্ছেন।

কিন্তু বাক্যের ভিতর গতি আর বিচিত্র বিন্যাসের ইঙ্গিত এবং কথায় আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের শব্দ শুধু নবম শ্রেণীতেই করতেন। শ্রেণী ভেদে তাঁর কথার 'বলনে'র তারতম্য ঘটত। ব্যবহারের পরিবর্তন তিনি দক্ষ অভিনেতার মতোই করতে পারতেন।

তাঁর ইস্কুলের শিক্ষকদের মর্যাদা রাখবার দায়িত্ব তাঁর ছিল অপরিসীম। কেদার বন্দ্যোর 'নীলাম্বরের ঘড়ো'র মতো বিভাগীয় পরিদর্শক নবম শ্রেণীতে ঢুকে অঙ্ক শিখা দানের, অন্যের শিক্ষকের পদ্ধতি নিয়ে গালাগালিসূচক আলোচনা করছেন,

হঠাৎ কালো-পাগড়ী কালো-আচকান-পরা উত্তেজিত পার্শ্বনাথ পট পট করে ঢুকে হাওসাইটে পরিদর্শককে বললেন,

আপনি বাইরে আসুন। মাষ্টার মশাইকে যা বলবার লাইব্রেরী ঘরে বলবেন।

পরিদর্শক সমলঘলে গুরুতর পদবিক্ষেপে বেরিয়ে এলেন।

পার্শ্বনাথের স্বভাবটিই ছিল কতগুলো অভ্যাস-মূলক কাজের সমষ্টি। ঠিক সময়টিতে ঠিক নিয়মটি ঘটে যাবেই। শিক্ষকের যেখানে গাফিলতি, ছাত্রের যেখানে ফাঁকি, অভিভাবকের যেখানে অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের যেখানে অন্যায় ষড়যন্ত্র, সেখানে অনিবার্য নিয়মে পার্শ্বনাথের উপস্থিতি ঘটে যেত। ঘড়ির মতো তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গী, কিন্তু তীক্ষ্ণ তরবারির মতো তাঁর ছিল চক্ষু। তাঁর চোখের সামনে কেউ ফাঁকি দিতে পারত না। তিনি ছিলেন চড়াসুরেরই শিক্ষক। আর তাই সহরের বড় বড় বুড়ো বুড়ো কেল-করা ছেলেরা ঐ ইস্কুলে এসে ঢুকত। তাঁর ইস্কুল থেকে প্রতি বছর ভালো ফল দেখাতে না পারলেও প্রতি বছরই বেশী সংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হত। ঐ ইস্কুলের শিক্ষকদের অর্থ হয়তো ছিল না, কিন্তু সম্মান ছিল প্রচুর। শিক্ষকদের মধ্যে কোনরূপ দলের আবির্ভাব হয় নি; একযোগে কাজ করবার প্রেরণায় উৎসই ছিলেন পার্শ্বনাথ। আজও প্রধান-শিক্ষকের কথা উঠলেই সেই স্থির অথচ চঞ্চল, নির্বাক কিন্তু সবাক্-দৃষ্টি নিক্ষেপের, সেই নিয়মের ইস্পাত প্রখর-ব্যক্তিত্ব-পরায়ণ পার্শ্বনাথকেই মনে পড়ে।

—

শিশুশিক্ষায় নৃত্য, ছন্দে ও শব্দে

[শ্রীকেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

দোলনার শুয়ে ছেলেটি মুখে আঙুল ঢুকিয়ে শব্দ করে চলেছে বা···বা···বা·· বা··, মা···মা··· মা···মা···, বা···বা·· বা···বা। মার বুকখানা গর্বে ফুলে ওঠে—ভাবেন, "ছেলে আমার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট না হয়ে যায় না। বাছা আমার এই বয়সেই 'বাবা' 'মা' 'দাদা' সব কিছুই শিখে ফেলে দিয়েছে।" অবশ্য এ ছেলের পক্ষে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। কারণ বর্তমান শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট সন্তানের অতীতে দোলনার শুয়ে অনুরূপ শব্দ করেছেন। তবে শিশুর এই বিশেষ মনোযোগ অনাগত জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট জীবনের প্রস্তুতি নয়। এই প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে শিশুর আবিষ্কারের উন্মাদনা।

শিশুর দোলনার আশে পাশে, পারিপার্শ্বিকে শিশু শুনে চলেছে বহুরকম শব্দ। মা ডাকে, বাবা কথা কয়, ওরা খাটে বসে গল্প করে, বৃষ্টির টুপ্‌টাপ্, ঘড়ির টিক্‌টিক্, পাশের ঘরে হারমোনিয়ামের সা-রে-গা-মা, বারান্দায় মুচিরির ভাল সন্তায়ের হাঁক ···—কত রহমের শব্দ শিশুর দোলনার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল, তার কণ্ঠেও অনুরূপ দু একটা শব্দ আছে। কেবল শব্দ আবিষ্কার করেই সে ক্ষান্ত নয়—শব্দের ভেতর সে খুঁজে পায় ছন্দের রেখা। সমস্তকে সে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে নিল—তালে তালে শব্দ বেরিয়ে আসে বা···বা···বা···বা·· মা···মা·· মা···মা, বা···বা ···বা·· বা। জীবনে এই প্রথম বার ছন্দোবদ্ধ শব্দের আবৃত্তি।

তারপর একদিন হাটি হাটি পা পা করে দোলনা ছেড়ে শিশু এগিয়ে এল দোরের চৌকাঠের দিকে। হাঁটবার হুকুমটি যতদিন হুকুম হল না, ততদিন সে যেন আহাড়ের পর আহাড়। বারে বারে হয় হুকুম-নস্তর। তারপর একদিন হাঁটবার হুকুমটি আদায় করল সে। তার গতি হল সাবলীল, তরী হল বলিষ্ঠ, উদ্দেশ্যমূলক।

ঘরের বাইরে এসে কর্মচঞ্চল শিশু নিজেকে কর্মে ঢেলে দিয়েছে। অক্লান্তভাবে হামাগুড়ি দিয়ে সেবেক ঠুকে চলেছে ঠক্...ঠক্...ঠক্ ..ঠক। যেমনি কেনা নতুন ঘুমঘুমিটা বাজিয়ে চলেছে ঘুম...ঘুম, ঘুম... ঘুম। সস্ত কেনা ঢোলকটি নির্মমভাবে পিটিয়ে চলেছে, তাকাধুমা তাকাধুমা—যার ফলে বয়স্কদের কর্মাভিত্ত শান্তিকামী পোষা-কুল উদ্বাস্তু হতে চলেছে। হুপুর বেলা চারের কোনের পালি ঘরের ট্যাকটারের উপর নির্মমভাবে নুয়া করে, দুমদাম ধম ধম শব্দে বৃদ্ধদের বিশ্রামের সুখকর বিশেষ কাটির বাদশ ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। শিশু এমনি আবিষ্কারের ঝোঁকে চলেছে নতুন নতুন শব্দ ও ছন্দ। বিভিন্ন মাধ্যমে চলেছে তার পরীক্ষা।

তারপর একদিন সে চাপল ট্রেনে। চোখে ছবির পর ছবি ভেসে চলেছে—ছুটে চলেছে তাল, তমাল, শিমুল, সেগুন—টেলিগ্রাফের পোষ্ট। গাড়ী চলেছে নাচতে নাচতে—ঝক্‌র ঝক্ ঝক্, ঝক্‌র ঝক্ ঝক্। ম্যাচাং করে শব্দ করে গাড়ী লাইন বদল করল—তারপর সুরু হল ঘুনকি তাল—ঝিকি ঝিকি ঝিকি। একটা পুল পার হয়ে এল গাড়ী—ঝগাংঘাং ঘাং ঝগাং ঘাং ঘাং। তারপর আবার সুরু হয় একটানা ঝিকি মিকি ঝিকি মিকি।

আমাদের প্রাত্যহিক জগতে এমনিতর বহু শব্দের উথান পতন চলছে নিরন্তর। পাতার মর্মর, বাতাসের সন্ সন্, বৃষ্টির ঝম্ ঝম্, নদী কুলুকুল ধ্বনিতো কবির কাল্পনিক সৃষ্টি নয়। এমন কি উন্মুক্ত প্রান্তরের একটা গোঁ গোঁ ধ্বনি রয়েছে, যেমন রয়েছে নিস্তব্ধ নিশীথের শব্দহীন ঝিম্ ঝিম্ রব। প্রকৃতির এই ছন্দোবদ্ধ শব্দগুলি শিশুর মনে জাগায় বিস্ময়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন যায় অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে, জীবনের গতি যতই কেন্দ্রীভূত হয়, ততই আমরা নিরর্থক শব্দগুলির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ি। জগতের অনেক শব্দই আমরা আমাদের চিত্তের দিকে মরমে পশিতে দিই না। দু একটা—যা নেহাৎ অবাধ্য ভাবে ঢুকে পড়ে, তা আমাদের 'মরমে' জাগায় বিরক্তি। শিশুর কাছে এই সব অর্থহীন শব্দ মোটেই অর্থহীন নয়। তাই শিশু আবৃত্তি করে চলে নিরর্থক ছড়া :—

ম্যাচাং ঘাঁচা ম্যাচাং ঘাঁচা
গাং বাঘুকে কলছে ভাগ।
ছানাতলায় হাটিম্ টিম্
পুকুর পারে ঘোড়ার ডিম।

বয়স্কদের নিকট ছড়াটি যতই নিরর্থক বিরক্তিকর হোক না কেন, শিশুর নিকট এর প্রত্যেকটি শব্দ অর্থদ্যোতক।

শিশুর মনোজগতে অর্থহীন শব্দের সংখ্যা বয়স্কদের তুলনায় বেশী, এবং ছন্দের প্রভাবও খুব ব্যাপক। ছন্দ এবং ছন্দোবদ্ধ শব্দের প্রতি, শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে নজর দিয়ে শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই পদ্যনৃত্য, ছন্দনৃত্য আজকের নয়া শিক্ষার পাঠ্যতালিকায় কেবল মাত্র বিষয় নয়; ইহা শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নৃত্যের তাৎপর্য এই যে নৃত্যের মাধ্যমে কেবলমাত্র মানব মনের সুপ্ত অনুভূতিগুলিই প্রকাশ পায় না; অধিকন্তু নির্ভানি মনের অবদমিত সংঘাত প্রবৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশ লাভ করে মনে সাম্য ও শান্তি স্থাপন করে। মানব মনের অসামাজিক বৃত্তিগুলির 'সমাজীকরণ' ও 'রূপান্তরিতকরণ' সম্ভব হয়। সুতরাং নৃত্য কেবলমাত্র শিশুশিক্ষায় সীমাবদ্ধ রইবে না। বয়স্ক শিক্ষায় এবং সমাজ শিক্ষায়ও নৃত্যের স্থান খুব ব্যাপক।

শিশুশিক্ষায় বিভিন্ন বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে নৃত্যকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা —শব্দনৃত্য বা ছন্দনৃত্য, লোকনৃত্য, ভাবধীন বা প্রাচ্য নৃত্য। শব্দ নৃত্য কথাটা নতুন হলেও অর্থ সহজ। শব্দ নৃত্য হচ্ছে প্রকৃতির বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ শব্দ অনুকরণ করে তালে তালে কোন বিশিষ্ট ভঙ্গী করা, যেমন ঝিক্ ঝিক্ করে ট্রেন চালান, হাই হাঁ করে গাড়ী টানা, হুম্ হুম্ করে যন্ত্রের আগমন, ইত্যাদি। শব্দ নৃত্যের সুবিধা এই যে, এখানে কোন বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের আবশ্যক নেই। যে বা যারা নৃত্য করবে এবং যারা আবহ সঙ্গীত পরিচালনা করবে, এই উভয় দলই বিভিন্ন প্রাকৃতিক অর্থহীন শব্দের অনুকরণে করে ছন্দ রেখে যাবে। ৪—৭ বছর শিশুদের পক্ষে এই নৃত্য খুবই উপযোগী, কেন না ইহা ঐ বয়সের শিশুদের মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শব্দ নৃত্য সম্বন্ধেই বলা চলে যে বিভিন্ন প্রকার নৃত্যের শিক্ষামূলক দিক খুবই ব্যাপক হয়, যদি নৃত্যকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করে মানব-মনের বিভিন্ন অনুভূতি, প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় এবং সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি প্রকাশ করা যায়। শব্দ-নৃত্যকেও অনুরূপ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

৪—৭ বৎসর বয়স্ক শিশুদের নৃত্য পরিকল্পনায় অর্থহীন ছন্দোবদ্ধ শব্দের যে বিশেষ স্থান থাকবে সে কথা বলাই বাহুল্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি করে অর্থহীন শব্দ এবং ছন্দকে নৃত্যে রূপান্তরিত করে শিক্ষামূলক এবং শিশুমনোগ্রাহ্য করে তোলা যায়। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার—(১) শব্দচয়ন, (২) নৃত্য পরিকল্পনা, (৩) গতিভঙ্গী, (৪) আবহ সঙ্গীত, (৫) পোষাক পরিচ্ছদ।

(১) শব্দচয়ন :—পূর্বোক্ত আগন্তুক বহু শব্দের ধ্বনি ভাষার বর্ণমালায় প্রকাশ করা যায় না, এমনকি বহু শব্দ মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিতও হয় না। তবে একথা ঠিক যে, চেষ্টা করলে শিক্ষক কিছু কিছু শব্দ নিজের কণ্ঠে আয়ত্ত করে নিতে পারেন। উদ্দেশ্য, শব্দের সঠিক রূপটি শিশুর সামনে উপস্থিত করা—যেমন মোটরের হর্ণ, ট্রেনের হুস্, শিয়ারে ফুঁ বা উড়োজাহাজে ভোঁ ইত্যাদি। শিক্ষকের কণ্ঠ থেকে কোন শব্দের বিশেষ ধ্বনিটি শুনতে পেলে শিশু আগ্রহের সঙ্গে তা অনুকরণ করে। সঙ্গে যদি বিশেষ ভঙ্গীটি দেখান হয়, তবে শিশুর মন খুশীতে ভরে ওঠে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই শব্দচয়ন সম্ভব; যথা :—

(ক) জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা থেকে :—কামারের লোহাপেটার শব্দ, ছুতোরের কাঠচাঁচার, নৌকার পাড়টানার কলাকল বা জালটানার ক্যাবর কোঁহেত, হাপরের শব্দ, চেঁকির শব্দ, তাঁতীর তাঁত চালান ইত্যাদি।

(খ) প্রকৃতি থেকে :—ঝড়, বাতাস, বৃষ্টি, বাঘ ইত্যাদি।

(গ) বিভিন্ন বস্তু থেকে :—কাঠের ঠক্ ঠক্, লোহার ঠং ঠাং, টিনের চট্ চট্ ইত্যাদি।

(ঘ) পশুপাখীর ডাক থেকে :—ইহা একটি অফুরন্ত শব্দ ভাণ্ডার।

(ঙ) ভূত প্রেতের কাল্পনিক শব্দ :—হা হি হি হি। হি হি হি, হা রে রে রে রে রে রে রে, বা, ম্যাঁ ও ও ও, ইথা···। ইত্যাদি।

(২) নৃত্য পরিকল্পনা :—নৃত্য পরিকল্পনা করবে কে—শিশু না শিক্ষক? শিশুশিক্ষার প্রাচীন পন্থী-দের মত—The children should be seen not heard. সুতরাং শিশু কেবল মাত্র অনুকরণ করবে; আমরা করব, আমরা দেখব, আমরা শুনব, আমরা তারিফ করব। শিশুর ব্যক্তিগত মতামত চাওয়া-না-চাওয়ার প্রশ্নই উঠবে না। এই মতের পরিপন্থীরা শিশুকে দিতে চান আত্মার স্বাধীনতা।

নৃত্য মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ। তাই কোনরূপ বাধ্য বাধকতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকলে এই প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং

নৃত্যকে শিক্ষামূলক করতে চলে শিশুর স্বাধীনতাকে স্থান দিতে হবে সর্বাগ্রে। শিশুর মতামত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোন মতেই অবহেলা করলে চলবে না। তবে অনেক সময় নিজের স্বার্থের সম্বন্ধে শিশুর স্পষ্ট ধারণা থাকে না। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্য এগিয়ে আসবে নিশ্চয়ই। যেমন শিশু চাইছে, ভূতের নাচ নাচতে। এক্ষেত্রে শিক্ষক ভূতের বিভিন্ন বিকৃত স্বর এবং ভঙ্গী শিশুর সামনে উপস্থাপিত করবেন। ভূত সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার নিয়ে একটি পরিকল্পনা পূর্বাহ্নে তৈরী করে মনে এঁটে রাখতে হবে। ভূত কন্যার বিয়ে সম্বন্ধে একটি গল্পও তিনি ফেঁদে বসতে পারেন, যথা :—ভূতকন্যার বিবাহবাসর। বরের পিতা হঠাৎ বরপণের টাকার সংখ্যাটি বাড়িয়ে দিলেন এবং প্রথমী টাকায় আপাম দাবী করলেন। এই দাবীর না মেটান পর্যন্ত তিনি পাত্রকে সভাস্থ করতে পারেন না বলে মতামত প্রকাশ করলেন। বৈবাহিকের এই অশোভন অন্যায় দাবীতে কন্যার পিতা হলেন যুগপৎ বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং ক্রুদ্ধ। মুখে দুএকটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ করে তিনি যে তীব্র প্রতিজ্ঞা করে বসলেন তার মর্মার্থ এই—'হে বিবাহ বাসরে বিবাহের পূর্ব মুহূর্তে অতিরিক্ত বরপণের অন্যায় দাবী করে, সে পামর; আর যে লক্ষ বারে বারণ সত্ত্বেও পাত্রকে সভাস্থ না করে মজা দেখবার চেষ্টা করে, সে শূকর। এইরূপ চরমখোর অত্যাচারী যাতঘরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে তিনি কিছুতেই কন্যাকে জলে ফেলবেন না। বরঞ্চ বিকল্প হিসাবে তিনি কন্যাকে কেটে গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দেবেন।' বরপক্ষ তবুও অচল অটল। বরের পিতার ইঙ্গিতে বরপক্ষের গুহিত ব্রহ্মদৈত্য জেগে পড়েছে। বিবাহ বাসরে সুরু হয় ভূতুড়ে কাণ্ড। শেষপর্যন্ত ভূতকন্যার বা নিজের গলা থেকে বরেণ পাত্রীর হাতের নবনির্মিত কণ্ঠীটি বৈবাহিকের হাতে তুলে দিয়ে রক্ষা করলেন। মেয়ে পার হল।

শব্দ নৃত্যকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করবার আর একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। যথা :—একটি যন্ত্র। যন্ত্রটি বিভিন্ন অংশ সমন্বিত। যন্ত্রের প্রতিটি অংশের একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রয়েছে। যথা একটি বিরাট খাম—সদা ব্যস্ত করে পড়ছে আর উঠছে। যন্ত্র জগতে ইনি রাজা-উজির গোছের একজন। এর প্রতিভঙ্গীতে গাম্ভীর্য, গাম্ভীর্য এবং দার্ঢ্যতা প্রকাশ পাবে। একটি প্রকাণ্ড চাই হুইল—বন্ বন্ করে ঘুরছে। যন্ত্র জগতে ইনিও কেউ-কেটা নন। একটা তারের খাঁচাল পিনিয়ান। একটা লেদ্—লটাপটা করে ঘুরছে। আবার রয়েছে অজস্র ছোট খাট অংশ—যন্ত্র সমাজের কৃষক মজুর—কোথাও হুমদাম্ করে ঘুরছে দিচ্ছে, ঠাস্ ঠাস্ করে পিটিয়ে দিচ্ছে, টুক্‌টাক্ করে বাঁকিয়ে দিচ্ছে বা খুই খুই করে এগিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত কিছু মিলে একটি যন্ত্র সমাজ। যন্ত্র সমাজে একদিন শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন—পরস্পর ঝগড়া করে পৃথক হয়ে গেল। বিবাদের নিরসনের জন্য তারা একদিন মহাবিপদকে ডাকল সালিশী। মহাবিপদের কাছে একটির পর একটি এগিয়ে এল—খাম, চাই হুইল, পিনিয়ান, লেথ, চিমনি, কব্জা, স্প্রিং, বল্ট, আরও কত কি। এদের প্রত্যেকের গতিভঙ্গীতে রয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ। সালীশের বিচারে সবাই খুশী হয়ে পুনরায় মিলিত হল এবং এক সঙ্গে ঝম্ ঝম্, ঘুমঘাম, ঘনঘন, ঝর্‌র ঝর্‌র, লটাপটা, পীঈ, ঠাস্ ঠাস্, ঠুক্ ঠুক্, খুই খুই করে মহানন্দে চলে গেল।

লক্ষ্য রাখতে হবে শব্দ, ছন্দ এবং বিষয়বস্তু যেন শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকে গৃহীত হয়। উপরোক্ত নমুনাটি কেবলমাত্র সহরের শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুদের পক্ষে প্রযোজ্য, এবং তাও যদি শিশুরা কোন কারখানা দেখে থাকে। গ্রামের শিশুদের জন্য অনুরূপ পরিকল্পনার যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। কেননা গ্রামের শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় সহরের শিশুদের অপেক্ষা নিবিড়তর।

(৩) গতি ও ভঙ্গী :—নৃত্যাভিনয়ের গতি ও ভঙ্গী সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা বা লেখা চলে, এবং সে সম্বন্ধে অনেক বলা এবং লেখা হয়েছেও। কিন্তু তাতে কোন ব্যবহারিক সুবিধা নেই। কারণ পুস্তকের মাধ্যমে আপাতিক বহু বিষয় শিক্ষালাভের অসুবিধা হয়েছে, এবং সমূহ বিপদও রয়েছে। যেমন ধরুন ইংরাজী Sneeze ক্রিয়াটির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। আপনি চেম্বার্স ডিক্সনারী, বিংশ শতাব্দী সংস্করণ খুলে পড়লেন Sneeze শব্দের অর্থ লেখা রয়েছে "to make a sudden and involuntary violent expiration, preceded by one or more inspirations, the fauces being generally closed so that the current of the air is directed through the nose."

পড়ে বিশেষ কোন সাহায্য হলো কি? এটি অর্থ আপনার মাথায় ঢুকল—Sneeze মানে 'হাঁচির চালনা'। যেমনি হক কোন সঙ্গে নৃত্য শিক্ষা'র একটি সাদা প্রক্রিয়া [illegible] হয়ে—'প্রথমে শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তে শিরঃ মুদ্রা এবং বাম হস্তে কটিস্থান ধরে করিবে। পরে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বাম পদের কনিষ্ঠিকা হইতে তুই ইঞ্চি পরিমাণ মৃত্তিকা উপর উপর ঈষৎ টোকা মারিয়া পূর্বাবস্থায় চারি বারিবে। তারপর বামদিক দিয়া ঘুরিয়া বাম করতলে কনিষ্ঠ ধারণ করিয়া দক্ষিণ পদের তলুক (গোড়ালী) দ্বারা পার্শ্ব অস্থির উপর সজোরে আঘাত করিবে।' উক্ত টোকার পর চারি বেরে ঘুরে সজোরে আঘাত করবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেহেরও সজোরে পতন হল। আপনি তাড়াতে হাত দিয়ে চক্ষে ত্রিভুবন দেখলেন।

তাই বলছিলাম, কেতাবী শিক্ষার সমূহ বিপদ।

কেতাবের মাধ্যমে নৃত্যের ভঙ্গি শিখতে গেলে অসুবিধার সম্ভাবনা আছে। নৃত্যের ভঙ্গী শিখবার একমাত্র পন্থা, ভঙ্গী দেখা। সহরের পথে ছুটে মোট বহা, গাড়োয়ান গাড়ী চালায়, রিক্সাওয়ালা রিক্সা টানে, বাবুরা আফিস যায়, মেয়েরা কেরী করে, প্রত্যেকের গতিভঙ্গীতে রয়েছে বিশিষ্ট রূপ, তেমনি গ্রামে গ্রামান্তর চলায়, চাষা ধান কাটে, চাষার বৌ ধান ভানে, ঢেঁকিতে ধান ভানে, ছাদী ভাত রাঁধে, গয়লার বৌ মাখন টানে, পল্লীবালা কলসী কাঁখে জল আনে, মাঝি নৌকা চালায়, কুলী বোঝা বয়ায়, প্রত্যেকের ভঙ্গীটি নিজস্ব, বৈচিত্র্য। তা ছাড়া পশুপক্ষীর ভঙ্গীতে রয়েছে অফুরন্ত বৈচিত্র্য। আমরা সুরসিক মানুষ। আমাদের বাগ্‌বিভূতির অন্তরালে আমরা গোপন করে রাখি আমাদের মনের প্রকৃত স্বরূপটি, তেমনি দেহের স্বাভাবিক ভঙ্গীকে রদ করে আমরা সাজি সুরুচি সামাজিক জীব। মনের রাগ ক্রোধ লোভ মোহের ক্রীড়াগত মীলনকে যাতে বাহ্য ভঙ্গীতে প্রকাশ না পায়, সে দিকে আমাদের দৃষ্টির অন্ত নেই। কিন্তু তার আবেগোদ্রেকের সত্যতার বালাই নেই। হিংস্র বাঘের হিংসার উন্মত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়া হলো তার ভঙ্গী। আহত নাগিনী নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসে ফুঁসে মারে ছোবলের পর ছোবল। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে হরিণী উল্লাস মনে ছোটে নিজেকে বাঘের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য। এদের ভঙ্গীতে রয়েছে মনের সহজ স্বাভাবিক অবিকৃত প্রকাশ। তাই এদের গতিভঙ্গীর বৈচিত্র্য আমাদের মানুষের ভঙ্গীতে বিরল। ঘোড়া, গরু, ছাগল, মোষ, হাতী, কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, বাঘ, সিংহ, বিড়ালী প্রভৃতি পশু এবং হাঁস, বক, মযূর, মুরগী, শুকসারী প্রভৃতি পাখীর ভঙ্গীতে রয়েছে [illegible] বিভিন্ন। এদের ভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করলে প্রকাশ পাবে ভঙ্গীর বলিষ্ঠ রূপটি। তবে একথা ঠিক যে মানবদেহে অঙ্গভঙ্গীমার ভঙ্গীর হুবহু অনুকরণ অস্থিতন্ত্রের বিশেষ কারণবশতঃ সম্ভব নয়, এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু অন্তর ভঙ্গীগুলির

'মানবীকরণ' সম্ভব। এ ধরনের যন্ত্রের ধ্বনি বাস্তবে যেমন হয় তেমনি হতে হবে।

(৩) আবহ সঙ্গীত :—পূর্বে বলা হয়েছে যে, শব্দ-নৃত্যে কোন বিশেষ প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের যেমন তবলা ঢোল মৃদঙ্গ ইত্যাদির দরকার নেই; সকলে শব্দ করে নৃত্য করবে। অথবা একদল নৃত্য করবে অপরদল শব্দ করে আবহ সঙ্গীত পরিচালিত করবে। কিন্তু শব্দ নৃত্যের নৃত্যনাট্য পরিচালনায় বিশেষ ধরণের শব্দ যন্ত্রের ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকৃতি বিভিন্ন বস্তুর উপর আঘাত করে, আমরা বিভিন্ন সুর ও সুর পাওয়া যায়। চিনেমাটির বিভিন্ন সাইজের বাটিতে জল পুরে জলতরঙ্গের সৃষ্টি করা চলে; তেমনি একই প্রকার বিভিন্ন সাইজের কাঠ পর পর সাজিয়ে আঘাত করে গেলে বিভিন্ন সুর ও ধ্বনি পাওয়া যায়। যাঁরা কাঠ তরঙ্গের বাজনা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন 'শুধু কাঠি'-এর মধ্যে কতখানি সরল ঐকতানের মধু লুকানো ছিল। অন্যান্য যন্ত্র যেমন হুঁকোর খোলের ভিতর তেঁতুল বীচি পুরে আন্দোলন, ঢেউখেলান টিনের উপর দ্রুত ছড়ি চালনা ইত্যাদি। শিক্ষকের উদ্ভাবনী প্রতিভা এমনি বহু অদ্ভুত শব্দের যন্ত্রের সৃষ্টি করতে পারে। এই সকল যন্ত্রের সুবিধা এই যে এগুলি শিশুর কণ্ঠস্বরের পরিপূরক হবে। যে সকল স্বর শিশুর কণ্ঠে আসে না, এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে তা পাওয়া যাবে। তা ছাড়া এগুলি শিশু অতি সহজে ব্যবহার করতে পারে।

এরা হতে পারে, তবে তবলা, মৃদঙ্গ, ঢোল, খোল অপাংক্তেয় কেন? এরা কি জগতের বস্তু নয়? এরা কি মায়া? উত্তর এই যে তবলা, খোল, মৃদঙ্গ, বেহালা, সেতার ইত্যাদি যন্ত্র শব্দনৃত্যে অপাংক্তেয়, এরকম ভ্রান্ত ধারণা যেন কারুর মনে না থাকে। তবে এই যন্ত্রগুলি কোথায় সুষ্ঠু হয়-সাগা। এই সব যন্ত্রের বাদন আয়ত্ত করতে যে পরিমাণ ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের দরকার শিশুর কাছ থেকে ততখানি ধৈর্য এবং অধ্যবসায় অনেক ক্ষেত্রেই আশা করা যায় না। তা ছাড়া যন্ত্র কেনার অর্থের মোটা অঙ্কটিও মনে অযোগাতি আগায়। তবে শিক্ষক যদি নিজে ঐ সকল যন্ত্র বাজিয়ে আবহ সঙ্গীতকে সুষ্ঠু করে তুলতে পারেন, তবে অসুবিধা কী থাকতে পারে? তবে স্মরণ রাখতে হবে যে আবহসঙ্গীত যথাযথ পরিচালিত হবে শিশুর প্রচেষ্টায় —শিক্ষকের নয়।

(৪) পোষাক পরিচ্ছদ :—নৃত্য এবং নৃত্যনাট্যে পোষাক পরিচ্ছদের যে একটা বিশেষ স্থান রয়েছে সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। শিশুদের নৃত্যে পোষাক পরিচ্ছদের ঝামেলাটি যে অপরিহার্য। শিশু ঘুপে রং মেখে, পাগড়ী বেঁধে, ওড়োনা উড়িয়ে কালির ছুঁচো পরে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াতে পারলেই তার নাচের অর্ধেক সমাপ্ত হল। তাই শিশুদের বেলায় নৃত্যের এই সমারোহটি বাদ দিলে নৃত্য শিশুদের কাছে যে কেবল মাত্র নীরস হয়ে পড়বে তা নয়, নৃত্যের একটি বিরাট শিক্ষণীয় দিক চাপা পড়ে যাবে।

শিশুর নৃত্য সম্বন্ধে সমস্ত কথাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি না ভারতীয় লোকনৃত্য এবং অন্যান্য নৃত্য সম্বন্ধে কিছু না বলা হয়। ভারতবর্ষ যেমন উৎসবের দেশ, তেমনি নৃত্যেরও দেশ বটে। এর প্রতি পল্লী অঞ্চলে একদিন উঠতো খোল-করতাল-বাদন-মৃদঙ্গ সংযোগে নৃত্যছন্দের ঢেউ। আধুনিক যন্ত্রচালিত সমাজব্যবস্থায় মানব মনের সে অনুভূতির ঢেউ ক্ষীণ হয়ে আসছে—হয়তো বা বিলীন হয়ে যাবে। আমরা এতকাল জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে অনেক মাতামাতি করেছি—আজও তা নিয়ে আমাদের আন্দোলনের অন্ত নেই। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীতের

দম্ভে যে জাতীয় নৃত্যের এক বিরাট ঐশ্বর্যের অধিকারী আমরা, তা আজও চোখ খুলে দেখতে পাই না, অথচ ভারতবর্ষ কখনও নৃত্য এবং সঙ্গীত কে পৃথক করে ভাবেনি। ভারতীয় নৃত্য ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্গত একটি বিষয় হিসাবে চিরকাল সম্মান পেয়ে আসছে। নৃত্যকে সম্মান আমরা আজও দিতে শিখিনি। স্বাধীনতার এ পারে দাঁড়িয়ে আমাদের জাতীয় নৃত্যের স্থান উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। আমাদের বহু আগে কবিগুরু দ্রষ্টার মন নিয়ে তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে খাতে শিক্ষায় প্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। পরাধীন ভারতের অন্ধকারে তাঁর দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেনি।

ভারতীয় কথাকলি নৃত্য, ভারতনাট্যম্, মণিপুরী সেরাইকেলার ছৌ নৃত্য, কথক, এবং বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্যে প্রকাশ পায় ভারতের বিশিষ্ট মন—যে মন গোপুরের চূড়ায়, মন্দিরের দেওয়ালে, গুহার অভ্যন্তরে তুলি-ঘাটালির ভগ্নাংশে রেখে গেছে অপূর্ব সৃজন-প্রতিভার নিদর্শন; আবার পল্লীজনপদে উৎসব অনুষ্ঠানে ছন্দের ভেতর দিয়ে যে মন নিজেকে অপরের সঙ্গে বেঁধেছে বন্ধুত্বের বন্ধনে। ভারতীয় প্রায় সমস্ত নৃত্যই লোকনৃত্য এই অর্থে যে, এ নৃত্য সৃষ্টি হয়নি কোন মহারাজার দেওয়ান ঘেরা অন্দর মহলে, বা শাহজাদার গুলবাগিচা-ঘেরা হারেমে। উন্মুক্ত আকাশের তলে জনতার মাঝে এর সৃষ্টি। তাই ভারতীয় নৃত্যের প্রতি কারুকাজে আমরা দেখতে পাই সাধারণ মনের সুখ-দুঃখ, ধর্মার্থ, সামাজিক জীবনের অভিব্যক্তি। এ নৃত্যকে শিক্ষায়, নিখোঁজ করে শিশু শিক্ষায়, ব্যবহার করবার যথেষ্ট ব্যাপক ক্ষেত্র রয়েছে। এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণারও স্থান রয়েছে, এবং কেবল মাত্র গবেষণাই যথেষ্ট নয়, চাই জাতির এবং জাতীয় সরকারের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। ইহা খুবই আশার কথা যে নৃত্য, সঙ্গীত এবং অভিনয়কে ব্যাপক ভাবে শিশুশিক্ষায় ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ জননায়ক শ্রীনেহেরুর কণ্ঠে। নেহেরু যখন নৃত্য-সঙ্গীত এবং অভিনয়কে শিক্ষামূলক করে তোলার কথা ভাবছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মনের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল ভারতের বিগত ঐশ্বর্যের কথা। কিন্তু নেহেরুর স্বপ্নকে সার্থক করতে হলে চাই এমন একদল শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষয়িত্রী যাঁরা অতীতের নিষ্প্রাণ, ক্লেদ কণ্টকিত শিক্ষাকে নির্বাসিত করে, করবে সৎ, চিৎ, আনন্দের পুণ্যমন্ত্রে নব্য শিক্ষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা।